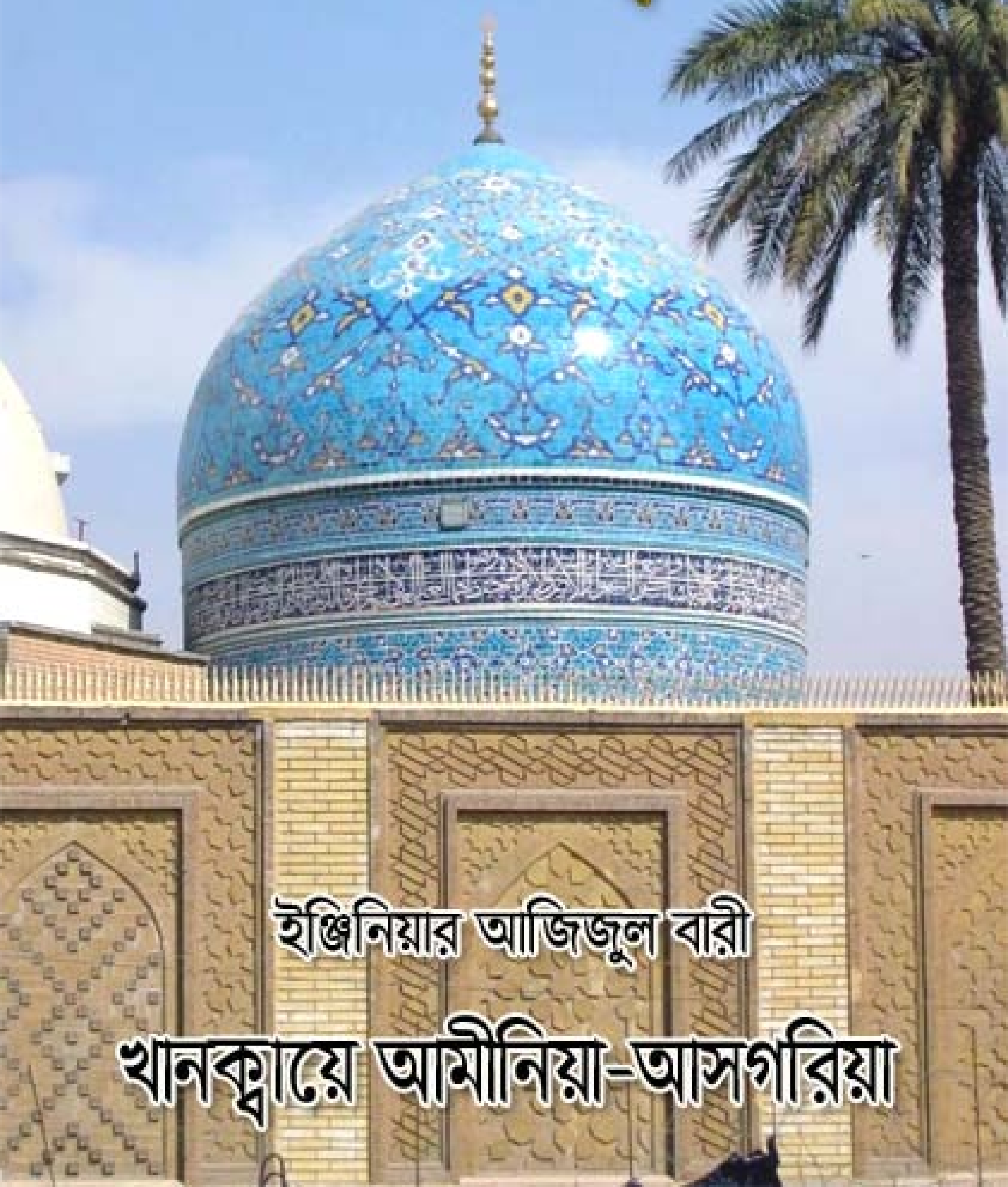
আউলিয়ায়ে ক্বাদিরীয়া



ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

Special Internet Edition

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

আউলিয়ায়ে ক্বাদিরীয়া

(ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকার মাশাইখে আজমের জীবন ও সাধনা)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী



খানক্বায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া

হাদিয়ায়ে সওয়াব-

ক্বাদিরীয় তরিকার সকল আউলিয়ায়ে কিরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন।

কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল ক্বদর খলিফা, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত পরিচালক

হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দা.বা. এর পক্ষ থেকে-

প্রাক কথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা-বাদ-

আলহামদুলিল্লাহ! খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে আরো একটি দ্বীনি গ্রন্থ প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। খানক্বার প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী "**আউলিয়ায়ে ক্বাদিরীয়া**" শিরোনামের এই বইটি রচনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত পাঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হবে। আর তাঁর ওয়ারিস হিসেবে স্বীকৃত উলামা ও ওলিআল্লাহগণের জীবনী পাঠ করলেও অনুরূপ উপকৃত হওয়া যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দীর্ঘদিনের চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে লেখক এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকদের সম্মুখে হাজির করেছেন। আমি আশারাখি প্রত্যেক পাঠকই এ থেকে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থে প্রথমত, পেয়ারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। সকল সুফি তারিকার সিলসিলাই হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অথবা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছুয়েছে। সুতরাং যে কোনো তরিকার সিলসিলা মুতাবিক ওলিদের জীবনালোচনায় সিরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকবেই। সেসাথে থাকবে হযরত আলী কিংবা আবু বকর সিদ্দীক ও সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের জীবনাদর্শের আলোচনা। চিশতিয়া তরিকার মতো ক্বাদিরীয়া তরিকার সিলসিলার সমাপ্তি ঘটেছে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগ পর্যন্ত জন্ম নেওয়া ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকার ২৮ জন ওলির জীবন ও সাধনার উপর আলোচনা হয়েছে এ গ্রন্থে। ওলিদের জীবন খুব চিত্তাকর্ষক

হয়ে থাকে। আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের জীবনভর সাধনার বর্ণনা আমাদেরকে প্রভুপ্রেমের প্রতি আকর্ষিত করে। ওলিরা আমাদের আদর্শ। তাঁদের জীবনকাহিনী পাঠ করে যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়ামী হাসিল করতে পারেন। আমি আশারাখি সুন্দর প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ থেকে সবাই উপকৃত হবেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রার্থনা জানাই তিনি যেনো আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা। পাঠকরাও যাতে ওলিআল্লাহদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে দ্বীনদারিত্বের প্রতি, তাসাওউফের সাধনার প্রতি আরো বেশি আগ্রহান্বিত হন, আমি এই কামনাই করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য করুন। আমিন।

ফারুক আহমদ
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ তা'আলার শুকুর-গুজার করে শেষ করা যাবে না। তাঁর অনুগ্রহে এ অধম, বিখ্যাত সুফি তরিকা '**ক্বাদিরীয়া**' শায়খদের জীবন ও সাধনার ওপর আলোচিত এ গ্রন্থটি সুপ্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমার এ প্রচেষ্টা। এ থেকে একজন পাঠকও যদি উপকৃত হন তবুও আমার কষ্ট-সাধনা সফল হবে। আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনালোচনা থেকে উপকৃত হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। বিখ্যাত ওলিআল্লাহ শায়খ খাজা ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো: "**যখন আল্লাহর ওলিগণ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান তখন আমরা কী করবো?**" তিনি বললেন, "**তাঁদের কথা ও উপদেশবাণীর পুনরাবৃত্তি করো।**" এতে বুঝা গেলো ওলিদের জীবনালোচনা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া যায়। বিশিষ্ট ওলিআল্লাহদের চিত্তাকর্ষক জীবনী গ্রন্থ পড়ে অনেক লোক সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমিয়েছেন বলেও বহু প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং '**আউলিয়ায়ে ক্বাদিরীয়া**' শিরোনামের এ গ্রন্থটি পাঠ করে যদি কেউ সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমান তাহলে সবিনয় আবদার থাকবে, অনুগ্রহপূর্বক এ অধমের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে দুআ করবেন।

মহাত্মন আউলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর প্রিয়জন। তাঁদের জীবন ও সাধনা সকল মুসলমানের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা ও অনুসরণযোগ্য। তাঁদের জীবনালোচনা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা একটি দীর্ঘ সাধনা। আল্লাহর খাস অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া এরূপ কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা-সাধনার বিনিময়ে চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি লিখে শেষ করার তাওফিক ইনায়েত করায়, আমি অধম আবারও মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বেশ কিছুদিন হলো '**আউলিয়ায়ে চিশত**' ও '**আউলিয়ায়ে নকশবন্দ**' শিরোনামে অনুরূপ আরো দুটি গ্রন্থ রচনা করার তাওফিক হয়। প্রথমোক্ত গন্থে হযরত নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার শায়খ হযরত কুতবে জামান মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত মোট ৪২ জন '**চিশতি**' ওলিআল্লাহর জীবন ও সাধনার বর্ণনা এতে স্থান পায়। গ্রন্থটির প্রিন্ট প্রকাশনা করতে এখনও সক্ষম হই নি। তবে আল্লাহর দয়ায় এটি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া হিসেবে ইন্টারনেটে প্রকাশ করতে পেরেছি। দু-তিনটি ওয়েভসাইটে আপলোড করার পর বহু লোক এটি অনলাইনে ও ডাউনলোড করে পাঠ করেছেন এবং করছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে স্থান পেয়েছে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাসহ আধুনিক যুগ পর্যন্ত আরো ৩৫ জন '**নকশবন্দী**' ওলিআল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা। বর্তমান এ গ্রন্থে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ আরো ২৭জন '**ক্বাদিরীয়া**' তরিকার ওলিআল্লাহর জীবনবৃত্তান্ত। যদি মহান আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দান করেন তাহলে পরবর্তীতে '**আউলিয়ায়ে সুহরাওয়ার্দিয়া**' শারোনামে আরেকটি কিতাব রচনার আশা রাখি। পাঠকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা যেনো এ আশাটুকুও পূরণ করেন, এ দুআ করবেন।

সকল হক্কানি সুফি তরিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। সবগুলোর উৎপত্তিস্থল রাহমাতুল্লিল আলামিন, সায়্যিদিল মুরসালীন, ইনসানে কামিল, স্রষ্টার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম।

'**তরিকা**' শব্দের অর্থ রাস্তা বা পদ্ধতি। প্রত্যেক সুফি তরিকার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। যুগ যুগ ধরে বিশিষ্ট মাশাইখে কিরাম এ চরম-পরম লক্ষ্যর্জনের উপায় অবলম্বন হিসেবে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। প্রাথমিক যুগের আউলিয়ায়ে কিরাম বিভিন্ন তরিকার নামকরণ আলাদাভাবে করেন নি। অনেক পরে বিশিষ্ট শায়খ বা স্থানের নামে বিভিন্ন তরিকার নামকরণ হয়েছে। যেমন: '**চিশতিয়া**' নামকরণের কারণ হচ্ছে শাম [সিরিয়া] থেকে হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী [মৃ. ৯৪০ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসাওউফচর্চার বিকাশ ঘটাতে স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে আফগানিস্তানের '**চিশত**' নামক জনপদে আসেন। তিনি পরবর্তীতে আবু ইসহাক শামী চিশতি হিসেবে পরিচিত হন। অনুরূপ বিখ্যাত ওলি হযরত আবদুল কাদির জিলানী [মৃ. ১১৬৬ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে '**ক্বাদিরিয়া**', হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী [মৃ. ১৩৮৯ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে '**নকশবন্দিয়া**' এবং হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দী [মৃ. ১২৩৪ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির [মতান্তরে তাঁর চাচা হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি [মৃ. ১১৬৮ ঈ.] রাহিমাহুল্লার] নামানুসারে '**সুহরাওয়ার্দিয়া**' তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত প্রত্যেক তরিকার ‘**জিকির**’, ‘**শুগুল**’, ‘**মুরাক্বাবা**’ ইত্যাদির মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার মধ্যে জিকিরের ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো এই: চিশতি শায়খগণ জিকরে জলি [স্বরবে] এর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অপরদিকে নকশবন্দি শায়খগণ জিকরে খফি [নিরবে] এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেহেতু এ গ্রন্থে ক্বাদিরীয়া তরিকার শাইখুল মাশাইখের জীবন ও কর্মের ওপর আমরা আলোচনা করেছি তাই এ তরিকার নিয়ম-কানুন সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনার প্রয়াস পাচ্ছি।

ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকা[১]

ক্বাদিরীয়া তরিকার মুরিদগণ জিকির শুরুর পূর্বে নিজের শায়খসহ অতীতের সকল ওলিআল্লাহ্, নবী-রাসূল ও ফিরিশতাগণের ওপর সওয়াব রেসানী করে থাকেন। নির্দিষ্ট কিছু দু’আ, ইস্তিগ্বফার ও কুরআন তিলাওয়াত করার পর সওয়াব রেসানীকে বলে ‘রাবিতা’। নিচে এর নিয়ম-কানুন ও প্রাথমিক জিকিরের বর্ণনা তুলে ধরছি।

রাবিতার নিয়ম:

১. অযু অবস্থায় ক্বিবলামুখী হয়ে বসে প্রথমে ১০০ বার পাঠ করতে হবে:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّوم، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

২. দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে ১১ বার:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِه وَصَحْبِه وَسَلَّم

৩. বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করতে হবে ২০ বার:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

৪. এরপর সূরা ফাতিহা ১ বার ও সূরা ইখলাস ৩ বার পাঠ করতে হবে।

৫. উপরোক্ত ওয়াজিফা পাঠ শেষে চোখ বন্ধ করে বলতে হবে: “হে আল্লাহ! যাকিছু পাঠ করলাম তার সওয়াব রেসানি করছি আমার শায়খসহ ক্বাদিরীয়া তরিকার সকল

---

[১] সূত্র: হান্টারনেট।

মাশাইখে আজমের রূহের প্রতি। আরো সওয়াব রেসানী করছি সকল ফিরিশতা, আম্বিয়াকে কিরাম ও আসহাবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহির প্রতি।

৬. এরপর চারজানু হয়ে বসে নিজের শায়খের ক্বলবের দিকে খিয়াল করবেন ও বলবেন: "আমি আমার শায়খের ক্বলবের দিকে রুজু আছি। তাঁর ক্বলব রুজু আছে সিলিসিলার যাবতীয় মাশাইখে আজমের ক্বলবের প্রতি। তাঁদের ক্বলব রুজু আছে রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মুবারকের প্রতি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মুবারক রুজু আছে মহান আল্লাহ তাআলর প্রতি। হে আল্লাহ! উক্ত সকলের নেক আমলের ওয়াসিলায় আমার ক্বলবকে নূরে মা'রিফাত দ্বারা আলোকিত করুন।"

৭. এরপর জিকরে জলি [স্বরবে] করবেন- ঠিক যেভাবে নিজের শায়খ নির্দেশ দেবেন। সাধারণত শুরুতে মুরিদদেরকে যেসব জিকির দেওয়া হয় তাহলো: 'নফি ইসবাত' [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এবং 'লফযে জালাল' [আল্লাহু যাল্লে-জালালুহু] এর জিকির। শেষোক্ত জিকির বেশি বেশি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সালিক ঐ ব্যক্তি যিনি সকল ফরয, ওয়াযিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা, সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও জিকরুল্লাহ থেকে গাফিল নন।

আল্লাহর মা'রিফাত লাভের সাধনায় প্রথম পদক্ষেপই হলো জিকির। এর পরে আসে 'জয্ব' [আকর্ষণ] এবং তারপর 'ইশক' [প্রেম]। সবশেষে 'মা'রিফাতুল্লাহ' [আল্লাহ-পরিচিতি]।

দৈনিক সবক

ক্বাদিরীয়া তরিকায় মুরিদ হওয়ার পর যেসব দৈনিক সবক দেওয়া হয় তাহলো:

১. তিলাওাতুল কুরআন: সূরা ফাতিহা ১ বার, সূরা নাসর (ইযা-যা আ-নাসরুল্লাহি...) ১ বার, এবং সূরা ইখলাস ৩ বার। দিনের যে কোনো সময় পাঠ করলেই হবে। অবশ্য পাঞ্জসূরাসহ অন্যান্য সূরাও পাঠ করা উত্তম।

২. ইসতিগ্বফার: পাঠ করতে হবে ১০০ বার 'আসতাগ্বফিরুল্লাহ।' সব শেষেরবার অতিরিক্ত পাঠ করতে হয়: '... হাল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লাহুআল হায়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়াআতূবূ ইলাইহি'।

৩. দরূদ শরীফ: ‘আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিউ ওয়া’আলা আ’লিহি ওয়াসাহবিহি ওয়াসাল্লাম’- ১০০ বার।

৪. নফি-ইসবাত: ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’- ৩০০ থেকে ১০০০ বার। সব শেষের বার ‘... আল-মালিকুল হাক্কুল মুবীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ছোয়াদ্বিকুল ওয়া’দিল আমীন’ অতিরিক্ত পঠিত হবে।

৬. লফযে জালাল: ‘আল্লাহু যাল্লে জালালুহু’- ১০০০ থেকে ৩০০০ বার। শেষে পাঠ করা হবে: ‘আল্লাহু যাল্লে জালালুহু, আম্মা নাওয়ালুহু, লা-ইলাহা গ্বাইরুহু’।

৭. ইসমে সিফাত: ‘ইয়া- লাতীফু’- ৫০০০ বার।

৮. তিলাওয়াত: সূরা ফাতিহা- ১ বার ও সূরা ইখলাস- ৩ বার পাঠ করে শেষ করতে হয়।

৯. ‘ইসমে হু’ জিকির: শুধু ‘হু’ উচ্চারণ করা। ‘হু’ অর্থ তিনি (আল্লাহ)।

মুরাক্বাবা [ধ্যান][২]

সব তরিকার মতো ক্বাদিরিয়া তরিকায়ও মুরাক্বাবা আছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি। জিকির-মুরাক্বাবার আমল স্বীয় শায়খের নির্দেশ ছাড়া পালন করা আদৌ সঠিক নয়। সুতরাং মুরিদ না হয়ে এসব আমল না করার জন্যই পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য আপনি চারটি হক্কানী তরিকার যে কেনো একটির অনুসারী কামিল শায়খের নিকট মুরিদ হতে পারেন- এতে কেনো বাঁধা নেই। সতর্ক থাকবেন। আজকাল বাতিল, বিদআতী ও ভণ্ড পীরের অভাব নেই। হক্বপন্থী পীরের অনুসন্ধান করে মুরিদ হবেন। আল্লাহ তা’আলা সবাইকে দ্বীনের সঠিক রাস্তায় অটল রাখুন।

নিচে ব্যাখ্যাত প্রত্যেক মুরাক্বাবার সময় অত্যন্ত আদবসহ দুই জানু বা চার জানু অবস্থায় ক্বিবলামুখী হয়ে বসতে হবে। যে আয়াত শরীফের মুরাক্বাবা করা হবে সেটি কয়েকবার অর্থের দিকে খিয়াল করে তিলাওয়াত করতে হয়।

১. মুরাক্বাবায়ে ফানা: কুরআন শরীফের এ আয়াতে করীম দুটোকে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

-“[প্রাণীজগতসহ সমগ্র মহাবিশ্বের] সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।” [সূরা আর-রাহমান : ২৬-২৭]

[২] সূত্র: ‘জিয়াউল কুলূব’- হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ক্বাদিরীয়া তরিকতের মাশাইখে আজম নিজেদের মুরিদানকে প্রথমে এই আয়াতদ্বয়ের মুরাক্বাবার সবক দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে মুরিদ 'ফানা'র [আল্লাহ ছাড়া সবকিছু বিলুপ্তির] অবস্থা বুঝতে সক্ষম হয়। এ মুরক্বাবা সফলভাবে শেষ হলেই অন্যগুলোর সবক দেওয়া হয়।

২. মুরাক্ববায়ে নূরুল্লাহ: তিনি সমগ্র জগতের নূর হিসেবে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন।

اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

-"আল্লাহ হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের [সমগ্র মহাবিশ্বের] জ্যোতি।" [সূরা নূর : ৩৫ (অংশ)]

৩. মুরাক্বাবায়ে মউথ: এ মুরাক্বাবার জন্য মৃত্যু যে নিশ্চিত, সে সম্পর্কিত যে কোনো আয়াত বা সবগুলো নিয়ে ধ্যানস্থ হতে হবে- যেমন:

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

-"তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে।" [সূরা জুমু'আ : ৮ (অংশ)]

আরেকটি আয়াত হলো:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

-"প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন গ্রহণ করতে হবে।" [সূরা আম্বিয়া : ৩৫ (অংশ)]

অপর আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

-"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।" [সূরা নিসা : ৭৮ (অংশ)]

কুরআনে করীমের উক্ত আয়াতগুলোর ওপর মুরাক্বাবা দ্বারা সালিকের অন্তরে আল্লাহর প্রতি খওফ সৃষ্টি হবে। এরপর শায়খ তাঁর মুরিদকে নিচে বর্ণিত মুরাক্বাবাগুলোর নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

৪. মুরাক্বাবায়ে তাওহিদে আফ'আলী [ক্রিয়াগত একত্বের ধ্যান]: এ মুরাক্বাবার মধ্যে বিশ্ব জগতের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ অনন্ত সত্তা আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে সংঘটিত হচ্ছে; এ চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে। সালিক এটাও ভাববে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই 'ফাইলে হাকিক্বী'- প্রকৃত কারক ও কর্তা। এ মুরাক্বার ফলাফল নিচের কবিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে:

জাগতিক বন্ধন মুক্ত যারা
ভালো-মন্দের সীমার উর্ধ্বে তারা।
ফানার সমুদ্রে দিয়েছে ডুব যারা
আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে আলাদা তারা।

৫. মুরাক্বাবায়ে তাওহিদে সিফাতী [গুণগত একত্বের ধ্যান]: এ মুরাক্বাবায় নিমগ্ন সালিক বিশ্বজগত ও নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহর গুণসমূহের প্রতিবিম্ব ভাববে। সফল এ মুরাক্বাবাকারী নিজেকে 'কাসরত ফীল আলম' - জগৎ ব্যাপ্তির অনুবর্তী দেখতে পায়। তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততা আকাশ-যমিনে বিস্তার লাভ করে। মোটকথা সমস্ত জগতের অস্তিত্ব সে নিজের মধ্যে দেখে। তার মধ্যে সত্য কাশফের স্তর উন্মোচন হয়।

৬. উচ্চ পর্যায়ের মুরাক্বাবা: সালিকের আধ্যাত্মিক মাক্বাম মুতাবিক শায়খ আরো উচ্চ পর্যায়ের মুরাক্বাবা দিয়ে থাকেন। যেমন: '**তাওহীদে জাতী**' [অনন্ত সত্তার একত্বের] মুরাক্বাবা। এই মুরাক্বাবা দ্বারাই সালিক '**ফানা-ফিল ফানার**' [বিলুপ্তির মাঝে বিলুপ্তির] স্তরে উপনীত হবেন। এরই মাধ্যমে 'ওয়াহদাতুল উজূদ' তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন হয়। তবে অধিকাংশ বুজুর্গ এ মুরাক্বাবা করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হলো, পরিপূর্ণ বোধ ছাড়া এর অভিজ্ঞান লাভ আসলে সম্ভব নয়- বরং সহজেই পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

অন্যান্য উচ্চস্তরের জিকির[৩]

১. জিকরে শিফা (রোগমুক্তির জিকির): সালিক ক্বিবলামুখী হয়ে চারজানু অবস্থায় চোখ বন্ধ করে বসবেন। নিয়মমতো তাসবিহাত শেষে ডানদিকে জরব [ধাক্কা] লাগাবেন 'يَا اَحَدُ' (ইয়া আহাদু) বলে, বামদিকে জরব লাগাবেন 'يَا صَمَدُ' (ইয়া সামাদু) বলে, আকাশের দিকে জরব লাগাবেন 'يَا وِتْرُ' (ইয়া বিতরু) বলে। এরপর কলবে জরব লাগাবেন 'يَا فَرْدُ' (ইয়া ফারদু) বলে। এ জিকির হবে ১০০০ বার।

২. জিকরে রূহ ওয়া মালাইকা (রূহ ও ফিরিশতাদের জিকির): ডান দিকে 'سُبُّوْحٌ' (সুব্বুহুন), বামদিকে 'قُدُّوْسٌ' (কুদ্দুসন), আকাশের দিকে 'رَبُّ الْمَلَائِكَةِ' (রাব্বুল মালাইয়াতি) এবং কলবের ওপর 'اَلرُّحُ' (আর-রূহু) এর জরব লাগাবেন। এ জিকির হবে ১০০০ বার। জিকির শেষে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকবেন। এ জিকির দ্বারা রূহসমূহ ও ফিরিশতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়।

৩. জিকরে মুশকিল আহসান: তাহাজ্জুদ নামযের পর এক হাজার বার করে ডানে 'يَا اَحَدُ' (ইয়া আহাদু), বামে 'يَا صَمَدُ' (ইয়া সামাদু), কাঁধের দিকে মাথা ফিরিয়ে 'يَا حَيُّ' (ইয়া হায়্যু) এবং কলবের উপর 'يَا قَيُّوْمُ' (ইয়া কায়্যুমু) -এর জরব লাগাবেন। এ জিকির অত্যন্ত ফলদায়ক।

৪. জিকরে কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি লাভের জিকির): বাদ-তাহাজ্জুদ এ জিকির করবেন। প্রতিটি পবিত্র নামের জিকির হবে এক হাজার বার করে। প্রথমে ডানদিকে জরব লাগবে 'يَا حَيُّ' (ইয়া হায়্যু), এরপর বামদিকে 'يَا قَيُّوْمُ' (ইয়া কায়্যুমু), এরপর আকাশের দিকে 'يَا وَهَّابُ' (ইয়া ওয়াহহাবু) এবং সবশেষে কলবে 'يَا اَللّٰهُ' (ইয়া আল্লাহু) -এর জরব লাগাবেন।

[৩] সূত্র: 'জিয়াউল কুলূব'- হাজী ইমদাদুল্লাহ মহুাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। শায়খের অনুমতি নিয়েই এসব জিকির করা উচিৎ হবে।

৫(ক). জিকরে কাশফে কুবুর (কবরের অবস্থা জানার জিকির) প্রথম পদ্ধতি: প্রথমে চোখ বুজে একুশবার খুব মনোযোগসহ ‘يَا رَبُّ’ (ইয়া রাব্বু) বলবেন। এরপর আকাশের দিকে ‘يَا رُوْحُ’ (ইয়া রূহু), কবরের দিকে ‘يَا رُوْحُ’ (ইয়া রূহু) এবং সবশেষে কলবের ওপর ‘يَا رُوْحُ الرُّوْحُ’ (ইয়া রূহুর রূহ) -এর জরব লাগাবেন। এক হাজার বার এ জিকির করবেন। ইনশাআল্লাহ কবর কাশফের মাক্বামে আল্লাহ চাইলে উন্নীত হবেন।

৫(খ). জিকরে কাশফে কুবুর (কবরের অবস্থা জানার জিকির) দ্বিতীয় পদ্ধতি: কবরের পাশে বসে মৃতের রূহের ওপর ফাতিহা পাঠ করবেন। এরপর ধ্যানস্থ অবস্থায় আকাশের দিকে খিয়াল করে পাঠ করবেন ‘أُكْشُفْ لِيْ يَا نُوْرُ’ (উকশুফ লী ইয়া নূরু), এরপর কলবের ওপর ‘أُكْشُفْ لِيْ يَا نُوْرُ’ (উকশুফ লী ইয়া নূরু) এবং সবশেষে কবরের ওপর ‘عَنْ حَالِهِ’ (আন হা-লিহী) -এর জরব লাগাবেন। এক হাজার বার জিকির করে, নিজের কলবের দিকে গভীরভাবে ধ্যানস্থ হবেন। আল্লাহ চাহেন তো ইচ্ছা পূরণ হবে।

৬. জিকরে জিয়ারতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: প্রথমে খুব মনোযোগসহ চোখ বুজে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পবিত্র ‘সূরতে মিছালে’র দিকে ধ্যানস্থ হয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। এরপর ডানদিকে ‘يَا اَحْمَدُ’ (ইয়া আহমাদু), বামদিকে ‘يَا مُحَمَّدُ’ (ইয়া মুহাম্মাদু) এবং কলবের ওপর ‘يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ’ (ইয়া রাসূলাল্লাহ) -এর জরব লাগাবেন। এ জিকির হবে ১০০০ বার। ইনশাআল্লাহ! জাগ্রত বা নিদ্রায় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নসীব হবে। [নিজের শায়খের অনুমতি নিয়ে এ জিকির করবেন।]

৭. জিকরে হাজত (প্রয়োজন পূরণের জিকির): যে কেনো ব্যাপারে মুশকিলে পড়লে অথবা প্রয়োজন দেখা দিলে, উক্ত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল আল্লাহ তা’আলার পবিত্র আসমাউল হুসনা (গুণবাচক পবিত্র নামসমূহ) থেকে কোনো একটি নাম জপে জিকির করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যেমন: (১) টাকা-পয়সার অভাব

থাকলে 'يَا رَزَّاقُ' (ইয়া রাজ্জাকু), (২) রোগমুক্তির জন্য 'يَا شَافِيُّ' (ইয়া শা-ফিয়্যু), (৩) হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে 'يَا حَفِيْظُ' (ইয়া হাফীজু), (৪) দুশমনের দুশমনী থেকে বেঁচে থাকতে 'يَا مُذِلُّ' (ইয়া মুযিল্লু), (৫) বালা-মুসিবত দূর করতে 'يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ' (ইয়া হায়্যু, ইয়া কায়্যুমু) -এর জিকির কলবের দিকে খিয়াল করে ১০০০ বার পর্যন্ত পাঠ করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ! কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: *পাঠকদের প্রতি আবারো অনুরোধ জানাচ্ছি যে, উপরে বর্ণিত জিকির-আজকার ও মুরাক্বাবার আমল একমাত্র নিজের মুর্শিদের অনুমতিক্রমে করবেন। পাক-ভারতের বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'জিয়াউল কুলূব' কিতাব থেকে এসব জিকির-মুরাক্বাবার পদ্ধতি সালিকদের সুবিধার্থে এখানে তুলে ধরেছি। এসব জিকির-মুরাক্বাবা থেকে ফায়দা পেতে হলে অবশ্যই, অবশ্যই কোনো হক্কানী মুর্শিদের কামিলের মুরিদ হওয়া জরুরী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞানসহ আমল করার তাওফিক দিন।*

উপরে আমরা কয়েকটি মাত্র জিকির-মুরাক্বাবার বর্ণনা তুলে ধরেছি। ক্বদিরীয়া তরিকায় আরো অনেক ধরনের উচ্চতর জিকির-মুরাক্বাবা আছে। শায়খগণ মুরিদের হাল মুতাবিক এসব মুরাক্বাবার সবক দিয়ে থাকেন।

এ গ্রন্থে আমরা প্রথমে ক্বাদিরীয়া স্বর্ণালী সিলসিলা মুতাবিক হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এরপর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাহিদ্বাআল্লাহু আনহুর জীবনালোচনা এসেছে। এরপর ধারবাহিকভাবে সিলসিলা মুতাবিক ইমামুত তারিকা হযরত গউসুল আজম সাইয়্যিদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত ওলিদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর পরের যুগের ক্বাদিরী আরো বেশ কয়েকজন ওলির জীবন ও কর্মের ওপরে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবি ও চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছাড়াও ক্বাদিরীয়া তরিকার আরো ... জন শাইখুল মাশাইখের

জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা হয়েছে। আমি আশারাখি পাঠকরা এ গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যাঁরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং আমার মুর্শিদে বরহক্ব কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর জলিলুল ক্বদর খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম অন্যতম। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আরো যাঁরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন খলিফায়ে মদনী হারযত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহিমাহুল্লাহর নাতি মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত সচিব], কবি আবদুল মুকিত মুখতার [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা বিভাগের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী] এবং ড. মোহাম্মদ শামিম খান [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী]। আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমীন।

ভুল-ত্রুটির জন্য সর্বাগ্রে আমি মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের নিকট ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করবো। হে আল্লাহ! অধম এ লেখক এবং গ্রন্থের পাঠকদেরকে আপনি দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমিন।

গ্রন্থকার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرفالنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওফাৎ ১০ হিজরি, ১২ই রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারাহ

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইতিহাস।

রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, রাহাতুল আশিকীন, সায়্যিদিল মুহিব্বীন, ইমামুত তারিক্বাত ওয়াশ শারিয়াত হযরত মুহাম্মদ আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয় পবিত্র মক্কা নগরীতে ঈসায়ী ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ প্রভাতকালে। তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের একটি দুআর বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের শুভাগমনের সুসসংবাদ দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ দু'আটি উল্লেখিত হয়েছে:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হিকমাতওয়ালা। [২:১২৯]

হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতে করীমের তাফসীরে বলেন:
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র কুরআন শিক্ষা দেন নি। কারণ তাঁর মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রাজ্ঞতার সঠিক দিক-নির্দেশানাও প্রদান করতে চেয়েছেন। সুতরাং তিনি শুধুমাত্র শরীয়তের আইন-কানুন শিক্ষা দেন নি, বরং সাধারণ লোকদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন জীবন-চলার সঠিক পথনির্দেশনা এবং বিশেষ ব্যক্তিদেরকে শিখিয়েছেন সূক্ষ্ম জ্ঞান ইঙ্গিত-ইশারায়। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গুরু। তাদের পবিত্র করবেন- কথাটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, অন্তর বা হৃদয়কে পবিত্রকরণ। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের মিশন শুধুমাত্র কথা ও আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি উত্তম চরিত্রগঠন ও নিয়তের বিশুদ্ধতাও প্রবর্তন করেন। রাসূল হিসেবে তাঁর চতুর্থ দিকটি হচ্ছে, তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ চরিত্র গঠনের মহাসংস্কারক।”

জগতে শুভাগমন ও নামকরণ

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত, আসহাবে ফীলের বছর তথা হস্তীবাহিনী দ্বারা ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা যে বছর মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল সে বছরই রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরার বুকে শুভাগমন করেন। ঠিক কোন তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে, শুভজন্মের দিন ছিলো সোমবার এবং সময় ছিলো সুবহে সাদিক। তারিখের ব্যাপারে চারটি রিওয়ায়েত বিদ্যমান: ২য়, ৮ম, ১০ম ও ১২তম রবিউল আউয়াল। এছাড়া ঈসায়ী ৫৭০ এবং কারো কারো মতে ৫৭১ সন হযরতের জন্মের বছর ছিলো বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিশ্ব-ভূবন আলোকিত করে হিদায়াতের নূরের রবি একদিকে মক্কা মুকাররমায় মা আমিনার কোলে উদিত হলেন আর অপরদিকে ভীষণ ভূমিকম্পে পারস্যের সম্রাট খসরুর রাজপ্রাসাদ ধ্বসে পড়লো। অগ্নিপূজার হাজার বছরের নিদর্শন যুগ যুগব্যাপী জ্বলন্ত অনির্বাণ অগ্নিশিখা নিভে গেল। শুকিয়ে গেল পারস্য উপসাগর। এসব অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণ হলো যে, আখিরী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মনোনীত মহাসত্যের মহান দ্বীন মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে ধরার বুকে শুভাগমন করেছেন। তাঁর

জন্মক্ষণে স্বীয় স্নেহময়ী মা আমিনার উদর হতে নূরের ঝলক সৃষ্টি হয়েছিল যার আলোতে সারা বিশ্বজগৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য। সীরাত লেখকগণ হযরতের জন্মক্ষণের সময়কার আরোও অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সবই ছিলো আখিরী নবীর শুভাগমনের নিদর্শন।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরতের 'মুহাম্মদ' নামটি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব রেখেছিলেন। জন্মের পর আরবের রীতি অনুযায়ী শিশুর 'আক্বীকা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আব্দুল মুত্তালিব। সবাই যখন জিজ্ঞেস করলেন, শিশুর নাম কি রেখেছেন? তিনি তখন বলে উঠলেন, "মুহাম্মদ"। সকলে অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, মুহাম্মদ! এই নামটি তো আমরা কেউ কোনদিন শোনি নি! আব্দুল মুত্তালিবের মুখ থেকে এই নতুন নামটি যেনো অদৃশ্যের ইশারায় বেরিয়ে আসে। সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামকরণ হলো 'মুহাম্মদ'। তবে তাঁর মাতা আমিনাও একটি নাম রাখেন আর তাহলো- 'আহমদ'। উভয় নামই ঐশি ইশারায় রাখা হয়েছিল। মুহাম্মদ (محمد) শব্দের অর্থ প্রশংসিত আর আহমদ (احمد) অর্থ প্রশংসাকারী। বলাই বাহুল্য আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। এছাড়া মানবজাতির মধ্যে মহান আল্লাহ পাকের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসা যে ব্যক্তি করেছেন তিনিও ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তাঁর উভয় নামই স্বার্থক হয়েছে। এ দু'টো নাম ছাড়াও হযরতের আরো অনেক গুণবাচক নাম ছিলো।

দুগ্ধমাতা হালিমার গৃহে গমন ও শৈশবকাল

আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছিলেন। এরপর আরবের প্রথানুযায়ী তাঁকে দুগ্ধ পানের জন্য ধাত্রী মা হালিমার গৃহে গমন করতে হয়েছিল। সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মা হালিমার গৃহে গমন করার পর থেকেই বরকত নাজিল হতে থাকে। বিবি হালিমার উট, বকরি ইত্যাদি পোষা পশুর মধ্যে এই বরকত আত্মপ্রকাশ করে। এগুলো অতিরিক্ত দুধ যোগান দিতে থাকে। হালিমার সংসারে উত্তরোত্তর উন্নয়ন হওয়া শুরু হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এসেছে। তবে বিবি হালিমার গৃহে থাকাকালে চার বছর বয়সের সময় শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সীনা ছাকের ঘটনাটি ঘটে। তাঁর জীবনে আরোও তিনবার সীনা ছাক হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়বার সীনা ছাক হয়েছিল দশ বছর বয়সের সময়। তৃতীয়বার এই

মু'জিযা ঘটে নুবুওয়াত-প্রাপ্তির প্রাক্কালে এবং চতুর্থবার সীনা ছাকের ঘটনা ঘটে মিরাজে গমনের পূর্ব মুহূর্তে।[৪]

মাতৃবিয়োগ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট পাঁচ বছর ধাত্রীমাতা বিবি হালিমা সা'দিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তবে আপন মাতা বিবি আমিনার গৃহে প্রত্যাবর্তনের মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই তিনি দুঃখের সাগরে ভেসে গেলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

বিবি আমিনার গৃহে উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নামক একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। পরবর্তীতে এই মহিলা সাহাবিয়্যাহ, মুক্ত হয়ে যান। এই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বিবি আমিনা একদা ছয় বছরের শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ ইয়াসরিব (মদীনা) ভ্রমণে যাত্রা করলেন। ইয়াসরিব ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহের মাতুতালয়। কিছু কিছু সীরাত লেখকের মতে এই সফরের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। বিবি আমিনা তাঁর আদরের দুলালকে স্বীয় স্বামীর কবরটি জিয়ারত করানোরও নিয়ত করেছিলেন। যা হোক, মাতা-পুত্র ও পরিচারিকা উম্মে আইমান উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চললেন। কয়েকদিন পর তাঁরা ইয়াসরিবে এসে উপনীত হন। এখানে হযরতের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাতা সালমা বিনতে আমর বানূ আদিয়্যা ইবনুন নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন, বিধায় তারা এই বংশের 'দারুন-নাবিগা'য় অবস্থান করেন। উল্লেখ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের জন্ম ও শৈশবকাল এখানেই কেটেছিল।

দারুন-নাবিগায় দীর্ঘ এক মাস অবস্থানের পর বিবি আমিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আবওয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছুলে আমিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং একমাত্র প্রাণপ্রিয় আদুরে দুলালের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে এই ধরার কোল থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলেন। উম্মে আইমান শিশু মুহাম্মদ মুস্তফাকে নিয়ে এই বিপদক্ষণে বিরাট ধৈর্য ধারণ

[৪] "সীনা ছাক" সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন গ্রন্থকার প্রণীত "আউলিয়ায়ে চিশত" শিরোনামের বইটি।

করলেন ও আমিনাকে সেখানেই দাফন করে দ্রুত মক্কা শরীফের পথে পাড়ি জমালেন। এই করুণ হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিপটে জাগরুক ছিলো। হিজরতের পর বানূ আদিয়্যা ইবনুন-নাজ্জার এর মনযিল ও আবাসস্থল অতিক্রমকালে তিনি একবার বলেছিলেন: "শৈশবে আমি যখন আমার মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, তখন বানূ আদিয়্যার এই স্থানে আমি আমার মাতুতালয়ের শিশুদের সাথে খেলা করতাম এবং টিলার উপর বসে থাকা পাখীদেরকে আমরা সবাই উড়িয়ে দিতাম।" এরপর তিনি দারুন-নাবিগার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন: "আমার মাতা এবং আমি এখানেই এসেছিলাম। এই গৃহের মধ্যেই আমার পিতা আব্দুল্লাহর কবর রয়েছে। আর এই ঝিলের জলেই আমি প্রচুর সাঁতার কেটেছি।"

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে মক্কা শরীফ পৌঁছে আমিনার মৃত্যুর দুঃসংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে বর্ণনা করলেন। আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং পিতামাতাহীন অসহায় আদুরে নাতির ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। নিজের পুত্র-পৌত্রদের তুলনায় অধিক বেশী আদর করে তিনি শিশু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন করতে থাকেন। সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, আব্দুল মুত্তালিব তাঁর আদুরে নাতি ছাড়া খাওয়া-পিনা করতেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অবাধে স্বীয় দাদার নিকট আসা-যাওয়া করতেন, তাঁর আসনে উঠে বসে যেতেন। কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কাবা শরীফের পাশেই একটি বড় আসন পাতা ছিলো। গোষ্ঠির অন্যান্য সকলেই এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আব্দুল মুত্তালিবের চতুর্পার্শ্বে বসতেন। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে আদর করে নিজের কাছে এনে আসনে বসিয়ে দিতেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে সেখান থেকে নেমে আসতে বলতেন, তখন আব্দুল মুত্তালিব তাদের থামিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে মন্তব্য করতেন, আমার এই নাতিকে এখানে বসতে দাও। সে ভবিষ্যতে এমন বড় মসনদের অধিকারী হবে যা ইতোমধ্যে কোনো আরব ব্যক্তির ভাগ্যে জুটে নি এবং কোনো কালেও জুটবে না। তিনি হযরতের একান্ত পরিচারিকা উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকেও সতর্ক করে দিতেন যে, তিনি যেনো তাঁকে দেখাশোনার ক্ষেত্রে একটুও অলস কিংবা উদাসীন না হোন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু

আনহা এই দায়িত্ব অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতি ও দৃঢ়চিত্তে পালন করেছিলেন।[৫] এই ভাগ্যবতী মহিলার আসল নাম ছিলো বারাকাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকারসূত্রে আবিসিনীয় হাবসী এই ক্রীতদাসীর মালিক হোন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তিনি উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে চিরতরে মুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে হযরতের পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলেই তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

পিতা-মাতা হারা শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দু'বছর স্বীয় দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অফুরন্ত স্নেহ-মমতায় লালিত পালিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কারণ দুই বছর পরই তিনি পরলোকগমণ করেন। এই মৃত্যুতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকাহত হয়েছিলেন এবং তিনি অনেকের মতো চোখের পানি আটকে রাখতে পারেন নি। বাস্তবে কুরাইশদের প্রসিদ্ধ এই নেতার মৃত্যুতে পুরো মক্কা শহরই শোকাকুল ছিল। আব্দুল মুত্তালিব তার দীর্ঘ জীবনে (কারো কারো মতে তিনি ১৪০ বছর জীবিত ছিলেন) অনেককিছু দেখেছেন। আবরাহা কর্তৃক মক্কা শহর আক্রমণ থেকে যমযম কূপ আবিষ্কার ও হযরতের পিতা আব্দুল্লাহকে 'কুরবানী' করার সংকল্প এবং পরে একশত উট দ্বারা কাফফারা প্রদান ইত্যাদি সবই তার হাতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মক্কা শহরের অবিসংবাদিত নেতা। সুতরাং তার মৃত্যুর পর স্বভাবতই মক্কা শহরে কয়েক দিন যাবৎ শোক পালিত হয়। বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিতামহের জানাযায় সকলের সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে শৈশব-কৈশোর- যৌবনকাল

বর্ণিত আছে আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুশয্যায় থেকে আদুরে নাতির ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বীয় পুত্র আবু তালিবের হস্তে সোপর্দ করে যান। আবু তালিব অত্যন্ত হৃদয়বান প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের তত্ত্বাবধান সঠিক ও পূর্ণ

[৫] তখন তিনি অল্প বয়স্কা যুবতী ছিলেন মাত্র। তাঁর নাম ছিলো 'বারাকাহ'। পরবর্তীতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর আইমান নামক তাঁর এক সন্তানের জন্ম হয়। এ কারণেই তিনি উম্মে আইমান নামে পরিচিত হন।

দায়িত্বশীলতার মধ্যে পালন করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পরে কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ীও ছিলেন এবং সময় সময় তদানীন্তন পৃথিবীর বিখ্যাত পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের কেন্দ্র সিরিয়ার [শামের] দামেস্ক শহরে প্রায়ই বাণিজ্য ভ্রমণে যেতেন। সুতরাং হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন মাত্র নয় বছর পূর্ণ হয়েছে, তখনই চাচার সঙ্গে তিনি সিরিয়ায় সর্বপ্রথম বাণিজ্য ভ্রমণে যান। এই ভ্রমণেই 'বাহীরা' নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটি কিছু কিছু সীরাত লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। 'সীরাতুন-নবী' গ্রন্থের লেখক আল্লামা শিবলী নোমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও 'নবীয়ে রাহমাত' গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেন নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ যৌবনকালে আরেকবার শামে বাণিজ্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার একজন কর্মকর্তা হিসাবে এই ভ্রমণে যান। তাঁর বয়স তখন ২৫ বছর ছিলো। এই বাণিজ্য সফরে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন এবং তার সবই স্বীয় চাচা আবু তালিবের হাতে হস্তান্তর করেন। এই বছরই খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চল্লিশ বছর বয়স্কা (কোন কোন রিওয়ায়েত মতে ৪৫ বছর বয়স্কা) বিধবা সতী-সাধ্বী খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা স্বেচ্ছায় পঁচিশ বছর বয়সের তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে এতোই ভালোবাসতেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকাবস্থায় খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তানের জননী হোন। কন্যা সন্তানদের নাম হলো রুকাইয়া, জায়নব, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না। পুত্র সন্তানদের নাম হলো আব্দুল্লাহ, তায়্যিব, তাহির এবং কাসিম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হযরতের আরেক পুত্র সন্তানের নাম ছিলো ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু। মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গর্ভে এই সন্তানের জন্ম হয় মদীনা

মুনুওয়ারায়। পুত্রদের সকলেই বাল্য বয়সে পরলোকগমণ করেন। চারজন কন্যা সন্তানের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন।

কাবাঘরে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ, আল-আমীন খেতাবে ভূষিত হওয়া, খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, সন্তানাদির পিতা হওয়া, হিলফুল ফুযুল সংস্থায় নেতৃত্ব প্রদান এবং ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সবই তাঁর যৌবনকালীন সময়ে সংঘটিত হয়। নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় ঘনিয়ে আসলে পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানসিক অবস্থায় রদবদল শুরু হয়। তিনি দিন দিন ভাবুক হয়ে ওঠেন এবং নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

নুবুওয়াত প্রাপ্তি

মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম থেকে ৩ মাইল দূরে ঐতিহাসিক হেরা পর্বতটি অবস্থিত। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট্ট গুহা আছে যাকে গারে হেরা বলে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান্ত একাকী ও নীরবে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যে এই গুহাটি বেছে নিলেন। তিনি খাবার ও পানীয়সহ একাধারে কয়েকদিন অবস্থান করতেন এই গুহাটিতে। নিশ্চয় আল্লাহর অদৃশ্য ইঙ্গিতে এই বিশেষ পাহাড় ও এর মধ্যস্থিত গুহাটি নুবুওয়াত প্রাপ্তির স্থান হিসাবে তিনি পছন্দ করেছিলেন। যারা পবিত্র মক্কা শহরে গিয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই পড়েছে যে, এই পাহাড়খানা মক্কাস্থ অন্যান্য সকল পাহাড়-পর্বত ও টিলার তুলনায় একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমানে 'জাবালে নূর' নামক এই পাহাড়ের উপরস্থ অংশটি কিবলার দিকে 'সিজদাবনত' আছে বলে প্রতীয়মান হয়। গুহার শৃঙ্গ থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ আগের যুগে স্পষ্ট দেখা যেতো। এখন অবশ্য অনেক উঁচু ও বিরাট বড় বড় অট্টালিকায় ঘেরা মসজিদুল হারাম এবং বাইতুল্লাহ শরীফ ঐ পাহাড় থেকে আর আগের মতো তেমন পরিষ্কারভাবে দেখায় না।

ঠিক কতদিন তিনি জাবালে হেরায় আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়েছিলেন এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ দীর্ঘ ১১ কিংবা ১২ বছর পর্যন্ত

উল্লেখ করেছেন। যা হোক, নবীজীর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখন যে তিনি ঘন ঘন সেখানে গিয়েছিলেন এবং সময় সময় এক মাস পর্যন্ত একাধারে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাতেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বিশেষ করে পবিত্র রমজান শরীফে তিনি হেরা গুহায় থেকে যেতে বেশী পছন্দ করতেন। এই রমজান শরীফেরই একটি মুবারক রাতে তাঁর প্রতি প্রথম ওহী নাজিল হয়।

নুবুওয়াত-প্রাপ্তির ৬ মাস পূর্ব থেকেই অত্যধিক পরিমাণ সত্যস্বপ্ন দেখতে লাগলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হেরা পর্বতে আসা যাওয়ার সময়ও তিনি শুনতে পেতেন কে যেনো বলছে, "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!"। গুহার মধ্যে থেকে তিনি মুজাহাদা, ত্যাগ স্বীকার ও রিয়াজতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহির ভার বহনের যোগ্যতা অর্জন করেন। এরপর একদা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম সূরা আলাক্ব এর প্রথম পাঁচটি আয়াত শরীফ নিয়ে হেরা গুহায় আত্মপ্রকাশ করলেন। ঠিক কিভাবে ওহী নাযিলের সূচনা ঘটে তা বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি প্রখ্যাত হাদীস থেকে নিম্নে তুলে ধরছি।

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রথম প্রথম ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী প্রেরণ শুরু হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা ভোরের আলোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন। তাই হেরা গুহায় চলে যেতেন আর পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে এক নাগাড়ে কয়েক রাত পর্যন্ত তাহান্নুস করতেন। তাহান্নুস হলো বিশেষ এক নিয়মে ইবাদত বন্দেগী করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার দাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর বিবি খাদীজার কাছে আসলে তিনি আবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে নিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে সত্য এসে পৌঁছুল। ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করেন। আমি এতে প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি আমাকে আবার ধরলেন এবং ছেড়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি আবার

বললাম, আমি পড়তে জানি না। এরপর তিনি আমাকে তৃতীয়বারের মতো খুব জোরে ধরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: ... ... اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ [ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক্ব ... পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।]" [বুখারী]

সর্বপ্রথম এই ওহী নাযিলের পরই কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার আকষ্মিকতায় ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে স্বগৃহে ছুটে গিয়ে হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বলতে লাগলেন, "আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও! আমার বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে!"। এতদশ্রবণে বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি সবকিছু খুলে বললেন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ স্ত্রী। তিনি স্বীয় স্বামী সম্পর্কে যা কিছু গত ১৫ বছরের বিবাহিত জীবনে অবগত হয়েছিলেন তা ইতোমধ্যে আর কেউ বুঝতে পারেন নি। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য, তাঁর চলাফেরা ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বাত, তাঁর পবিত্র চেহারায় সদা প্রকাশিত স্বর্গীয় নূর ইত্যাদি সবকিছুই খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট স্বচ্ছ পানির মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি জানতেন, এই মহাপুরুষ নিশ্চয়ই কোনো মহান দায়িত্বপালন হেতু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তি। সুতরাং তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহনপূর্বক তার ভার হালকা করেন, অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির-যত্ন ও মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে চলতে গিয়ে তাকলিফ ও বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করেন।" [বুখারী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ:) প্রণীত 'নবীয়ে রহমত' [বঙ্গানুবাদ] থেকে উদ্ধৃত]

এরূপ সান্ত্বনা প্রদানের পর বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জার নিকট চলে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী আলিম। অতিরিক্ত বয়স হওয়ার দরুন তিনি তখন অন্ধ। সবকিছু অবগত হয়ে বললেন,

"সুবহানাল্লাহ! ইনিই তো সেই মঙ্গলময় বার্তাবাহক জিব্রাঈল ফিরিশতা! যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিসসালামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নুবুওয়াতের প্রচারকালে যদি আমি শক্তিশালী যুবক থাকতাম! হায়, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে"। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শ্রবণ করে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সত্যিই কি আমার লোক আমাকে দেশান্তর করবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ন্যায় যাঁরা আপনার পূর্বে এরূপ সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, জগদ্বাসী তাঁদের সঙ্গেও শত্রুতা না করে ছাড়ে নি।" [বুখারী]

এরপর বেশ কিছুদিন যাবৎ ওহী অবতীর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে হতাশ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত একদা তাঁর প্রতি সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হলো। এ সম্পর্কে যাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন, "একদা আমি পথ চলার সময় আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ শ্রবণ করলাম। উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম হেরা গুহায় যে ফিরিশতা আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি আসমান যমীনের মধ্যখানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। আমি এতে ভীষণ ভয় পেলাম। ভয়ার্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা ঢেকে দাও। কম্বলে ঢাকা অবস্থায় আমার উপর পবিত্র কুরআনের সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হলো:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ*

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, আপনি লোকদিগকে সতর্ক করুন। আপনার প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" [সূরা মুদ্দাসসির : ১-৫]

এরপর নিয়মিত ওহী নাযিল হতে থাকে। কিন্তু ওহীর ভার বহন করা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিলো। একটি হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, "প্রথম প্রথম যখন ওহী নাযিল হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্মরণ রাখার জন্য অনেক কষ্ট করতেন। জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম ওহী পড়ে শোনাবার সময়

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওষ্ঠদ্বয় মুবারক নাড়তে শুরু করতেন।" এরপর পবিত্র কুরআনের এই ক'টি আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ*

"আপনি তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার উদ্দেশে আপনার ওষ্ঠদ্বয় নড়াবেন না; পবিত্র কুরআন আপনার অন্তরে সংরক্ষণ আমারই দায়িত্ব; অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন; এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।" **(ক্বিয়ামাহ : ১৬-১৯)**

দাওয়াত ও তাবলীগ

স্বভাবতই যাদের সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো তাদেরকেই প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে সর্বপ্রথম যিনি এই দাওয়াত অকপটে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন হযরতের একান্ত বন্ধুজন ও প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। এরপর আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রায় দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ গোপনে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত ছিলো। শুধু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, তাঁর নবদীক্ষিত সাহাবীরাও দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজে জড়িত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা ও সফলতা লাভ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁরই দাওয়াতের ফলে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যুবায়ির ইবনে আওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলামে দীক্ষিত হন। এই গোপনে দাওয়াতী কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলেন তাঁর হাবিবকে। ইরশাদ হলো:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

এবং

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও।" [সূরা শু’আরা: ২১৪-২১৫]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন। তিনি প্রথমেই আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসলেন। আহার শেষে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন আবু লাহাব অশ্লীল বাক্যবাণে এই প্রচেষ্টার জোর বাধা প্রধান করলো।

এরপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আবার নির্দেশ এলো:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"আপনি যে বিষয় আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।" [সূরা হিজর : ৯৪]

এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফ নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে মক্কাবাসীদের আহ্বান করলেন। কোনো বিশেষ ব্যাপার ব্যক্ত করতে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে ডাক দেওয়ার রিওয়াজ ছিলো তখনকার মক্কা শহরে। সুতরাং তাঁর ডাকে সবাই জমায়েত হলো। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি বলি, ঐ পাহাড়ের অপরপ্রান্তে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে। এরা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই সমস্বরে বললো, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কারণ আপনি মিথ্যাবাদী নন। এরপর তিনি মক্কার একেকটি গোত্রের নাম ধরে ধরে বললেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যদি ইহ-পরকালের সাফল্য কামনা করে থাকো তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। এখানেও আবু লাহাব অত্যন্ত মন্দ ভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আচরণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা লাহাব নাযিল হয়। এই সূরায় আবু লাহাবকে লানত করা হয়েছে।

দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করে তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কুরাইশরা বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লো। তারা লক্ষ্য করলো নতুন এই ধর্মমত হেতু তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। সুতরাং তারা যে কোনো উপায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দমিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলো। প্রথমে তারা জাগতিক বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কাজটি সারার চেষ্টা চালালো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। অবশেষে তারা কঠোরতা অবলম্বন করার হুমকি দিল।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একদা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বললো, "আবু তালিব! আপনি আমাদের মধ্যে একজন প্রবীণ জ্ঞানবান ব্যক্তি। আমরা ইতোমধ্যে আরেকবার আপনার নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে এই নতুন ধর্মমত প্রচার করতে নিষেধ করুন। আপনি তা উপেক্ষা করে গেছেন। আল্লাহর কসম! আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। আমাদের উপাস্য দেবদেবীর উপর দোষারোপ আর কতো সহ্য করবো। হয় আপনি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন না হয় আমরা তাঁর ও আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো যতক্ষণ না আমাদের কোনো এক পক্ষ খতম হয়ে যায়।"

আবু তালিবের বয়স কম ছিলো না। একে তো বয়সের ভার তার ওপর নেতা হিসাবে তিনি চাচ্ছিলেন না যে, নিজস্ব জাতিগোষ্ঠির বিচ্ছিন্নতা ঘটুক। অপরদিকে এটাও তার উদ্দেশ্য ছিলো না যে, আপন ভাতিজাকে তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দিতে। তিনি উভয় কুল যাতে রক্ষা পায় সে ভাবনা করছিলেন। তাই তিনি একদিন স্বীয় ভাতিজার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, "প্রিয় ভাতিজা আমার! তোমার গোষ্ঠির লোকেরা আমার কাছে এসেছিল। তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তোমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলেছে। এখন দয়া করে আমার দিকে একটু খেয়াল দাও। নিজের জানেরও মায়া করো। আমার ওপর এত বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই।"

প্রিয় চাচার মনে দুর্বলতা এসেছে লক্ষ্য করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ভাবলেন হয়তো তিনি আর তাঁকে সাহায্য-সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারবেন না। কুরাইশদের একটি প্রস্তাব ছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান তা তারা তাঁকে প্রদান করবে। এমনকি তিনি যদি রাজত্ব চান কিংবা আরবের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী চান তাহলেও তারা দ্বিধা করবে না। কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে শুধুমাত্র এই দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দিতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালিবকে বললেন: "চাচাজান! আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও তুলে দেয় তথাপি আমার কাজ থেকে বিরত হবো না। হয় আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করবেন না হয় এটা করতে করতে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।" কথা শেষ হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো।

ভাতিজার কণ্ঠে এরূপ দৃঢ় সংকল্পের কথা শ্রবণ করে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, "ভাতিজা! আমার কাছে এসো। যাও! তোমার মনে যা চায় বলো। যেভাবে ইচ্ছে তোমার প্রচার কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।"

কুরাইশ কর্তৃক চরম নির্যাতন

কুরাইশরা দাওয়াত পেয়ে ইসলাম-গ্রহণ থেকে শুধু দূরেই থাকে নি বরং কিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসরণকারীদেরকে স্তব্ধ করবে সে চিন্তায় মগ্ন হলো। তারা অনুরোধ, প্রলোভন, অসৌজন্যমূলক আচরণ, কঠোর কথাবার্তা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত নওমুসলিমদের উপর শারীরিক নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে দিল। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তিবল কম থাকায় তারা নির্বিচারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এসময় হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু, খাব্বান ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সুহায়ব ইবনে সিনান আর-রূমী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আবু ফুকায়হা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর মাতা সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা, পিতা ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং ভ্রাতা আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, লাবীবা রাদ্বিআল্লাহু

আনহা, যিন্নীরা বা যানবারা রূমিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, উম্মু উবায়স (বা 'উনায়স) রাদ্বিআল্লাহু আনহা, আন-নাহদিয়্যা ও তাঁর কন্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর মাতা হামামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা প্রমুখ সাহাবী/সাহাবিয়া কুরাইশদের এমন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যে তাঁদের উপর দৈহিক অত্যাচারের ঘটনাবলী শ্রবণ করলে গাঁ শিউরে ওঠে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা কখনো নিভে যায় নি।

এদের কেউ কেউ নির্যাতনের ফলে শহীদও হয়েছেন। মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ। নরাধম আবু জাহিল তাঁকে বর্শার আঘাতে হত্যা করে। এছাড়া তাঁর স্বামী ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু নির্যাতনের ফলে শহীদ হোন। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে তিনি হলেন প্রথম শহীদ। শুধু তাই নয়, এই দম্পতি শহীদী দরোজা লাভ করার পর তাঁদের আদুরে সন্তান হযরত খাব্বাব ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশদের চরম দৈহিক নির্যাতনের শিকার হোন। একদা আরেক সাহাবী তাঁকে শুধুমাত্র একটি পাজামা পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। লক্ষ্য করলেন, তাঁর পিঠে প্রচুর দাগ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কিসের দাগ? খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, কুরাইশগণ মক্কার কঙ্করময় মরুভূমিতে আমাকে যে শাস্তি দিত এগুলো তারই চিহ্ন। এই পরিবারের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি একদা এই নৃশংসতা স্বচক্ষে অবলোকন করে পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: "হে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পরিবার! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত" [বাইহাকী]।

হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘটনা সবার জানা। কিন্তু ঈমানের কী বিরাট শক্তি! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখে এসব মহাত্মন সাহাবীরা ঈমানের নূরে নূরান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁদের ঈমান হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত যাবতীয় মুসলমানের ঈমানের তুলনায় বহু বহু গুণ বেশী। তাঁদের তুলনা নেই। এরা ঈমানের জন্য যেরূপ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। এছাড়া দেশত্যাগসহ জান-মাল কুরবানী করেছেন, জিহাদের মাঠে সহাস্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। দ্বীনের জন্য তাঁদের অবদানের তুলনা নেই। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের যুগকে 'সর্বোত্তম যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে ওঠলো। ইতোমধ্যে হযরতের চাচা হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এরপরও কুরাইশরা থামলো না। যে কোন মূল্যে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। সুতরাং এই নির্যাতন থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় তা ভেবে একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে বললেন, সম্ভব হলে তোমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করো। সেখানে একজন হৃদয়বান বাদশাহ আছেন। তিনি হকপন্থী ব্যক্তি। সে দেশে কারোর উপর অন্যায় অত্যাচার হয় না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা না করেন ততদিন তোমরা সেখানে নিরাপদে অবস্থান করতে পারবে। সুতরাং ১২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা (মতান্তরে ১২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা বা ১০ জন পুরুষ ৪ জন মহিলা কিংবা ১২ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলার কথাও বলা হয়েছে) আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত করেন। এই দলে ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

হিজরতকারীদের কথা কুরাইশরা অবগত হয়ে তাঁদের পেছনে ছুটে গেল। উদ্দেশ্য তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা। কিন্তু মুসলমানগণ সতর্কতার সাথে সমুদ্র তীর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছুয়েই দু'টি নৌকা ভাড়া করে নিয়ে উপকূল এলাকা ছেড়ে সমুদ্রপথে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এদিকে কাফিররা সমুদ্র তীরে পৌঁছুয়ে নৌকো চলে গেছে জেনে বিফলমনোরথে ফিরে এলো। হাবশায় (আবিসিনিয়ায় - বর্তমান ইথিওপিয়া) গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীর অনুমতিক্রমে পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে দ্বীন পালন করতে থাকেন। তবে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কার সকল মুশরিক মুসলমান হয়ে গেছে। এ সংবাদ যখন হাবশায় পৌঁছায় তখন সাহাবায়ে কিরাম ভাবলেন, আর এখানে থেকে লাভ নেই। সুতরাং তারা মক্কা শরীফ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কার নিকটবর্তী হয়েই কিন্তু আসল সত্য তাঁদের নিকট ধরা পড়লো। সুতরাং তারা ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত অনেকেই আর ফিরে না যেয়ে গোপনে মক্কা শরীফ প্রবেশ

করলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনামতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হাবশায় ফিরে গিয়েছিলেন।

হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত

মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের মাত্রা কমলো না বরং আরো বেড়ে ওঠলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে মুসলমানদের একটি বড় দল হাবশায় হিজরত করলেন। এই দলে ৯৮ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা ছিলেন বলে বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরতের চাচা জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কুরাইশরা এদেরকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। দু'জন বিজ্ঞ কুরাইশ দূত অনেক উপঢৌকনসহ সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন আমর ইবনুল আস, যিনি পরবর্তীতে মিশর বিজয়ী প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অবশ্য তখনও মুসলমান হন নি। তার সঙ্গী ছিলেন উমারা ইবনুল ওয়ালীদ (কারো কারো মতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ রবীআ)। এরা দরবারে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত কৌশলে উপঢৌকনগুলো নাজ্জাশীকে উপহার করলেন এবং সভাসদবর্গের সাথে আগেই আলোচনা করে তাদেরকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসলেন।

খৃষ্টান সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে কুরাইশ দূতদ্বয় তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন, "হে মহামহিম বাদশাহ! আমাদের কিছু নির্বোধ লোক স্বীয় কওমের দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনাদের দ্বীনকেও মানে না। তারা একটি মনগড়া দ্বীনের অনুসরণ করে। এ নতুন দ্বীন সম্পর্কে আপনিও কিছু জানেন না আমরাও জানি না। আমাদের বংশের সম্ভ্রান্ত কিছু ব্যক্তি আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, আপনাকে অনুরোধ জানানো- এসব ধর্মত্যাগীদের তাদের কওমের নিকট ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।" সভাসদবর্গ আগে থেকেই কুরাইশদের পরামর্শ অনুযায়ী বলে উঠলো, হে মহামতি বাদশাহ! এই লোকগুলো সত্য বলেছেন। আমাদের মনে হয় এসব ভ্রান্ত লোকগুলোকে তাদের কওমের নিকট প্রেরণ করে দেওয়াই হবে উচিত কাজ।

সম্রাট নাজ্জাশী কিন্তু এসব কথায় সহজে মাথা নত করার পাত্র ছিলেন না। রাগান্বিত হয়ে বললেন, এই তথাকথিত ভ্রান্ত লোকগুলো কোথায়? কুরাইশরা বললো, তারা

আপনার রাজ্যে বসবাস করছে। বাদশা বললেন, তোমাদের কথায় আমি কখনো তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না। আমাকে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তাদেরকেই আগে জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি অভিযোগ সত্য হয় তখন আমি তাদেরকে এই দূতদ্বয়ের হাতে সোপর্দ করতে পারি। সুতরাং হিজরতকারী সাহাবীদেরকে সম্রাটের দরবারে ডেকে পাঠানো হলো। সাহাবায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সকলের পক্ষে সম্রাটের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু দেবেন।

এরপর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীরা শুধুমাত্র সালাম জানালেন- সিজদা করলেন না। এতে সম্রাটের সভাসদবর্গ রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বাদশাহকে সিজদা করলেন না? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করি, আর কাউকে নয়। নাজ্জাশী জানতে চাইলেন, স্বীয় কওমের ধর্ম ত্যাগ করে তোমরা কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেছো? তোমরা তো খৃস্টধর্ম কিংবা সমসাময়িক অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের অনুসারী নও। জাফর ইবনে আবি তালিব জবাব দিলেন, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কাউকে শরীকও করি না।

এবার নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, এই দ্বীন কে এনেছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি। হে বাদশাহ! আমরা যাহিলী যুগের এক জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম। মৃত জন্তুর গোশত আহার করতাম, অশ্লীলতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতাম না, প্রতিবেশীর প্রতি খারাপ ব্যবহারে লিপ্ত ছিলাম। সবলরা দুর্বলকে অত্যাচার করতো। এই অবস্থায় আমরা দিনাতিপাত করেছি। এরপর আল্লাহ পাক আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, আমানতদারিতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে জানি। তিনিই আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন, তাঁরই ইবাদত করা ও তাঁকে শরীক না করতে বললেন। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব মূর্তির ইবাদত করে তা বর্জন করো- এগুলো মিথ্যা। এতে কোনো লাভ নেই বরং বিরাট ক্ষতি। তিনি আমাদেরকে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আমানতের মালের হিফাজত করা, অশ্লীলতা বর্জন, প্রতিবেশীর

হক্ব আদায় করা ইত্যাদি। আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছি। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাদের কওম এতে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। নির্যাতন নিপীড়নে আমাদের জীবন বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদেরকে আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করিয়ে পূর্বের ন্যায় মূর্তি পূজায় নিয়ে যাওয়া। এই অসহ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে রেহাই ও আমাদের দ্বীন পালনে স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা আপনার দেশে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা আশা করি আপনার মতো স্বনামধন্য ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আমদেরকে অত্যাচারে ঠেলে দেবেন না।

হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক এই বক্তব্য সম্রাট নাজ্জাশীকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করলো। তিনি এবার নতুন ধর্মমত সম্পর্কে আরো জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তিনি যা এনেছেন তার কিছুটা কি তোমার নিকট আছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আছে। নাজ্জাশী তা শোনতে ইচ্ছাপোষণ করলেন। জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা মরিয়মের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করতে লাগলেন:

كهيعص . ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا . إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا . قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا . وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ * وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا . يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا . قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا . قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً * قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا....

-"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স- ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হই নি। আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই

আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া ইতোপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করি নি। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত? তিনি বললেন: এমনিতেই হবে- তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন: এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।"

সম্রাট নাজ্জাশীর চোখ দু'টো থেকে কপোল গড়িয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। সভাসদবর্গসহ উপস্থিত সবাই কাঁদতে লাগলেন।

নাজ্জাশী বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এই আয়াতগুলো ও ঈসা আলাইহিসসালাম যা এনেছিলেন তা একই উৎস থেকে এসেছে। এরপর তিনি আমর ইবনে আসের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোকগুলো কি তোমাদের দাস? ইবনে আস জবাব দিলেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এরা কি তোমাদের নিকট ঋণগ্রস্ত? ইবনে আস আবার জবাব দিলেন, জি না। নাজ্জাশী বললেন, তাহলে তোমরা চলে যাও। আমি কখনো এদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না।

আমর ইবনে আস খুব কূটকৌশলী ছিলেন। তিনি বের হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আগামীকাল এমন এক বিষয় বাদশাহর দরবারে উত্থাপন করবো যে, এর দ্বারা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করে ছাড়বো। পরদিন দরবারে গিয়ে বললেন, রাজন! এরা ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে মারাত্মক আপত্তিকর কথা বলে। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তিনি বললেন, তারা ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে কী এমন মারাত্মক ধারণা রাখে? তাদেরকে দরবারে হাজির করো!

জাফর ইবনে আবি তালিব এবং অন্যান্য সাহাবা জানতেন, ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু বলেছেন তা-ই তাঁরা ব্যক্ত

করবেন। সবার অনুমতিক্রমে এবারও জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকলের পক্ষে বাদশাহর দরবারে ভাষ্যকার নির্বাচিত হলেন।

নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তিনি স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। তার ডানে আমর ইবনে আস এবং বায়ে উমারা। উভয় দিকে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক পাদ্রী।

এরপর নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিসসালাম সম্পর্কে কী বলো? জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন আমরা তা-ই বলি। তিনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি কুমারী মরিয়মের উদরে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়ে তাঁকে অস্তিত্বদান করেন।" এটা শ্রবণ করে নাজ্জাশী হাতদ্বয় মাটিতে মারলেন এবং সেখান থেকে একখণ্ড কাষ্ঠ উঠিয়ে বললেন, "তুমি যা বলেছো ঈসা ইবনে মরিয়ম এই কাষ্ঠখণ্ডের পরিমাণও বেশী কিছু নন।" একথা শোনে সভাসদবর্গের সবাই ফিস ফিস শব্দ করতে লাগলো। তিনি আবার বললেন, 'তোমরা যাই বলো না কেন, ঈশ্বর সম্পর্কে আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' তিনি এবার মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদ। যে তোমাদের অভিসম্পাত দেবে তাকে জরিমানা করা হবে। এক পাহাড় স্বর্ণ দিলেও আমি কাউকে তোমাদের উপর আঘাত করতে দেবো না। ওদের (কুরাইশদের) উপঢৌকন তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও; ওসব আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

কুরাইশ দূতদ্বয় বিফল মনোরথে দেশে ফিরে আসলেন। আবিসিনিয়ায় আগত মুসলমান মুহাজিররা নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলাম-গ্রহণ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম দিকে ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুআয় আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে বিরাট

মর্যাদার অধিকারী করে দিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সত্যিই চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর।

হযরত উমর একদা কুরাইশ নেতা আবু জাহিল ও অন্যান্যদের প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য সংকল্প করে বসলেন। তিনি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। উমর কী তখন জানতেন, এই ভ্রমণটি ছিলো তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়? তিনি যে শীঘ্রই সত্যের সন্ধান পেয়ে যাবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কারণ ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পবিত্র দরবারে দুআ করে নিয়েছিলেন যে, "হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহিল কিংবা উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও!"। লক্ষণীয় যে, তিনি দুআর সময় উভয়ের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে বলেন নি- যে কোনো একজনের জন্য আল্লাহর দরবারে আবদার করেন। আল্লাহ পাক উমরকেই পছন্দ করলেন।

পথিমধ্যে নু'আম ইবনে আব্দুল্লাহ নামক এক নওমুসলিমের সঙ্গে উমরের সাক্ষাৎ ঘটলো। নু'আম বুঝতে পারলেন, উমর নিশ্চয়ই কোনো কঠিন সংকল্প করেছেন তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই উমর! এভাবে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?' 'মুহাম্মদের শিরচ্ছেদ করবো!' কঠিন ভাষায় জবাব দিলেন উমর। নু'আম একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আগে তোমার নিজের ঘর সামলাও- তুমি কি জানো না, তোমার বোন ও তার স্বামী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছেন?'

উমর গর্জে উঠলেন, 'কী বললে? আমি এক্ষুণি তাদের শায়েস্তা করে নেবো!' এই বলে তিনি ছুটে গেলেন বোনের বাড়িতে। তিনি শুনতে পেলেন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি। বুঝতে পারলেন, সত্যিই এরা মুসলমান হয়ে গেছেন। ঘরের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উমরের বোন ও তার স্বামীকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ভাইয়ের আগমনে ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা কুরআনের পাতাটি লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আত্মগোপন করলেন। ভগ্নিপতি দরজা খোলার পর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে দেখাও!'। এই বলে তিনি স্বীয় ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীকে রক্ষার্থে ফাতিমা এগিয়ে আসলে তাকেও তিনি প্রহার করলেন। এতে ফাতিমার শরীর ফেটে

রক্ত বেরিয়ে আসলো। উমর বোনের রক্ত দেখে থেমে গেলেন। তিনি কিছুটা লজ্জাবোধ করে বললেন: 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে একটু দেখাও। আমার শুধু জানা দরকার তোমাদের এই নতুন দ্বীনটি কি জিনিস।' হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠে নম্রতার ভাব লক্ষ্য করে বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি উভয়ে আশান্বিত হলেন। তবে যেমন ভাই তেমন বোন- ফাতিমা উত্তেজিত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'আপনি অপবিত্র! যান, গোসল করে আসুন।'

সুতরাং উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু গোসল করে আসলেন। ইতোমধ্যে বেশ উত্তেজিত ও আশান্বিত হয়ে আত্মগোপনে থাকা হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বেরিয়ে আসলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঐ কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হা এর প্রথম কটি আয়াত শরীফ পাঠ করলেন:

طٰهٰ * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰى * تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا * الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّه' يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى * اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى*

"ত্বোয়া-হা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।" (ত্বা-হা : ১-৮)

পাঠ শেষে তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আহ! কী অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী এই আয়াতমালা!' হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না- ঈমানী নূরের ঝলক তাঁর অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে দেহ-তনু-মনে জেগে তুললো রোমাঞ্চকর শিহরণ। বললেন, "আমাকে এক্ষুণি বলো, কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়?"।

ভাই উমরের হৃদয় ঈমানী নূরের ছোঁয়ায় দীপ্ত হয়েছে বুঝতে পেরে ফাতিমার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। শিক্ষক খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু আনন্দের আতিশয্যে হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে জানালেন, 'হে উমর! গতকালই আমি শ্রবণ করেছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আবু জাহিল কিংবা উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও। সেই পবিত্র মুখের দু'আর ফলেই আপনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন।'

এরপর তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল আকরামে উপস্থিত হলেন। দরোজায় কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে উমরকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসংকোচে উমরকে ভেতরে আসতে দাও। হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত বিপদের আশঙ্কায় উমরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন আসল খবর। তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাপড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হে উমর! তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছো?" হযরত উমর তৎক্ষণাৎ কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন। আকস্মিক ও অভাবনীয় এই ঘটনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে উঠলেন, "আল্লা-হু আকবার!"। সাহাবায়ে কিরামও এতো সজোরে 'আল্লা-হু আকবার' ধ্বনি তুললেন, এতে আশপাশ এলাকা প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। এরপর উমর তখনই আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুফর নিজেকে সাড়ম্বরে প্রকাশ করছে আর আমরা হক্ব দীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কেনো তা গোপন করবো? উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এই দৃঢ় সাহসী উক্তিতে উপস্থিত ত্রিশ-চল্লিশ জন সাহাবী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলে পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে যেয়ে প্রকাশ্যে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করলেন। সেখানে অনেক কাফির ছিলো, কিন্তু নীরবে এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন ছাড়া তাদের কারোর সাহসে দেয় নি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে চ্যালেঞ্জ করার।

কুরাইশদের কর্তৃক সামাজিক বয়কট

মহাবীর হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের মতো প্রভাবশীল ব্যক্তিদের ইসলাম-গ্রহণ হেতু

মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরাট ফায়দা হলেও কুরাইশদের দুশমনী একটুও কমে নি। বরং তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। সেমতে নুবুওয়াতের ৭ম বছরের ১লা মুহাররম থেকে কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর যাবতীয় পরিবারবর্গকে সামাজিক বয়কটের শিকার করে।

মক্কার অদূরে শা'ব আবি তালিব নামক উপত্যকায় তাদেরকে বন্দী করে রাখলো। উপত্যকা থেকে তাঁদের কাউকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। মক্কার কেউ বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ পেলো না- উপত্যকার বাইরে এসে খাবার দাবারসহ জীবন রক্ষার জন্য জরুরী কোনো বস্তু পর্যন্ত সংগ্রহের অধিকার তাদের ছিলো না।

সামাজিক এই অমানুষিক বয়কটে আক্রান্ত হয়ে সবাই জর্জরিত হয়ে পড়লেন। খাবারের চরম অভাব হেতু শিশু-মহিলা এবং বৃদ্ধরা উপবাসে থেকে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর পরিবারবর্গের উপর এতো বড় বিপদ আপতিত হয় নি। নরাধম কাফিররা সবাই মিলে এমন জঘন্য মহাসঙ্কটে পতিত করে নবী-পরিবারকে। তারা একটি কাগজে বয়কটের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করে কাবা শরীফের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। এই দলীলে মক্কার বড় বড় কাফির নেতাদের সই ছিলো। দলিল লেখক ছিলো নরাধম মানসি ইবনে ইকরিমা আবারদী। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়াতে শস্তি দিয়েছেন। যে হাতদ্বয় দ্বারা সে লিখেছিল তা তিনি চেতনহীন করে দিয়েছিলেন।

সুদীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ এই বয়কট স্থায়ী ছিলো। আহ! এই সময়ে নবী-পরিবারের উপর কী না কষ্ট! কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সবাই তা সহ্য করে গিয়েছেন। এই চরম বিপদের দিনেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ হন নি। অবশেষে এক দু'জন মুশরিকের মনেও দয়ার উদ্রেক ঘটলো। মুসলমানদের উপর এরূপ চরম নির্যাতন উচিত হয় নি ভেবে তারা ব্যাপারটি নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলো। এদিকে কাবা শরীফের দেওয়ালে লটকানো ঐ কাগজের টুকরো বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে একজাতীয় উই পোকা তা খেয়ে ফেলে। একমাত্র

আল্লাহর নামটি অক্ষত ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন।

এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে জানালেন। তিনি মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহের সামনে গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে কথা বললেন। চুক্তিপত্র বা বয়কটের দলীলটি যে উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে তা তাদের জানিয়ে দিয়ে বয়কট অবসানের দাবী জানালেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর চুক্তিপত্র সত্যিই উই পোকা খেয়ে ফেলেছে দেখে কুরাইশরা লজ্জায় মাথা নত করলো। এদিকে আবদে মনাফ ও কুসাই গোত্রের লোকগণ ঘোষণা দিলো, আমরা এই বয়কট মানি না! শীঘ্রই বয়কটের অবসান ঘটলো। যুহায়র ও তার সাথীগণ নাঙ্গা তরবারি হস্তে ছুটে গেলেন শি'ব আবি তালিবের দিকে। অভ্যন্তরীণ সকল মুসলমানকে তারা মুক্ত করে দিলেন। এভাবেই দীর্ঘ ৩ কিংবা মতান্তরে ২ বছর কঠিন বিপদে আপতিত থেকে নুবুওয়াতের দশম সালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপরিবারে মুক্ত হলেন।

গিরিসঙ্কট থেকে বের হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর চাচা আবু তালিবসহ হিশাম ও মুত্তালিব গোত্রের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা আল্লাহর ঘরের সামনে গিয়ে গিলাফে ধরে এই চরম দুর্ভোগের জন্য দায়ী কুরাইশ মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদদু'আ করলেন:
'হে আল্লাহ! যারা আমাদের উপর এই জঘন্য যুলুম করেছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, আমাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে, আমাদের পক্ষে তুমি এর বদলা নিও'।

দুঃখের বছর (عام الحزن)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনে বিরাট দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ পতিত হয়েছে। কাফিরদের জ্বালা-যন্ত্রণা তো ছিলোই সেসাথে ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে আসা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ছিলো দুঃখ-ভারাক্রান্ত। তবে যে দু'জন মানুষ তাঁকে কঠিন বিপদ-আপদের সময় কাছে থেকে সর্বাধিক বেশী সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন তাঁরা হলেন হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এবং চাচা আবু তালিব। তাঁদের জীবদ্দশায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এই দু'জনকেও তাঁর থেকে চিরতরে দূরে সরিয়ে দিলেন।

তখন নুবুওয়াতের ১০ম বছর। হযরত ও পরিবারবর্গ সবেমাত্র সামাজিক বয়কট থেকে মুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘ দিন শি'ব আবি তালিবে দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটানোর পর ক'টা দিন যেতে না যেতেই সান্ত্বনাদাত্রী প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করলেন। এর অল্পদিনের মাথায় চাচা আবু তালিবও এই ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ দু'টি মৃত্যুর ফলে হযরতের যেনো ডানা ভেঙ্গে পড়লো। কুরাইশ কাফির-মুশরিকরা সুযোগ বুঝে তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করলো। একান্ত আপনজনদের হারানো এবং সেসাথে কুরাইশদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে তিনি নিরাপত্তাহীন ও অসহায় বোধ করলেন। এ কারণেই এই বছরটিকে "আমুল হুযন' বা দুঃখের বছর নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা মক্কা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান 'জান্নাতুল মা'ল্লা' -তে সমাহিত আছেন।

তায়েফ গমন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিক থেকে ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে আপতিত হয়েও তাঁর পবিত্র মিশন চালিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা রেখে তিনি তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। তবে মক্কা শহরে এই কাজের মাধ্যমে তেমন বেশী সফলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। আপাতত তিনি মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরবর্তী জনবহুল তায়েফ শহরে যেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সফরসঙ্গী হিসাবে প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করে নুবুওয়াতের ১০ম বছর শাওয়াল মাসে তিনি তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছকীফ নামক একটি প্রভাবশালী গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে এদের কাছ থেকে কোনো আশানুরূপ জবাব মিললো না- বরং তারা তাঁকে কটাক্ষপূর্ণ কিছু বাক্য শুনিয়ে দিল। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুরোধ করলেন, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করলে না, তবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমার বিষয়টি গোপন রেখো। কিন্তু এতে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠলো। হৈ-হল্লা ও চিৎকার দিয়ে

সেখানে অনেক লোক জড়ো করে দিল। সবাই তাঁকে ঘিরে ফেললো এবং বিভিন্ন ধরনের খারাপ উক্তির মাধ্যমে তাঁকে উত্যক্ত করে তোলার চেষ্টা করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে এক মাস তায়েফে থেকে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। ছকীফ গোত্রের নিকট থেকে ফিরে তিনি তায়েফের বিভিন্ন প্রভাবশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা কেউই দাওয়াত গ্রহণ করলো তো না-ই, উপরন্তু তারা তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলো। তাদের বেওকুফ দাসদাসীদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। এরা অত্যন্ত বে-আদবীপূর্ণ আচরণ করতে লাগলো দু'জাহানের বাদশাহ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে। এমনকি তারা তাঁকে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে পবিত্র দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। প্রচণ্ড আঘাতে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর মুবারক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নবীজীকে রক্ষা করতে। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে অনেক পাথরের আঘাত নিজে সহ্য করে দ্রুত চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র পদদ্বয়ে রক্ত জমা হয়ে পড়লো। এদিকে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে রক্ষা করতে যেয়ে পাথরের আঘাতে তাঁরও মাথা ফেটে গেল। এরপর কোনমতে একটি বাগানের দেওয়ালের পাশে গিয়ে উভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আপাতত নরাধম হামলাকারীদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেলেন।

সেখানে একটি আঙ্গুর গাছ ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির নীচে বসে পড়লেন। অত্যন্ত ক্লান্ত, রক্তে রঞ্জিত, ব্যথিত, ক্ষুধার্ত এবং নিরাশপূর্ণ অবস্থায় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রুভরা চোখে মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে হাত উত্তোলন করে দু'আ করতে লাগলেন।

না জানি কোন্ বদদু'আ করে তায়েফবাসীকে আজ ধ্বংস করে দেওয়া হবে! কিন্তু না, দয়াল নবীজী এক হৃদয় নিংড়ানো দু'আ করলেন নিজেরই অক্ষমতা স্বীকার করে! তিনি আল্লাহর পবিত্র দরবারে আকুতি-মিনতি করে বললেন:
"হে আল্লাহ! আপনার দরবারে আমি আমার দুর্বলতার ফরিয়াদ জানাই, আমার মধ্যে হিকমাতের অভাব আছে। আমি দুর্বল। ওগো সর্বাধিক দয়াময় আল্লাহ

তা'আলা! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করেছেন? দূরবর্তী কারো নিকট, যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে অথবা শত্রুর নিকট যাকে আমার মালিক বানিয়ে দেবেন? যদি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ না থাকে তবে আমার আর কোনও পরোয়া নেই। অবশ্যই আপনার ক্ষমা আমার জন্য প্রশস্ত। আমি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকে অথবা আমার প্রতি আপনার কঠোরতা প্রদর্শন করা হতে। আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাচ্ছি যার দ্বারা যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়। আমি আপনারই সন্তুষ্টি চাই। নেক কাজ করার কিংবা অন্যায় ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি একমাত্র আপনার কাছ থেকেই আমি পেয়ে থাকি"।

যাদুল মাআদে বর্ণিত আছে, উক্ত দু'আ শেষে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের ফিরিশতাদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হাবীবের নিকট। তারা অবতরণ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে দু'টি পাহাড়ের মাঝে তায়েফ নগর অবস্থিত, আপনি দু'আ করুন এ দু'টো একত্রে মিলিয়ে দিয়ে তায়েফবাসী সবাইকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য। আমরা এ কাজের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মায়ার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা এ কী বলছো? আমাকে আল্লাহ পাক মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন- ধ্বংসের জন্য নয়। তারা যা করেছে তা আমার দুর্বলতা হেতু করেছে- আমি তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝাতে পারি নি। আমি তো আশাবাদী তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর হাবীবের কী মুহাব্বাত মানুষের জন্য! এতো জঘন্যভাবে অপমানিত ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন যে সম্প্রদায়ের কাছে তাদের প্রতি এই অকল্পনীয় ব্যবহার! প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের চিত্র কতো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে তায়েফের এই ঘটনা থেকে। শিক্ষা হিসাবে ইসলামের দায়ীদের জন্য এই ঘটনাটি চিরদিন যাবৎ আদর্শ হয়ে থাকবে।

তায়েফের ঘটনাবলী থেকে আরো একটি চিরন্তন সত্য দিবালোকের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে- আর তাহলো, ধন-সম্পদের মোহে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। সে

সত্যকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে বসে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে এই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

"যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, সেখানকার ধনাঢ্য অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা-সহ প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতো, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না" [সূরা সাবা : ৩৪-৩৫]।

আল-মি'রাজ (المعراج)

সকল নবী-রাসূলের জীবনেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কিছু অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এসব 'মু'জিযাহ' (مُعْجِزَة) সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং নবী-রাসূলদের মু'জিযা সত্য এবং তার উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবুওয়াতী জিন্দেগীতেও অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল। কোনো কোনো সীরাত লেখক ১ হাজারেরও বেশী মু'জিযা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাবতীয় মু'জিযার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো মু'জিযা হলো পবিত্র কুরআন শরীফ। মহান এই ঐশীগ্রন্থ একটি জ্যান্ত মু'জিযা। আর এর পরবর্তী স্থানে আছে হুজুরের নভোভ্রমণ বা মি'রাজ। এমন অত্যাশ্চর্য মু'জিযা অপর কোনো নবীর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় নি। মি'রাজের দু'টি দিক আছে। যেহেতু মি'রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে মি'রাজে গমণ করেন, তাই মু'মিনদের জন্য এ থেকে আখিরাতের জিন্দেগীতে যে আমরা সশরীরে ঊর্ধ্বজগতে যাবো তার নমুনা ভেসে এসেছে। অপরদিকে দুনিয়ার জীবনে 'আধ্যাত্মিক ভ্রমণের' সূত্রও এই মি'রাজ। এজন্য বলা হয়েছে 'আসছোলাতু মি'রাজুল মু'মিনীন' - নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ।

পবিত্র মি'রাজের ঘটনাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সশরীরে মক্কা শরীফের মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ- যাকে আরবীতে 'ইসরা' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ রাতের ভ্রমণ। মাসজিদুল আকসা থেকে সপ্ত আসমান পেরিয়ে বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি ভ্রমণ শেষে আরশে আজীম পর্যন্ত ভ্রমণকে বলে 'মি'রাজ' বা ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ। তবে উভয় ভ্রমণকেই পারিভাষিক অর্থে একত্রে মি'রাজ বলে। ঠিক কোন্ সময় মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশের মতে নুবুওয়াতের দশম বছর রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ইশা থেকে ফযরের মধ্যে তা সংঘটিত হয়।

পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে ঠিক কোথায় ঘুমন্ত ছিলেন সে ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি তাঁর ফুফু হযরত উম্মে হানী রাদ্বিআল্লাহু আনহার ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম এর ডাকে সেখান থেকে উঠে বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন হিজরে ইসমাঈল (বা হাতীমে) চলে যান। সেখানে পৌঁছার পর তিনি আবার নিদ্রামগ্ন হন। তখন তাঁকে ফিরিশতা আবার জাগিয়ে তুলে বুরাকে চড়িয়ে যাত্রা শুরু করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সেখানে সকল আম্বিয়া আলাইহিস্সালাম এর রূহের সাথে নিজে ইমামতি করে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের প্রাক্কালে তাঁর সম্মুখে দুগ্ধ ও শুরার দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলো। তিনি দুগ্ধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম মন্তব্য করলেন, আপনি যদি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেতো। এরপর শুরু হলো মি'রাজের পর্ব।

নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম একে একে প্রথম থেকে সপ্তম আসমানের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে গেলেন। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারেই দ্বাররক্ষী ফিরিশতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ হলো: ফিরিশতারা প্রশ্ন করলেন, 'হে জিব্রাঈল! আপনার সাথী কে? তাঁকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে?' ইত্যাদি। জিব্রাঈল প্রত্যেকবারই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় দিলেন এবং স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপনীত হতে তাঁকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে- তা অবগত করলেন। দ্বাররক্ষীরা তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দিল। তিনি প্রত্যেক আসমানেই একেকজন পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ নবীর সাক্ষাৎ পেলেন।

প্রথম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত আদম আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। আদম আলাইহিস্সালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সুসন্তান', 'সৎকর্মশীল', 'সত্য নবী' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করে অসংখ্য ফিরিশতা ছাড়াও দেখা হলো হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁরা উভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সম্ভাষণ জানালেন। তৃতীয় আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। তাঁর সাথে অনেক কথাবার্তার পর চতুর্থ আসমানে আরোহণ করে দেখতে পেলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্সালামকে। এরপর পঞ্চম আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত হারুন আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলিত হলেন যথাক্রমে হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁদের সবার সাথেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথোপকথন হয়েছে। সবাই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা ও মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

সিদরাতুল মুনতাহায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম আরো ঊর্ধ্বলোকে গমন করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' তথা বদরিকা বৃক্ষের নিকটে যেয়ে পৌঁছুলেন। এখানে তিনি পবিত্র কাবাঘরের অনুরূপ একটি ইবাদাতগৃহ দেখতে পেলেন। এই গৃহের নাম 'বাইতুল মা'মুর'। এই পবিত্র ঘরকে সত্তুর হাজার ফিরিশতা দৈনিক তাওয়াফ করেন। একজন ফিরিশতাকে একবার তাওয়াফ শেষে আরেকবার করার জন্য সত্তুর হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ঊর্ধ্বে 'রফরফের' মাধ্যমে আরোহণ করলেন। এই শেষ সফরে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম যেতে অপারগতা জানালেন। কারণ হিসাবে বললেন, আর যদি এক কদম আমি অগ্রসর হই তাহলে আমার সকল পাখা আল্লাহর তাজাল্লিতে জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে!

আল্লাহর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে যেয়ে পৌঁছুলেন। আরোহণের সময় মনে পড়লো হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম এর কথা। তুর পাহাড়ে আরোহণ শেষে একটি বৃক্ষের নিকট আল্লাহর তাজাল্লির সম্মুখে পৌঁছার পর আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'হে মূসা! তুমি পবিত্র স্থানে আগমন করেছো, তোমার জুতা খুলে ফেলো!'। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে আরোহণের পূর্বে নিজের পা মুবারকে যে খড়ম ছিলো তা খুলে ফেলার জন্য উদ্যত হলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হলো, 'হে আমার হাবিব! আপনি জুতা খোলার চেষ্টা করবেন না। আপনার পাদুকার স্পর্শ পেলে আমার আরশ ধন্য হবে!' সুবহানাল্লাহ! আমাদের নবীজীর মর্যাদা স্বয়ং মহাপ্রভুর দরবারে কতো ঊর্ধ্বে!

অতঃপর একান্ত সঙ্গোপনে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা তাঁর হাবীবের সাথে কথোপকথন করলেন যার সঠিক বর্ণনা আমি অধমের কলম থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। তবে মি'রাজ হতে প্রত্যাবর্তনকালে কয়েকটি বিশেষ উপহার আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন। এগুলো হলো: ১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২. শিরকের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারলে অন্যান্য যে কোনো গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা এবং ৩. সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত।

আল-মি'রাজ এমন এক বিস্ময়কর ও বিরাট ঘটনা যে, এর পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ঘটনা সংঘটিত হওয়াকালে পৃথিবীতে 'সময়' অতিবাহিত হয় নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে সময়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। সাত আসমান, আট বেহেশত, সাত দোযখ, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশে আজীম ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভ্রমণ করিয়ে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবকিছু অবলোকন করিয়ে অনেক জ্ঞান দান করেন এই মি'রাজের রাতে। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা তাঁর অন্তরাত্মা ভরপুর করে দেন। এরূপ একটি বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে সময়কে স্তব্ধ রাখা একান্ত জরুরী ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যদি কেউ আলোকের গতিতে চলতে পারে তাহলে তার উপর দিয়ে 'সময়ের' গতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। আর মি'রাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাহন বুরাকের গতি ছিলো আলোকের গতি থেকে দ্রুত- তার একেক পদক্ষেপ ছিলো দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত।

মি'রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব এবং সশরীরে এই ভ্রমণ হয়েছিল। এ ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু সে যুগের কাফির, মুশরিকদের মতো আজকের যুগের কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা এই মি'রাজের ঘটনাকে মানতে নারাজ। এমনকি কোনো কোনো দুর্বল 'ঈমানদার' ব্যক্তিরাও একে 'আধ্যাত্মিক', 'স্বাপ্নিক' ইত্যাদি উপায়ে হওয়ার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। আমরা জোর গলায় বলবো, যে মহান আল্লাহ তা'আলা 'কুন' শব্দের মাধ্যমে সারা মহাবিশ্বসহ, বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসী ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন সেই অসীম ক্ষমতাধর প্রভুর পক্ষে তাঁর হাবিবকে সময় নামক উপাদানকে সাময়িকভাবে গতিহীন রেখে, পুরো মহাবিশ্ব ঘুরিয়ে দেখানো মোটেই কঠিন কিছু নয়। তাঁর জন্য সবকিছুই অতি সহজ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। মি'রাজের ঘটনা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আমরা শ্রবণ করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

মি'রাজের রাতে অসংখ্য অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে অনেক অপূর্ব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআন শরীফে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল" [বনী ইসরাঈল : ১] এবং

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى * لَقَدْ رَأٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"তাঁর চোখ না অন্যদিকে ঝুঁকেছে আর না সীমা অতিক্রম করেছে। নিশ্চয় তিনি তাঁর পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন।" [সূরা নাজম : ১৭-১৮]।

মদীনায় হিজরতের পূর্বাভাস

মি'রাজের ঘটনার পরে এবং এর পূর্বে তায়েফের ব্যর্থ ও দুঃখজনক সফর শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ না হয়ে তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। মক্কা শহর ও আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের নিকট যেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়ের আহ্বান জানালেন। তিনি কালব, ফিজারা, আমির ইবনে সা'সা, হানীফা, শায়বান, হারিস, কা'ব, কিনদা প্রভৃতি গোত্রের নিকট দাওয়াত পৌঁছালেন। মক্কা শরীফের বাৎসরিক প্রসিদ্ধ তিন মেলা তথা 'যুল মাজায', 'মাজান্না' এবং 'উকাজ' মেলায় গিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কুরাইশ নেতাদের কৌশল ও অপপ্রচারের ফলে কেউই ইসলাম গ্রহণ করলো না- বরং অনেকে তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলো। তাদের সবাই এই দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো।

আকাবার প্রথম বাইআত: কিন্তু এই চরম নিরাশার মধ্যেও একদা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে ওঠলো আল্লাহর অপরিসীম কৃপায়। বর্তমান জামারাতের নিকটে আকাবা নামক উপত্যকায় ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র জামাআতের সঙ্গে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ ঘটলো। এরা প্রাচীন প্রথানুযায়ী হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ (তখনকার নাম ইয়াসরিব) থেকে এসেছিলেন। মদীনার প্রখ্যাত 'খাজরাজ' গোত্রের এসব হজ্জযাত্রীদের নাম ছিলো: ১. আসআদ ইবনে যিয়ারা, ২. 'আওফ ইবনে হারিস, ৩ রাফি' ইবনে মালিক, ৪. কুতবা ইবনে 'আমীর, ৫. 'উকবা ইবনে 'আমির এবং ৬. জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন)। নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাঁরা সবাই সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে নিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তারা সহজেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়।

এরপর সবাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অঙ্গীকার করেন যে, দেশে প্রত্যাবর্তন শেষে তাঁরা সকলে ইসলামের দায়ী হিসাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এই ঘটনাই হলো 'আকাবার প্রথম বাইআত'।

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত: অনেক সীরাত লেখক উপরোক্ত আকাবার বাইআতকে ঠিক 'বাইআত' বলেন নি। সুতরাং কারো কারো মতে আকাবার বাইআত মোট দু'টি।

তবে আসলে এতে কোন মতানৈক্য নেই বরং বর্ণনার মধ্যে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন মাত্র। যা হোক আমরা মোট তিনটি বাইআত হয়েছিল বলে এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রথম বাইআতের ছ'জন পুরুষ তাঁদের অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে তাঁরা দীর্ঘ এক বছর যাবৎ দ্বীনের সফল দায়ী হিসাবে কাজ করেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে মদীনা শরীফের প্রখ্যাত গোত্রদ্বয় 'আওস ও খাজরাজ বংশের সবার ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের আলোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। নুবুওয়াতের একাদশ বছরে অর্থাৎ আকাবার প্রথম বাইআতের পরবর্তী বছরেই হজ্জের মাওসুমে উপস্থিত হলেন পূর্বোক্ত ছয় ব্যক্তি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো সাতজন। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ এসে আকাবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষক হিসাবে মদীনা মুনুওয়ারায় প্রেরণ করা হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজে নির্বাচিত করলেন হযরত মুসআব ইবনে উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।

হযরত উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেন। সুতরাং মদীনা মুনুওয়ারায় ইসলামের দীপ্তিময় আলো দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো।

আকাবার তৃতীয় বাইআত: এই বাইআতকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বাইআত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যা হোক এটাই মদীনা শরীফে হিজরতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ এই বাইআতের সময় মদীনা শরীফ থেকে আগত ৭৩ জন মুসলমান হজ্জযাত্রী আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইআত গ্রহণের পরই তাঁকে হিজরত করার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। তাঁরা বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিসহ সকল মুসলমান মক্কা শরীফ থেকে হিজরত-পূর্বক আমাদের ইয়াসরিবে গমন করলে আমরা আপন পরিবার-পরিজনসহ আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধান করতাম।" সবাই অঙ্গীকারও করলেন যে, "এজন্য যদি আমাদেরকে সমগ্র

দুনিয়াবাসীর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়, তবুও আমরা পিছপা হবো না- আমরা প্রস্তুত আছি এবং সকল ব্যাপারে আমরা আপনাকেই অনুসরণ করবো।"

বলা বাহুল্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোমধ্যেই হিজরতের আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন তাই তিনি বিনাবাক্যে তাঁদের দাওয়াত কবুল করে নিয়ে বললেন, "আজ হতে তোমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আমারও প্রতিশোধ স্পৃহা বলে গণ্য হবে এবং তোমাদের ক্ষমা প্রদর্শন আমারও ক্ষমা প্রদর্শন বলে বিবেচিত হবে। আমি তোমাদেরই একজন আর তোমরাও আমারই।"

মদীনায় হিজরত

মক্কা শরীফের তখনকার কুখ্যাত কাফির-মুশরিকরা শেষ পর্যন্ত পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়ার এক ঘৃণিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। মক্কাস্থ তখনকার চারটি প্রধান গোত্রের সবাই এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় জড়িত হলো। তারা জানতো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পর বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে- এমনকি হাসিম গোত্রের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঁধতে পারে। তাই তারা সকল গোত্রের পক্ষ থেকে চারজন নওজোয়ানকে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য নির্বাচিত করলো। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আর যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়ে দিলেন এবং মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করলেন।

কুরাইশরা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘর ঘেরাও করে নিল। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম কুদরতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের সামন দিয়ে চলে গেলেন অথচ কেউ তাঁকে দেখলোই না! একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে ছিটাতে ছিটাতে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা ইয়া-সীনের "ফা-আগশাইনাহুম ফাহুম লা-ইয়াবসিরূন" পর্যন্ত পাঠরত অবস্থায় তিনি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসলেন- কেউ টেরও পেলো না। নিজের বিছানায় রেখে আসলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।[৬]

[৬] নবীয়ে রহমত - বঙ্গানুবাদ, পৃ. ১৮২, ইফাবা।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে এভাবে রেখে আসার মূল কারণ ছিলো, নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমাকৃত মানুষের মালামাল সমজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য। জানা থাকা দরকার, শুধু মুসলমানদের মালামাল তাঁর নিকট জমা ছিলো না- কট্টর বিরোধীরাও তাঁকে এতোই বিশ্বাস করতো যে, তাঁর চরম বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের মালামাল নির্বিঘ্নে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমানত হিসাবে রেখে দিত। যা হোক, অল্প বয়স্ক আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য বিছানায় এভাবে শুয়ে থাকা সত্যিই বিরাট সাহসের পরিচায়ক ছিলো। কারণ, ঘরের ভেতর ঢুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেয়ে কাফিররা হযরত আলীকে রাগের আতিশয্যে সহজেই হত্যা করতে পারতো। তবে শেষ পর্যন্ত তা করা থেকে বিরত থাকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ায় কিন্তু পুরো মক্কা শহরব্যাপী এক হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেলে। যে কোনো মূল্যে তারা তাঁকে হত্যা করতে যারপরনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বাড়িতে যেয়ে পৌঁছলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে তিনি ঐ রাতেই মক্কা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে সুর পর্বতের উপর আরোহণ করলেন। পর্বতশৃঙ্গের একটি গুহায় উভয়ে প্রবেশ করে আত্মগোপন করলেন। দীর্ঘ তিনদিন এখানে অবস্থান করতে হয়েছিল। অপরদিকে শত্রুপক্ষ তাঁকে খুঁজে না পেয়ে খুব পেরেশান হয়ে উঠলো। আবু জাহিল ঘোষণা দিল, "যে কেউ মুহাম্মদের মস্তক আমার নিকট এনে দেবে আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দেবো"। এ ঘোষণার ফলে চতুর্দিকে লোকজন দলে দলে বেরিয়ে আসলো। সবারই ইচ্ছা একশত উঠ পুরস্কার হিসাবে লুফে নেওয়া।

পুরো মক্কা শহরে খোঁজাখুঁজির পরও কাফিররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধান পেলো না। শেষ পর্যন্ত একদল লোক সুর পাহাড়ে আরোহণ করে ঐ গুহার একেবারে নিকটে এসে হাজির হলো। একসময় গুহার ভেতর থেকে তাদের পা দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠলো। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন কী হবে? দুশমনদের সংখ্যা অনেক আর আমরা মাত্র দু'জন!" তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন: "তুমি ভুল বলছো আবু বকর! আমরা দু'জন

নই- তিনজন। মনে রেখো, আমাদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ পাক আছেন! ভয়ের কোনো কারণ নেই। তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন।" পবিত্র কুরআন শরীফে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা তাওবাহ : ৪০][৭]

আল্লাহর কী অপূর্ব কুদরত! কুরাইশরা দেখতে পেলো গুহার মুখে প্রকাণ্ড এক মাকড়সার জাল। এছাড়া একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটানোর জন্য তা দিচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে তারা ভাবতেই পারলো না যে, এই গুহার ভেতর কেউ থাকতে পারে! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবিবকে দুর্বলতম মাকড়সার একটি জাল ও একজোড়া কবুতর দ্বারা দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করে দিলেন। একমাত্র তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰه عَلِيمًا حَكِيمًا

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ফাতাহ]

রাতের অন্ধকারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর গোলাম আমির ইবনে ফাহিরা যাত্রা করলেন মদীনা মুনুওয়ারার পথে। পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেগভরা কণ্ঠে বললেন: "হে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! কতো সুন্দর শহর তুমি, আর আমার কতো প্রিয় ভালোবাসার তুমি! যদি আমার জাতি

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

আমাকে এখান থেকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতাম না।"

সুরাকা ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘটনা

সচরাচর রাস্তা পরিত্যাগ করে অন্য এক রাস্তায় তাঁরা পাড়ি জমালেন। কুরাইশরা তাঁদের কোনো সন্ধানই পেলো না। তবে মুদলিজ গোত্রের সর্দার সুরাকা ইবনে মালিক [পরবর্তীতে ইসলামধর্মে দীক্ষিত] একশত উটের লোভ সামলাতে না পেরে হিজরতকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। অশ্বারোহী সুরাকা যখন মুবারক সেই কাফিলার নিকটবর্তী হলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুটা বিচলিত হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীকে সান্ত্বনা দান করলেন এবং সাথে সাথে এই দু'আও করলেন: "আয় আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা তাকে (সুরাকাকে) দমন করুন"। সুবহানাল্লাহ! দু'আর সাথে সাথেই সুরাকার ঘোড়ার পাগুলো বালুকার মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেলো। তিনি আর আগে পা বাড়াতে পারলেন না। সুরাকা এই অবস্থা দেখে বুঝতে সক্ষম হলেন, যা তিনি ইচ্ছা করেছেন তা তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হবে এবং হিজরতকারী এই কাফিলা সাধারণ নয়। তাই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে সাথে সাথে ক্ষমা করে দিলেন। এছাড়া তার ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

"হে সুরাকা! সে সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন পারস্য সম্রাটের কঙ্কন তুমি তোমার হাতে পরবে?"

পরবর্তীতে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সামনে যখন পারস্য সম্রাট কিসরার কঙ্কন, কোমরবন্দ, মেখলা ও শাহী মুকুট এনে হাজির করা হলো তখন তিনি এই সুরাকাকে ওগুলো পরার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কুবা পল্লীতে অবস্থান

যে ভ্রমণ পুরো মানবজাতির ইতিহাসকে সর্বকালের জন্য পরিবর্তন করে দিয়েছিল সেই হিজরতের ভ্রমণ শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। অবশ্য পাঁচ শতাধিক আনসারসহ মদীনার আবালবৃদ্ধবনিতা এই মুবারক কাফিলাকে এমন এক অপূর্ব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

করেছিল যে, ইতিহাসে তার তুলনা খুবই বিরল। বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে এই অভ্যর্থনার বর্ণনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মদীনার কিশোর-কিশোরীরা ধপ বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলো:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَتِ الْبِوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَادَعىٰ لِلّٰهِ دَاعٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا * جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

ছানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় ঘটেছে।
যতোদিন আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একজনও থাকবে, ততোদিন আমাদের উপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে।
আমাদের মধ্যে প্রেরিত ওহে সজ্জন! আপনি বাধ্যতামূলক আনুগত্যের নির্দেশ নিয়ে এসেছেন।

এই ঐতিহাসিক দিনটি ছিলো ১২ রবিউল আওয়াল হিজরি ১ম সন, ৩১শে মে ৬২২ ঈসায়ী। কুবা পল্লীতে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদই ছিলো ইসলামের প্রথম মসজিদ। এছাড়া এখানেই সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিক এই উভয় স্থানে দর্শনার্থীদের জন্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে ১৪ দিন পর্যন্ত কুবায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনার মূল শহরের দিকে অগ্রসর হোন।

অসংখ্য আনসার পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বীয় উট আল-কাসওয়ায় আরোহণ করে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। আনসার গোত্রপতিরা বার বার তাঁকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনীর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। বললেন, এটা আদিষ্ট হয়েছে। যেখানে গিয়ে এটা বসে পড়বে সেখানেই হবে তাঁর আবাসস্থল। আনসারদের কারো মনে দুঃখ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বর্তমান মসজিদে নববী যেখানে অবস্থিত সেখানে এসে উটনী বসে পড়লো। সে যুগে এই জায়গাটি ছিলো একটি উন্মুক্ত ময়দান। তবে নিকটস্থ বাড়িটি ছিলো প্রখ্যাত আনসার সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর। তিনি তো খুশীতে পঞ্চমুখ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই বাড়িতে মেহমান হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন।

মদীনা শরীফ পৌঁছেই তিনি উটনী যেস্থানে বসেছিল সেই ময়দান দু'জন ইয়াতীম ছেলের নিকট থেকে ক্রয় করে নিলেন। এরপর সেখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিলেন। এরপর তিনি স্ব-পরিবারে নিজের বাড়িতে যেয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে মাত্র ১০ বছর বয়স্ক হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হযরতের নিকট হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্রটিকে আপনার খাদিম হিসাবে আমি দান করতে চাই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাসের মাতার এই আবদার গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজীর গৃহে খাদিম হিসাবে ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর বেশ কিছু হাদীস শরীফ আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে পেয়েছি।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনা শরীফ পৌঁছার স্বল্পকাল পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এই ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণের কাজে স্বয়ং আল্লাহর হাবিবও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইট বহনকালে তিনি আবৃত্তি করতেন:

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاَخِرَة

فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة

হে আল্লাহ! আখিরাতের পুরস্কারই তো প্রকৃত পুরস্কার;
অতএব, আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি দয়া করুন।

আনসার ও মুহাজিররা উক্ত কবিতা পুনরাবৃত্তি করতে করতে তাঁকে অনুসরণ করতেন। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব সুন্দর ও আনন্দময় ছিলো সে দৃশ্য!

প্রথম হিজরি

হুজুরে পাক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের উপর অত্যল্প কিছু বর্ণনা তুলে ধরা ছাড়া আর বেশী গভীর গবেষণা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। ক্বাদিরী শায়খদের জীবনালোচনার পূর্বে সব তরীকার মূল সূত্র তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যময় জীবনের উপর আলোকপাত একান্ত জরুরী মনে করেই এই লেখার অবতারণা। যা হোক, এখন আমরা হযরতের মাদানী জিন্দেগীর দশটি বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী একে একে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

এই হিজরিতেই সর্বপ্রথম আযানের প্রথা শুরু হয়। নামাযে আসার জন্য 'ডাক' দেওয়ার ব্যাপারে সাহাবারা বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। কেউ বললেন একটি পতাকা উত্তোলন করা যাবে; কেউ বললেন, শিঙ্গা বাজানো যায়; অন্যরা বললেন, ঘণ্টা বাজিয়ে নামাযে আসার ইঙ্গিত দেওয়া যাবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসব মনঃপুত হলো না- এসব উপায় অন্যান্য ধর্মেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামের জন্য একক একটি ব্যবস্থা থাকা জরুরী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের যে কোনো ঐতিহ্য অনুসরণ মুসলমানদের জন্য আদৌ ঠিক নয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত এসে গেলো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখলেন, একজন ফিরিশতা এসে তাঁকে আযানের বাক্যগুলো শিক্ষা দিচ্ছেন। পরে জানা গেলো হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও অনুরূপ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এভাবে ডেকে মানুষকে নামাযের জন্য মসজিদে জড়ো করার প্রস্তাবটি ভালো লাগলো- তাই তিনি হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সর্বপ্রথম আযান দিতে নির্দেশ দিলেন।

এ বছরই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাথমিক দিনগুলোতেই আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরের শা'বান মাসে হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্ত্রী হিসাবে বসবাস শুরু করেন- যদিও তাঁর বিবাহ বেশ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরি

এ বছর রমজান মাসের রোজা, যাকাত, ঈদের নামায এবং সাদক্বায়ে ফিতরা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তখনও মুসলমানদের কিবলা ছিলো বাইতুল মাক্বদিস। এ বছর মসজিদে ক্বিবলাতাইনে নামাযরত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরীফের দিকে ঘুরিয়ে কিবলা পরিবর্তন করা হয়। সুতরাং মক্কা শরীফের বাইতুল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব-মুসলিমের কিবলা হিসাবে নির্দিষ্ট হলো। প্রথম ঈদুল আযহার নামাযও এ বছর সংঘটিত হয়।

জঙ্গে বদর

এ বছরের রমজান মাসের ১৭ তারিখ বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রখ্যাত যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন। অপরদিকে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো ৯৫০ জন। কিন্তু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং এক মহান বিজয় প্রদান করেন। এই যুদ্ধে মক্কাস্থ বড় বড় কাফির মুশরিক নেতারা নিহত হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ১৪ জন। এদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন আনসার এবং বাকী ৬ জন মুহাজির। কাফিরদের নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ৭০ জন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বেশে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদেরকে সামরিক শক্তি হিসাবে দৃঢ়পদ করে তুলে। পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে '**বদরী**' খেতাব প্রদান করা হয়।

যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে সাহায্যের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। এই দু'আটুকু মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দু'আ করেন: "হে আল্লাহ! যদি তুমি এই ক্ষুদ্র জামাআতটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত করবার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ করো। ও আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য চাই; তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।"

বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় তোমরা ছিলে অসহায়। অতএব আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো" [সূরা আলে-ইমরান : ১২৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا * سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

"যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।" [সূরা আনফাল : ১২]।

তৃতীয় হিজরি

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে প্রথম মৃত্যুবরণকারী সাহাবীর নাম ছিলো উসমান বিন মা'জুন রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ বছর তাঁর মৃত্যু হয়। মদীনা মুনুওয়ারার প্রখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। এ বছরের রমজান মাসে হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

জঙ্গে উহুদ

তৃতীয় হিজরির সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো জঙ্গে উহুদ। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে মদীনার উপকণ্ঠে ৭০০ মুসলিম বাহিনী ৩০০০ কাফির সৈন্যদের সঙ্গে চরম মরণপণ সমর-পরীক্ষার সম্মুখীন হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে ছোট্ট এক টিলায় থাকার নির্দেশ প্রদান করলেন। বললেন যুদ্ধের সময় তোমরা আমার নির্দেশ ছাড়া এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। এদিক থেকে কাফিরদের অশ্বারোহী বাহিনী হামলা করতে পারে। তাদেরকে যে কোনো মূল্যে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই নির্দেশের উপর অটল থাকতে

ব্যর্থ হওয়ায়, যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফির অশ্বারোহী বাহিনী পেছন দিক থেকে হামলা করে মুসলমানদের অবস্থা নাজুক করে ফেললো। নিশ্চিত বিজয় মুহূর্তে পলায়নরত কাফিরদেরকে দেখে ঐ ৫০ তীরন্দাজদের অধিকাংশ গনিমতের মাল তুলে নিতে স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন। তাদের আমীর আবদুল্লাহ বিন যুবাইরসহ ১১ জন স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন না। তারা সেখানেই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এদিকে স্থানত্যাগকারীরা ভেবেছিলেন যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাফিররা পলায়ন করছে, তাহলে এখানে অবস্থানের আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের এই মারাত্মক ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত অনেক সাহাবীকে শাহাদতবরণ করতে হয়েছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবননাশের আশঙ্কা দাঁড়ায়। কাফিররা তাঁকে ঘিরে ফেলে। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, শহীদ হয়ে তাঁকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে যান। এরপরও উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস নামক এক নরাধম কাফিরের প্রচণ্ড প্রস্তরাঘাতে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দন্ত মুবারক শহীদ হয়ে যায়। ইবনে কুমাইয়্যাহ নামক আরেক কাফির তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত হানে। এই আঘাতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল, তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর এক কাফির গুজব তুললো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ পুরো যুদ্ধের ময়দানব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো। এতে কাফিররা যুদ্ধের উৎসাহ হারিয়ে ফেললো। এদিকে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিল চরম দুঃখ-বেদনা। এভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো।

উহুদ যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আসাদুল্লাহ হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ ৭০ জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল কারো পক্ষেই ছিলো না। কাফিররা এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এমনটি ভাবা ঠিক নয়। যুদ্ধের ময়দান থেকেই তারা ফিরে যায়। বিজয়ী হলে তারা অবশ্যই মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে মদীনা শরীফ দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা করতো। যুদ্ধ শেষে (তখনও) কাফির নেতা আবু সুফিয়ান মুহাজির প্রখ্যাত সাহাবীদের নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী গারে উহুদ নামে একটি স্থানে অবস্থান করলেন। আবু সুফিয়ানের ডাকাডাকি তাঁদের কর্ণগোচর হচ্ছিল। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কথা

বলতে নিষেধ করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন আবু সুফিয়ান বললেন, "যুদ্ধ পাশা খেলার মতো অনিয়মে ভরা। আজ কারো জয় হচ্ছে তো কাল জয় হচ্ছে অন্যের। দেবতা হোবলের জয় হোক!" এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, উমর! ওকে বলো, "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। তিনি ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই। আমাদের নিহতরা যাবে জান্নাতে আর তাদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে!" উমর ইবনে খাত্তাবের কণ্ঠে আবু সুফিয়ান এসব কথা শোনে জবাব দিলেন, "আমাদের রয়েছে উয্যা দেবতা- তোমাদের উয্যা নাই!"

সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা এর জবাব কি দেবো?"। তিনি বললেন, "তোমরা বলো, الله مولنا ولامولى لكم - "আল্লাহ আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নাই!" এরপর যখন উভয় পক্ষ যার তার গন্তব্যপথে রওয়ানা হয়ে গেলেন তখন, কাফিরদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জের সুরে একজন বললো, "হে মুসলমানগণ! আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় আমরা তোমাদের মুকাবিলা করবো"। এতদশ্রবণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে জবাব দিতে বললেন, "বলো! হ্যাঁ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এই তারিখই বহাল রইলো।"

এদিকে মদীনা মুনুওয়ারায় যুদ্ধের খবর দ্রুত পৌঁছে গেল। মহিলা, কিশোর-কিশোরী ও বৃদ্ধরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কাফিররা বিজয়ী হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অসংখ্য মুসলিম সৈন্য নিহত হয়েছেন। এরূপ খবর শ্রবণে তারা ভীষণ মনঃক্ষুন্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুরুষ-মহিলাদের অনেকেই ছুটে চললেন উহুদের দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানা গেলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন তখন তারা সুস্থির বোধ করলেন। যদিও অনেকেই তাদের নিকটাত্মীয়- পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র ইত্যাদি হারিয়েছিলেন, তথাপি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন দেখে সকলে সেসব হারানোজনদের দুঃখ ভুলে গেলেন। নবীজীর প্রতি ভালোবাসার কী অপূর্ব নিদর্শন!

চতুর্থ হিজরি

এ বছর হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরের সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিলো বীর মাউনায় ৬৯ জন সাহাবীর করুণ

শাহাদাতবরণ। এদের সকলেই হাফিজ ও অনেকে আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলেন। একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু জীবন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে করুণ এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনার উপর সঠিক বর্ণনা আমরা বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থ থেকে এখানে তুলে ধরছি।

নজদ অঞ্চলের আমির বিন মালিক নামক এক ব্যক্তি একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। তবে সে তার গোত্রকে ভয় করে সুতরাং একদল বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানবান সাহাবী যদি সেখানে ইসলামের দাওয়াতের জন্য পাঠানো হয়, তাহলে বেশ উপকার হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। সত্তুর জন সাহাবীর এক কাফিলা যখন বীর মাউনা নামক স্থানে পৌঁছুলো তখন বনী সুলায়ম এর উসাইয়্যা, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র সম্মিলিতভাবে একরূপ নিরস্ত্র এই কাফিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাহাবারা যেটুকু সম্ভব প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন কিন্তু একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পান। তিনি পরবর্তীকালে খন্দক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ লাভ করেন।

বীর মাউনায় হযরত ইবনে মিলহান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জাব্বার ইবনে সুলমা নামক একব্যক্তি হত্যা করেছিল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সাহাবী যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা শ্রবণ করে এই ঘাতক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন: আমাকে ইসলামের দিকে যে জিনিস ধাবিত করেছিল তা ছিলো এই যে, আমি বীর মাউনায় ইবনে মিলহানের দিকে বল্লম নিক্ষেপ করি। এটা তাঁর বক্ষদেশ ভেদ করে গেল। তিনি এ সময় যে বাক্য তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিলো: "কাবার প্রতিপালকের কসম! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি, হয়েছি সফলকাম"। তিনি আরো বলেন, এই বাক্যটি শ্রবণ করে আমি অবাক হলাম। আমি তাঁকে হত্যা করলাম, আর তিনি মৃত্যুর সময় বললেন, সফলকাম হয়েছি! পরবর্তীতে বুঝতে সক্ষম হলাম, শাহাদাতবরণের অমিয় সুধাপানে আত্মহারা হয়ে তিনি এরূপ বলেছিলেন। আমি তাই এই মহান ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করলাম ও ইসলামে দীক্ষিত হলাম।

বীর মাউনার এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবতই খুব বেশী মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে সেখানে প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল।

এ বছরের রবিউল আওয়াল মাসে ইয়াহুদী গোত্র বনী নাদিরের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অভিযান সংঘটিত হয়। এই গোত্রটি ছিলো ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ও হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। উদ্দেশ্য ছিলো বনী আমিরের দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনা করা। বনী আমিরের সঙ্গে এদের মৈত্রী চুক্তি ছিলো। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে প্রকাশ্যে খুব ভালো মিষ্ট ব্যবহারের ভান করে এবং গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

সাহাবায়ে কিরামসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘরের দেওয়াল সংলগ্ন স্থানে বসা ছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো যে, এরূপ সুযোগ আর কোনদিন মিলবে না। উপর থেকে তাঁর মস্তকে বড় একটি পাথর ছুড়ে মারতে পারলেই হয়! তাঁর থেকে আমরা চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে যাবো। তাঁদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে সাথে সাথে সেখান থেকে উঠে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং এদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের আয়োজন শুরু হলো।

একদল মুজাহিদসহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাদিরে পৌঁছে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলেন। দীর্ঘ ৬ দিন অবরোধ রাখার পর বনী নাদিরের নেতারা প্রস্তাব দিলো যে, তারা উট যা বহন করতে পারে সে পরিমাণ মালামাল নিয়ে এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত- অবশ্য কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। সুতরাং বিনা রক্তপাতেই বনু নাদিরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করা হলো। এই অভিযানের সময়ই সুরা পান নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাজিল হয়।

এ হিজরির শাওয়াল মাসে উম্মে সালামাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। অপরদিকে তাঁর স্ত্রী হযরত জায়নাব বিনতে খুজাইমাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা মাত্র ৮ মাসের বৈবাহিক জীবন অতিক্রান্ত করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পঞ্চম হিজরি

এ হিজরির মুহাররম মাসে 'যাতুর রিক্বা' অভিযান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদের দুষ্ট বনী মাহারিব ও বনী ছা'লাবা গোত্রদ্বয়কে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নাখলা নামক স্থানে পৌঁছার পর অনেকের পায়ে ফোসকা পড়ে যায়, কারণ উটের সংখ্যা কম থাকায় অধিকাংশ মুজাহিদকে হেটে যেতে হয়েছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের ৬ জনের মধ্যে মাত্র ১টি উট ছিলো। ফলে পদব্রজে চলতে গিয়ে সকলের পায়ে ফোসকা পড়ে যায় এবং পায়ের নখ পর্যন্ত উপড়ে যায়।" এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য লোকে নিজেদের পায়ে পট্টি বেঁধেছিলেন। এজন্য এ যুদ্ধ গাযওয়া যাতুর রিক্বা বা পট্টিওয়ালা যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করে। তবে আসলে যুদ্ধ হয় নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসময় সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামাযও আদায় করেন।

এই যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। সাহাবায়ে কিরামও অন্যান্য বৃক্ষরাজির ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বীয় তলোয়ার গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমাদের তন্দ্রা এসে গেলো। কিছুক্ষণ পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাক দিলেন। সেখানে গিয়ে দেখি এক বেদুঈন বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবগত করলেন, এই লোকটি আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে আমার তলোয়ার হাতে তুলে নেয়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমার মাথার উপর তলোয়ারখানা উঁচিয়ে রেখেছে। সে বললো: এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? আমি জবাব দিলাম: আল্লাহ। এই দেখো, সে এখন বসে আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো সাজা দিলেন না। আসলে লোকটির হাতদ্বয় সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গিয়েছিল।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অশ্ব থেকে পড়ে যেয়ে আহত হন এবং মাশরাবায় তিনি ৫দিন অবস্থান করেন; হযরত জওয়ারিয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন; মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার চেষ্টা করে। পরে স্বয়ং আল্লাহ পাক হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার উত্তম নিষ্কলুষ চরিত্রের স্বীকৃতি হিসাবে আয়াত নাযিল করেন। অপবাদকারীদেরকে সনাক্ত করে শরয়ী নিয়মানুযায়ী ৮০ দুররা মারা হয়।

খন্দকের যুদ্ধ

এ হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো খন্দকের যুদ্ধ। একে আরবীতে গাযওয়ায়ে আহযাব বলে। এ বছরের (অর্থাৎ ৫ম হিজরির) শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সূচনা হয়। মক্কার কুরাইশ কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে নও-মুসলিমদের এটিই ছিলো চূড়ান্ত যুদ্ধ। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। এই বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যেয়ে মুসলমানরা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হোন। সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, সে সময় মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল" [সূরা আহযাব : ১০-১১]।

কুরাইশ, ইয়াহুদী ও গাফফান গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত এই বিরাট ফৌজ যখন মদীনার পানে অগ্রসর হলো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতির নাজুকতা সকলকে জানালেন। এরপর পরামর্শ হলো কী করা যায়। অনেকের প্রস্তাব শেষে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: ইয়া

রাসূলাল্লাহ! পারস্যদের একটি অতি পরিচিত ও কার্যকর সামরিক কৌশল হলো পরিখা খনন করা। অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে এই কৌশল বেশ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা মদীনা শরীফের যেসব এলাকা দিয়ে হামলার আশঙ্কা করছি সেখানে খন্দক বা খাল খনন করতে পারি। আরবদের নিকট এই কৌশল ছিলো সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পছন্দ করলেন। সুতরাং মদীনার উত্তর-পশ্চিম দিকের ময়দানে খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন। এদিক থেকেই মদীনা শরীফ আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সর্বাধিক।

প্রতি চল্লিশ হাত পর্যন্ত খন্দক খননে দশ জন করে সাহাবা নিযুক্ত করা হলো। খন্দকের দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার হাত, অর্থাৎ ২৫০০ গজ (১.৩ কি.মি)। এর গভীরতা ছিলো সাত থেকে দশ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ১০ হাত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক খননে নিজে শরীক হোন। এ সময় শৈত্যপ্রবাহ বেশ তীব্র ছিলো। খাদ্যের পরিমাণ সীমিত থাকায় একাধারে তিন-চারদিন পর্যন্ত অত্যল্প খাবার খেয়ে কিংবা উপবাসে থাকতে হয়েছিলো সাহাবায়ে কিরামকে। হযরত আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা ক্ষুধার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম এবং নিজেদের পেট খুলে দেখালাম। আমাদের পেটে তখন একটি করে পাথর বাঁধা ছিলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থা দেখে নিজের পেট মুবারক উন্মুক্ত করলেন। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে দু'টি পাথর বাঁধা আছে। এরূপ ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন ভাটা পড়ে নি- কারণ, তাঁরা যা করছিলেন তা ছিলো সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে: একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে খন্দকের নিকট যেয়ে দেখতে পেলেন ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে মুহাজির ও আনসাররা খনন কার্যে লিপ্ত আছেন। তাদের নিকট না ছিলো কোনো গোলাম কিংবা কর্মচারী যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সাহাবায়ে কিরামের এই কঠিন পরিশ্রম দেখে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মুবারক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'আ উচ্চারিত হলো:

"হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; অতএব আনসার ও মুহাজিরদের তুমি ক্ষমা করো।"

উপরোক্ত দু'আ যখন খননকারীদের কর্ণগোচর হলো তখন তাঁরাও বলতে লাগলেন:

نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد مابقينا ابدًا

"আমরা তো তারাই, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের জীবন প্রদীপ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেছি।"

ভবিষ্যদ্বাণী

খন্দক খননকালে এক বিরাট পাথর সামনে পড়লো। সাহাবাদের কেউই একে ভাঙ্গতে পারছিলেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানোর পর তিনি নিজেই কোদাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসলেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে এমন জোরে আঘাত হানলেন যে, পাথরটি এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেলো। সাথে সাথে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, "আল্লা-হু আকবার!" ধ্বনি। বললেন, আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার আঘাত করার ফলে পাথরখানার আরেক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তিনি আবারো 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের চোখে মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। এরপর আবার প্রচণ্ড আঘাত করলেন পাথরের উপর- এতে তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল। এবার আরো জোরে উচ্চারণ করলেন 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি, বললেন, আমাকে ইয়ামনের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। এখনই আমি সান'আ শহরের তোরণ অবলোকন করছি। সুবহানাল্লাহ! এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করছিলেন যখন আরবের বিরাট এক বাহিনী কর্তৃক মুসলমানরা পরিবেষ্টিত হচ্ছিলেন, তাদের জান-মালের তথা অস্তিত্বের নিশ্চয়তা পর্যন্ত ছিলো না। তীব্র শৈত্য প্রবাহ, ক্ষুধা, অভাব-অনটন ও বিরাট ক্লান্তিক্ষণে এই কথাগুলো যেনো সাহাবায়ে কিরামের কান-মন-দৃষ্টিতে দীর্ঘ ট্যানেল শেষে ক্ষীণ আলোর আভা ছিলো। কারণ, তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন হতে যাচ্ছে। আর তা অবশ্যই হয়েছিল। হযরতের মক্কী জিন্দেগী শেষ হতে না হতেই সিরিয়া, পারস্য, মিশর, ইয়ামন ইত্যাদি অঞ্চলের বিরাট বিরাট শক্তিধর রাজাধিরাজদের পরাজিত করে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি মু'জিযা প্রকাশিত হয়। এখানে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. পাথরগুলো নরম হওয়া

খননকারীরা যখন কোন পাথর ভাঙ্গার ব্যাপারে কষ্টের সম্মুখীন হতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের পানি দ্বারা কুলি করতেন ও কিছু পাঠ করে দু'আ করে এই পানি পাথরে ছিটিয়ে দিতে বলতেন। এতে পাথরগুলো বালির ঢিবির মতো নরম হয়ে যেতো।

২. খাবারে বরকত ও বড়ো পাথর ভাঙ্গা

খাবারের মধ্যে এমন বরকত হতো যে, অনেক লোক সামান্য খাবারেও তৃপ্ত হতেন এমনকি সমগ্র বাহিনীই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের দিন খননকাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় এক বিরাট প্রস্তর দেখা দিলো। এটা খন্দক খননে বাঁধার সৃষ্টি করছিলো, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, আমি নামছি। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে পাথর বাঁধা আছে। আমরা এ সময় তিনদিন যাবৎ উপবাসে ভুগছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাথরে কোদাল দিয়ে আঘাত হানার সাথে সাথে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে নিজের গৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। ঘরে পৌঁছে স্ত্রীকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে আমার ধৈর্য রাখতে পারছি না। তুমি খানাপিনার কোনো ব্যবস্থা করো। স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ- কিছু যব আর ঐ বকরির বাচ্চা দ্বারা খাওয়ানো যাবে। বাচ্চাটি জবাই করো। সুতরাং রান্নার ব্যবস্থা করে ফিরে গেলাম পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে। তাঁকে বললাম, আমি অল্প কিছু খানার ব্যবস্থা করেছি। আপনি দু'এক জনকে সাথে নিয়ে চলুন। তিনি জানতে চাইলেন খানার পরিমাণ কি? আমি বিস্তারিত বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, এতো অনেক বেশী খাবার! তুমি ফিরে যাও। তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি

না আসা পর্যন্ত ডেগচি চুলা থেকে নামাবে না এবং রুটি উনুন থেকে বের করবে না। এরপর সবাইকে ডেকে বললেন, হে লোকসকল বিসমিল্লাহ বলো! সকল আনসার ও মুহাজির দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমার বাড়িতে মেহমানদারির জন্য সবাইকে দাওয়াত করলেন। বললেন, জাবির এক বিরাট দাওয়াতের আয়োজন করেছে, আমরা সবাই তার বাড়িতে যেয়ে মেহমানদারী করবো।

বাড়ি পৌঁছে আমি স্ত্রীকে বললাম, খবর রাখো কিছু? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত লোকদের নিয়ে তোমার বাড়িতে খেতে আসছেন! স্ত্রী বললেন, খাবারের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেছেন কি? তাকে আমি সব খুলে বললাম। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে লোকসকল ভিড় করো না। সবাই বসে যাওয়ার পর তিনি ডেগচির ঢাকনা না খুলে রুটি ও গোস্ত পরিবেশন করতে বললেন। সুবহানাল্লাহ! সবাই পেট পুরে খেলেন কিন্তু রুটি ও গোস্ত শেষ হলো না। তিনি বললেন, এবার তোমার গৃহের সকলে খেয়ে নাও।

কুরাইশদের কর্তৃক মদীনা অবরোধ

দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে ছাউনি ফেললো। খন্দকের অপরদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'লা পাহাড়কে পেছনে রেখে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যবাহিনীসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান নিলেন। শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী সৈন্য সামনে এসে খন্দকের পারে থমকে দাঁড়ালো। তারা এরূপ যুদ্ধকৌশল কখনো অবলোকন করে নি। একটি স্থানে খন্দকের প্রশস্ততা কিছু কম ছিলো। সেদিকে আরবের প্রখ্যাত অশ্বারোহী বীর আমর ইবনে আবদুদ অগ্রসর হয়ে হাঁক ছাড়লো: কে এমন আছে যে, আমার মুকাবিলা করবে? হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এগিয়ে এসে বললেন, আমর! তুমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলে যে, কুরাইশদের কেউ তোমাকে দু'টো বিষয়ে দাওয়াত করলে তার একটি তুমি অবশ্যই কবুল করবে। আমর স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে আল্লাহ, তদীয় রাসূল ও ইসলামের দিকে দাওয়াত করছি। সে বললো, আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই! হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি! সে বললো, ভাতিজা! আমি তোমাকে হত্যা করতে

চাই না। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করতে চাই।

আমর এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। শুরু হলো যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শের-ঈ-খোদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তলোয়ারের আঘাতে আমরের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। আমরের সঙ্গী নওফাল এই অবস্থা দেখে দ্রুত সেখান থেকে পালালো।

খন্দকের যুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষ তেমন বেশী হয় নি। বার বার শত্রুরা খন্দক পার হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলো। আবু সুফিয়ান ভাবলেন, মদীনার মুসলমানদেরকে জব্দ করার একটি পথ হলো পুরো শহরকে অবরোধ করে রাখা। এতে সবাই অনাহারে অর্ধাহারে জর্জরিত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। সুতরাং অবরোধের পন্থাই তারা বেছে নিল। দীর্ঘ এক মাস এই অবরোধ স্থায়ী ছিলো। এমনিতেই সে বছর ছিলো আকাল- তার উপর এই অবরোধের ফলে মদীনা মুনুওয়ারায় কোনো পণ্যদ্রব্য বাইর থেকে আসছিলো না। ফলে সবার উপর নেমে আসে প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা। এদিকে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন হলো। তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে চাই। আসলে তা ছিলো না- এ ছিলো তাদের পালাবার একটি কৌশল মাত্র।

ভয় ও পেরেশানীর মধ্যে মুসলিম বাহিনী কালাতিপাত করছিলেন। শত্রু বাহিনী অবরোধ ওঠানোর কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছিলো না। একদিন গাতাফান গোত্রের নু'আম ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওমের অজান্তে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আপনার অভিপ্রায়মাফিক হুকুম করুন। তিনি বললেন, যুদ্ধ হলো কৌশল বা হিকমাতের নাম। তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে পারো। শত্রুপক্ষের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরাতে তুমি চেষ্টা চালাও। তার চেষ্টার ফলে বনী কুরাইজা ও কুরাইশদের মধ্যে বিশ্বস্ততার সন্দেহ সৃষ্টি হলো। পরিণতিতে তাদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি ভয়ের সঞ্চার হলো। সুতরাং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা কুরাইশদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এদিকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে গেল। এক রাতে কাফির-মুশরিক বাহিনীর উপর দিয়ে এমন এক প্রবল শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলো যে, তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে পড়তে লাগলো। রান্নার সরঞ্জামাদি উল্টে-পাল্টে পড়লো। এই করুণ অবস্থাদৃষ্টে আবু সুফিয়ান বললেন, হে কুরাইশগণ! এখন আর এখানে অবস্থান করার উপায় বাকী নেই। আমাদের খচ্চর ও ঘোড়াগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। বনী কুরাইজা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। খুব ভয়ঙ্কর এই প্রবল ঝড়-তুফানে যে কী বিরাট কিয়ামত কাণ্ড ঘটাচ্ছে তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। আমাদের কোনো আশ্রয়স্থলই নিরাপদ ও অক্ষত নেই। এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। আমি ফিরে যাবার ইচ্ছা করছি। আবু সুফিয়ান এটুকু বলে নিজের উটে আরোহণ করে যেতে লাগলেন। পুরো কুরাইশ বাহিনী তার অনুসরণ করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করছিলেন। মুসলমানদের গোয়েন্দা হুজাইফা ইবনে ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে তাঁর নিকট সব সংবাদ দিলেন। সুতরাং খন্দক যুদ্ধের অবসান হলো। ভোর হতেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য-সামন্তদের নিয়ে মদীনা মুনুওয়ারায় ফিরে আসলেন। পবিত্র কুরআনে করীমে খন্দকের ঘটনার বর্ণনা এসেছে এভাবে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন" [সূরা আহযাব : ৯]। আরোও ইরশাদ হয়েছে:

وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

"আল্লাহ পাক কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায় নি। যুদ্ধ করতে আল্লাহই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী" [সূরা আহযাব : ২৫]।

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ৭ জন শহীদ হয়েছিলেন। অপরদিকে মুশরিকদের পক্ষে নিহত হয়েছিল ৪ জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধের পর বলেছিলেন: এ বছরের পর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হবে না। বরং তোমরাই তাদের ওপর হামলা করবে।

খন্দকের যুদ্ধের পরই বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ইয়াহুদী গোত্র বনী কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত হয়। তাদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক বিচারকার্যে মনোনীত হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুযায়ী ছয় শত পুরুষ বন্দীদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই ইয়াহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে সফল অভিযান শেষে মদীনা শরীফ শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য তাদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হলো।

ষষ্ঠ হিজরি

এ বছরে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুপুত্র হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সে সময় মারা যান। মদীনা শরীফে গুজব উঠলো, এই মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক বিদ্যমান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে অবগত করলেন: তাঁর সন্তানের মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্যগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। তোমরা বরং এ সময় নামায আদায় করবে। এই নামাযকে বলে, সালাতুল কুসূফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আদায় করেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

এই হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। এই সত্য স্বপ্নের কাল, মাস বা বছর নির্ধারিত ছিলো না। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এই স্বপ্ন শ্রবণে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠলেন। কারণ, তাঁরা নিশ্চিত জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নও ওহীর মতো মহাসত্য। দীর্ঘ ছয় বছর মুহাজিররা নিজ জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত। মক্কা শরীফের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও সম্মানবোধ অস্থিমজ্জায় জড়িত হয়ে আছে, সেখানে ফিরে যেতে তাই সবাই উদ্গ্রীব। নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যেয়ে পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার সৌভাগ্য হয়তো অচিরেই পূর্ণ হবে এই ভেবে সকলেই অধীর অপেক্ষায় রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, এই বছরই পবিত্র উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সুতরাং হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। উমরার ইহরাম বেঁধে সবাই মক্কার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতিরোধ করলেন। জানা গেল কুরাইশরা তাঁর আগমনে ভীষণ অস্থির ও ঘাবড়ে গেছে। তিনি হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দূত হিসাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, হে উসমান! তুমি তাদের গিয়ে বলো, আমরা যুদ্ধের জন্য আসি নি। আমরা উমরা পালনের নিয়তে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ইসলামের দাওয়াতও দেবে।

বাইআতে রিদ্বওয়ান

উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসছিলেন না। তারপর সংবাদ পাওয়া গেল যে, কুরাইশরা তাঁকে শহীদ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সকলকে একত্রিত করে এই দুঃসংবাদ জানালেন। এরপর তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে সবাইকে বাইআত গ্রহণের আহ্বান করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। তাঁর আহ্বানে ১৪০০ সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে আল্লাহর রাসূলকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বাইআতের জন্য সর্বপ্রথম হাত বাড়ালেন হযরত আবু সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এরপর সকলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এই বাইআতই 'বাইআতে রিদ্বওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। এক মুনাফিক ছাড়া সকলেই বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত থাকলে তিনিও বাইআতে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাত মুবারক দেখিয়ে সবাইকে

বললেন, এই হাত উসমানের। অর্থাৎ তাঁর উভয় হস্ত মুবারক একটা আরেকটার উপর রেখে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে বাইআত করলেন।

বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা বেহেশতে প্রবেশ করবেন। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বাইআত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:
لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"মু'মিনগণ যখন বৃক্ষের নীচে আপনার হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেছিল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের হৃদয়ে যা ছিলো সে ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয়" [সূরা ফাতাহ : ১৮]।

আরও ইরশাদ হয়েছে:
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ * فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ * وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"যারা তোমার হাতে বাইআত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাইআত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন" [সূরা ফাতাহ : ১০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাইআত সম্পর্কে বলেন: "ইনশাআল্লাহ! এই বৃক্ষের নীচে যারা বাইআত করেছে, তাদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"। একথা শ্রবণে হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:
وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا

"তোমাদের প্রত্যেকেই এটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" [১৯ : ৭১]।

এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটাও বলেছেন:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

"অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো"।

বাইআত শেষ হওয়ার পর আসন্ন যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এমন সময় সকলে দেখতে পেলেন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসছেন। এতে অবশ্যই সবাই যারপরনেই আনন্দিত হলেন, তাঁদের উদ্বেগ ও অশান্তির অবসান হলো। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জানালেন যে, কুরাইশরা একা উমরাহ করার জন্য তাঁকে বলেছিলো, তিনি তা অস্বীকার করেন। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে রেখেছিল। পরে তারা জানালো, মুসলমানরা মরণপণ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাই তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়।

এদিকে কুরাইশরা বুঝতে সক্ষম হলো যে, মুসলমানরা সত্যিই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেন নি- তাই তাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র সীমিত ছিলো। সবাই মিলে দুরভিসন্ধি করলো যে, এই সুযোগে মুসলমানদেরকে খতম করে দেওয়া যায়। তাই তারা একদল অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলো। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলো মিরকায। তারা একটি গোপন পথে মুসলমানদের নিকটবর্তী হলো আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আসলে মুসলিম বাহিনী মোটেই অপ্রস্তুত ছিলো না- তারা পুরো কাফিলা পাহারার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একদল দক্ষ সৈন্য কুরাইশদের ঘিরে ফেলেন ও প্রায় সবাইকে বন্দী করতে সক্ষম হন। শুধুমাত্র সেনাপতি মিরকায পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের সকলকেই বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। তাঁর মহানুভবতা কুরাইশদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।

সন্ধির প্রয়াস

কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব দিলো। তারা একে একে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে লাগলো। প্রথমে আসলো উরওয়া ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী। সে কিছু অসংযত উক্তি করেছিল বিধায় তার দ্বারা কোনো কাজ হলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাত লক্ষ্য করে সে অভিভূত হয়েছিল। সে মক্কা শরীফ ফিরে যেয়ে বললো, "আমি বড় বড় রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়েছি। তাদের শান-শওকত দেখেছি কিন্তু আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের সাহাবীগণ তাঁকে যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন তা বিশ্বজগতের কোথাও দেখি নি।"

এরপর প্রতিনিধি হিসাবে হুলায়াস ইবনে আলকামা, মিরকায ইবনে হাফস এবং সবশেষে সুহায়ল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা চূড়ান্ত করা ও চুক্তি সম্পাদনের জন্যই সুহায়ল দূত হিসাবে এসেছিলেন। যা হোক কুরাইশদের শর্তাবলীর অনুকূলে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হলো। ঐতিহাসিক এই সন্ধির ক'টি শর্ত ছিলো:

১. এ বছর মুসলমানগণ উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন।
২. আগামী বছর এই মুলতবী উমরা কাযা করতে পারবেন। তবে মাত্র তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থানের অনুমতি পাবেন।
৩. কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া উমরা পালনের সময় আর কোনো অস্ত্র আনতে পারবেন না।
৪. মক্কায় অবস্থানরত কোনো মুসলমান মদীনায় চলে গেলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু মদীনা হতে কেউ মক্কায় চলে আসলে তাকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হবে না।
৫. এই সন্ধি দশ বছর বলবৎ থাকবে।

সুহাইল খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু চুক্তিপত্র লিখতে বসলেন। তিনি প্রথমেই লিখলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুহাইল বাঁধা দিয়ে বললেন, থামুন! রাহমান ও রহীম কে তা আমরা জানি না। আমরা লিখে থাকি: باسك اللّٰهم (হে আল্লাহ! তোমার নামে), সুতরাং তা-ই লিখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ঠিক আছে, এটাই লিখো। এরপর লিখা হলো:

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله

"এটা সেই চুক্তিপত্র যার প্রতি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীকৃতি প্রদান করেছেন"। সুহাইল এবারও বাঁধা দিয়ে বললেন, থামুন! আমরা যদি মুহাম্মদকে [সা.] আল্লাহর রাসূল মেনে নিতাম, তাহলে আপনাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হতো কেন? বরং লিখুন: محمد بن عبد الله অর্থাৎ 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ'। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। এরপরও তুমি যা চাও তা-ই লিখা হবে। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি কিছুতেই 'رسول الله' শব্দটি কাটতে পারবো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও- আমিই তা কেটে দিচ্ছি। তিনি তা কেটে দেওয়ার পর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেই স্থানে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ' শব্দ ক'টি লিখে দিলেন।

বন্দী অবস্থায় আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আগমন

চুক্তিপত্র তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। শৃঙ্খল বেষ্টিত অবস্থায় কুরাইশ দূত সুহাইলের পুত্র হযরত আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেথায় এসে উপস্থিত হলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে আবদার করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মদীনা শরীফ নিয়ে যান। চরম নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।

স্বীয় পুত্রকে দেখে সুহাইল এগিয়ে এসে আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর গালে একটি চপেটাঘাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে দাবী করলেন, চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী আমার পুত্রকে অবশ্যই আমার হাতে ফিরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সুহাইল! এখনও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয় নি। অন্তত আমার খাতিরে আবূ জান্দালকে আমাদের সাথে যেতে দাও। কিন্তু সুহাইল কিছুতেই তা মানলেন না। সুতরাং অগত্যা আবূ জান্দালকে সুহাইলের নিকট ফেরৎ দিতে হলো। এদিকে চরম নির্যাতনের শিকার হযরত আবূ

জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা এ কী করছো? এই যালিমদের হাতে আমাকে ফেরৎ দিচ্ছো। দয়া করে আমাকে রক্ষা করো! তাঁর এই আবদার শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন আবূ জান্দালের এই অবস্থা দেখে ক্ষোভে ও দুঃখে জ্বলছিলেন- কিন্তু মুখে কিছুই উচ্চারণ করলেন না। অবশেষে যখন আবূ জান্দালকে মুশরিকরা টেনেহেঁচড়ে মক্কাভিমুখে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো তখন উমর ইবনে খাত্তাবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন: "হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধরো। এরা মুশরিক, তাদের রক্ত আল্লাহর নিকট কুকুরের রক্ততুল্য!"

শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করলেন। মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আওফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাহল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী। মুশরিক পক্ষে সাক্ষী হিসাবে ছিলেন: মিরকায ইবনে হাফস, হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উযযা প্রমুখ।

সন্ধির শর্তে হযরত উমরের প্রতিক্রিয়া

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী প্রায় সবগুলোই ছিলো মুশরিকদের পক্ষে। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সবাই দুঃখে ফেটে পড়ছিলেন কিন্তু মুখে কিছু উচ্চারণ করছিলেন না। তবে ভবিষ্যৎ খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: আপনি যে আল্লাহর রাসূল তা কি সত্য নয়? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূল। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা যে পথে আছি তা কি ন্যায় ও সত্যের পথ নয়? আর কাফিরগণ যে পথে আছে তা কি অন্যায় ও অসত্যের পথ নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, নিশ্চয়। উমর আবার বললেন, তবে দীনের কাজে আমরা এতো দুর্বলতা দেখাই কেন? এতো অপমান

কেন সহ্য করবো? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। আমি কিছুতেই তাঁর আদেশ অমান্য করবো না। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি বলেন নাই আমরা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করবো? তিনি জবাব দিলেন, তবে এই বছরই তাওয়াফ করবো তা বলি নি। উমর, ধৈর্য ধরো। অচিরেই আমরা সকলে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবো।

হুদাইবিয়া থেকেই মুসলমানরা কুরবানী সেরে মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম থেকে মুক্ত হলেন। এরপর আরো তিনদিন হুদাইবিয়ায় অবস্থান করে কাফিলা মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কাফিলার প্রায় সবাই দুঃখে জর্জরিত। তাঁদের ধারণা মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কুরাউল গামীম নামক স্থানে কাফিলা এসে পৌঁছার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে হঠাৎ ওহী নাযিলের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হলো। তিনি একটু পরই বললেন, হে আমার সাহাবীগণ! তোমাদের রব অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়" [সূরা ফাতাহ : ১]

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয়ের ঘোষণা শ্রবণ করে বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, এটা কী বিজয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্ত স্বরে প্রফুল্লচিত্তে বললেন, হ্যাঁ, এটাই বিজয়। হযরত উমরের মনে সান্ত্বনা আসলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ঐতিহাসিক সন্ধিই মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত বিজয়ের কারণ হবে। আর তা-ই ছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবূ বাসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে আসেন। মুশরিকরা সাথে সাথে সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরৎ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তি পাঠিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে আবূ বাসিরকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাতে তুলে দিলেন। আবূ বাসির বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এসেছি। আপনি আমাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এটা সন্ধির

শর্ত। তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য কোনো পন্থা বের করে দেবেন।"

মক্কার দু'জন দেহরক্ষী আবূ বাসিরকে নিয়ে রওয়ানা দিলো। রাস্তায় তিনি একজন দেহরক্ষীর তরবারির প্রশংসা শুরু করলেন। রক্ষী এতে নিজেকে বড়ো ও গৌরবান্বিত মনে করলো। সে এক পর্যায়ে তার ঐ তরবারি হযরত আবূ বাসিরের হাতে তুলে দিল। বললো, "আমি এটা অনেক লোকের উপর ব্যবহার করেছি!" তরবারি হাতে নিয়ে আবূ বাসির তাকে খতম করে দিলেন। ওপর রক্ষী এই দৃশ্য দেখে জীবন নিয়ে পালালো।

আবূ বাসির আবার মদীনা শরীফ ফিরে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আবদার করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এখন আমাকে এখানে থাকতে দিন।" কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা আছে। আবূ বাসির ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মদীনা শরীফ থেকে চলে গিয়ে সাগর সৈকতে একটি স্থানে বসবাস শুরু করলেন।

এদিকে হুদাইবিয়া থেকে ফেরৎ যাওয়া সাহাবী আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুদিনের মধ্যেই আবার পালিয়ে আসলেন। তিনি সমুদ্র সৈকতে লুকিয়ে থাকা আবূ বাসিরের সঙ্গে যোগ দিলেন। ধীরে ধীরে মক্কা শরীফ থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানরা এখানে এসে একটি বসতি গড়ে তুললেন। অতি শীঘ্রই বেশ বড়ো একটি উপনিবেশ গড়ে উঠলো। তবে মরুভূমির উপর তাঁদের জীবন ছিলো অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং জীবনরক্ষার্থে তারা কাফির-মুশরিকদের বাণিজ্য কাফিলার উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। মক্কা শরীফ থেকে যেসব কাফিলা এদিকে যাতায়াত করতো তারা এদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সবকিছু লুটপাট করে নিতেন। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা মদীনা শরীফ দূত পাঠিয়ে সন্ধির এই শর্ত বাতিল করার প্রস্তাব দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পত্রযোগে এই সংবাদ আবূ বাসিরের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রখানা হাতে রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। সমুদ্র সৈকতে গড়ে ওঠা মুসলিম

উপনিবেশের সবাই মদীনা মুনুওয়ারায় চলে আসলেন- সে সাথে পরবর্তীতে মক্কা শরীফ থেকে হিজরতকারীরাও বিনা বাধায় আসতে শুরু করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরই প্রখ্যাত মুসলিম সেনানায়ক হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা মদীনা মুনুওয়ারায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খালিদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর হাতে সিরিয়া এবং হযরত আমর ইবনে আস এর হাতে মিশর বিজিত হয়েছিল।

সপ্তম হিজরি

এই হিজরিতেই প্রখ্যাত খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কৃত ইয়াহুদীরা এখানে বসবাস শুরু করে। এরপর তারা প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুতরাং এদের দমন-কল্পে হুদাইবিয়ার সন্ধি সমাপ্ত করে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক মাসের ভেতর ১৫০০ মুজাহিদের এক বাহিনী গঠন করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর নির্দেশ মুতাবিক এই যুদ্ধে বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবারাই শুধু যেতে পেরেছিলেন।

মদীনা শরীফ থেকে খায়বারের দূরত্ব ১২৫ মাইল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মুহাররমের ২০/২১ তারিখ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধ ছিলো দুর্গ কেন্দ্রিক। সর্বমোট ৬টি মতান্তরে ১০টি দুর্গে ইয়াহুদীরা বাস করতো। মুসলমানরা একটার পর আরেকটা দুর্গ দখল করে নেন। সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গের নাম ছিলো কামূস। এটি বার বার আক্রমণ করেও মুসলমানরা দখল করতে ব্যর্থ হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। এই দুর্গ বিজয়ের গৌরব তাকেই আল্লাহ তা'আলা দান করবেন।

সাহাবীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে উঠলো। সবার ভাবনা, কার ভাগ্যে দুর্গ বিজয়ের গৌরব নিহিত আছে। সবাই ভোরে ওঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করলেন। কিন্তু আসলেন না শুধু আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? একজন বললেন, চোখ-ওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করছেন তিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে আনতে বললেন। তিনি আসার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখ-নিঃসৃত লালা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দু'আ করলেন। সুবহানাল্লাহ! সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলীর চোখ ভালো হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা হযরত আলীর হাতে ঝাণ্ডা প্রদান করে বললেন, "যাও! যুদ্ধ করো যতক্ষণ না বিজয় নিশ্চিত হয়। এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করো না।" অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রথমে শত্রুদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কথাও বলেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঢাল মাটিতে পড়ে যায় এবং এক ইয়াহুদী তা নিয়ে পলায়ন করে। এসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এমন রূহানী শক্তির সঞ্চার হলো যে, দুর্গের ভারী লৌহ নির্মিত দরজা উপড়িয়ে তা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। যুদ্ধ শেষে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই দরজা ছুড়ে মারলেন। এরপর দেখা গেলো আট জন শক্তিশালী ব্যক্তি একত্রে মিলেও এই দরজাটি ওঠাতে পারছেন না!

দুর্গ বিজিত হলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা আলীকে চুম্বন করলেন। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ কিসের ক্রন্দন, দুঃখের না আনন্দের?" তিনি জবাব দিলেন, আনন্দের।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনা হলো: খায়বারে ধৃতা হযরত সাফিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পন্ন হওয়া; মু'তআ বা অস্থায়ী বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ; মুসলমানদের জন্য গৃহপালিত গাধা ও শিকারী জন্তুর মাংস হারাম হওয়া; এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মাতা হযরত উম্মে রুমান রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যুবরণ ছিলো এ হিজরির বিশেষ ক'টি ঘটনা।

উমরাতুল কাযা

এ বছরের যুল-কা'দা মাসে সন্ধির শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতবী উমরার কাযা আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত সকল সাহাবাসহ আরো অন্যান্য আনসার-মুহাজির এই উমরা পালনে শরীক হলেন। এতোদিন পরে মুহাজিররা তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন-আনন্দের বন্যা সর্বত্র বইতে লাগলো। দুই হাজার সাহাবীর এক বিরাট কাফিলাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী শুধুমাত্র কোষবিদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্র কেউই সাথে নিলেন না। তবে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০০ বীর সাহাবীকে যুদ্ধরক্ষী হিসাবে অস্ত্রশস্ত্রসহ আগেই পাঠিয়ে দিলেন। তবে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন যে, তারা যেনো মক্কা শরীফের হারাম সীমানার ভেতরে না ঢুকেন। এই বাহিনী নির্দেশ মুতাবিক 'মাররায যাহরান' নামক উপত্যকার ইয়াজাজ এলাকায় যেয়ে শিবির স্থাপন করে। কুরাইশরা এদের খবর পেয়ে ঘাবড়ে যায়। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে নিশ্চিত হলো যে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি। সন্ধির শর্ত পুরোপুরিভাবে পালিত হবে।

মক্কা শরীফের দৃশ্য এক আশ্চর্য চিত্র ধারণ করলো। কুরাইশদের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পাহাড়-পর্বতের উপর আশ্রয় নিলো। তাদের শঙ্কা ছিলো, নগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এসব মুসলমানরা হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অপরদিকে অনেকেই আবার দারুন-নাদওয়ার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের কর্মকা-অবলোকন করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিক দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। পবিত্র বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হতেই তিনি আবেগভরা কণ্ঠে তালবিয়ার আওয়াজ তুললেন:

لبيك اللّٰهم لبيك * لبيك لاشريك لك لبيك * ان الحمد والنعمة **لك والملك** * **لاشريك لك** *

"হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, প্রভু হে! আমি হাজির। সকল প্রশংসার যোগ্য তুমিই, সকল দান-অনুদান তোমারই আজ্ঞাধীন। রাজত্ব তোমারই কর্তৃত্বাধীন, তোমার কোন শরীক নাই।"

এই অপূর্ব তালবিয়ার ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলো সাহাবাদের হাজারো কণ্ঠ, মুখরিত হয়ে ওঠলো মক্কা শরীফের আকাশ-বাতাস। কাফির-মুশরিকরা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের এই কাফিলার হৃদয় নিংড়ানো কর্মকা-। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কী অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ। মালিকের দরবারে বান্দার আনুগত্যের কী সুন্দর নমুনা!

সন্ধির শর্তানুযায়ী মুসলমানগণ তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যে সাহাবায়ে কিরাম প্রিয় জন্মভূমি ঘুরে দেখতে লাগলেন। ফেলে যাওয়া বাড়িঘর ও ভিটা দেখে আবেগ-আপ্লুত হলেন- অনেকের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। স্বাধীনভাবে চলতে কেউ কোনো বাধাও দেয় নি। তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে কাফিলাসহ যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হলো। মদীনা শরীফ যাওয়ার পথে 'সরিফ' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি হয়। এখানেই হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাত্রিযাপন করেন। আর এই স্থানেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হিজরি ৬৩ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর এখানেই বিদ্যমান।

আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ষষ্ঠ হিজরির শেষ ভাগ থেকে সপ্তম হিজরির প্রথম ভাগের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রযোগে আরব উপদ্বীপ ও চতুর্দিকের অঞ্চলসমূহের আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের নিকট দূত মারফত ইসলামের দাওয়াত দেন। যেসব সম্রাট ও বাদশাহদের নিকট পত্র দেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী এবং মিসরের বাদশাহ মুকাওকিয়াস প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রের মধ্যে দাওয়াতের নমুনা ছিলো এরূপ: " .... আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন ... "।

অষ্টম হিজরি

এই হিজরিতেই মূ'তার যুদ্ধ ও মক্কা-বিজয় সংঘটিত হয়। মূ'তার যুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রথম এক বিরাট রোমান ফৌজের মুখোমুখি হয়। আর মক্কা-বিজয় ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কুরাইশ মুশরিকদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ও চূড়ান্ত বিজয়। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উভয় ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরছি।

গাযওয়া মূ'তা

মূ'তা সিরিয়া অঞ্চলের একটি জনপদের নাম। মদীনা শরীফ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১১০০ কিলোমিটার। অঞ্চলটি ছিলো রোম সাম্রাজ্যের অধীনে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিস ইবনে উমায়ার আল-আযাদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পত্রসহ দূত হিসাবে বুসরা শহরের শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবনে আমর আল-গাসসানীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু দুষ্ট শুরাহবীল তাঁকে বন্দী করে শহীদ করে দেয়। দূত হত্যা সে যুগেও ভীষণ অন্যায় কাজ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই করুণ সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শুরাহবীল দূত হত্যার মতো অমার্জনীয় অন্যায়ই শুধু করে নি- সে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ এবং হুমকি থেকে মদীনাকে রক্ষার্থে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মূ'তা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

এই অভিযান অষ্টম হিজরির জুমাদাল ঊলা মাসে হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানের পূর্বে মোট তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই তিনজনই যে যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাবেন সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, "যদি যায়িদ নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন জাফর ইবনে আবি তালিব, তিনিও যদি নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আর তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে তোমরা কাউকে সেনাপতি হিসাবে নির্বাচিত করবে।"

মূ'তা অভিযানে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা রোমানদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ছিলো। মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে দুশমন বাহিনীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে পতাকা ছিলো। তিনি প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের উপর তরবারির আঘাত হানতে লাগলেন। এক পর্যায়ে শত্রুর বল্লমের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল- তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। পতাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত মুতাবিক জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তোলন করলেন। ব্যাপক যুদ্ধ শেষে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শরীরের সম্মুখদিকে বর্শা ও তরবারির নব্বুই ঊর্ধ্ব আঘাতের দাগ ছিলো।" তিনি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর দ্বীনের পতাকা নির্দেশ মুতাবিক হাতে তুলে নিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি তুমুল যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন।

এরপর পতাকা হাতে নিয়ে সাবিত ইবনে আকরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু চিৎকার দিলেন: হে মুসলমানগণ! তোমরা পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে নতুন সেনাপতি নির্বাচন করো। সবাই সর্বসম্মতভাবে মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কৌশলে মুসলিম বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। অপরদিকে শত্রু বাহিনী উত্তর দিকে চলে গেল। ইতোমধ্যে রাতের আঁধারে সমগ্র অঞ্চল ঢেকে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা সমীচিন মনে না করে উভয় পক্ষই আপাতত থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

পরদিন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক সুকৌশল অবলম্বন করে শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিলেন। তিনি পুরো মুসলিম বাহিনীকে এমন এক উপায়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন যে, অপরদিক থেকে মনে হচ্ছিল এক বিরাট বাহিনী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সবাই মিলে এমন উচ্চস্বরে 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি তুললেন যে, রোমান বাহিনী মনে করলো মদীনা শরীফ থেকে বুঝি সাহায্যকারী বিরাট বাহিনী এসে যোগ দিয়েছে। শত্রুদলে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা আর যুদ্ধ পরিচালনা উচিত হবে না ভেবে ময়দান থেকে চলে গেল। সুতরাং মাত্র ৩০০০

সৈন্যের এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে এভাবে আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রদান করলেন। সুবহানাল্লাহ!

এই যুদ্ধের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদূর মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে বসে অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যান। বুখারী শরীফসহ সহীহ রিওয়ায়েতে তাঁর এই মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতির শাহাদাতবরণের সংবাদ তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এখন যায়িদ পতাকা হাতে নিল, সে শহীদ হলো। জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হলো। এবার ইবনে রাওয়াহার হাতে পতাকা আছে, সেও শাহাদাতবরণ করেছে (এসব বলার সময় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো)।" তিনি আরো বললেন, "আল্লাহর তরবারির মধ্যে একটি তরবারির (অর্থাৎ সাইফুল্লাহর - খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) হাতে এখন পতাকা আছে- আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।"

মূ'তা যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হয়েছিলেন মাত্র ১২ জন। অপরদিকে শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে মোট নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এছাড়া যায়িদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমও যে অসংখ্য শত্রুসৈন্যদের কতল করে শাহাদাতবরণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিলো যে, আরবের যে কোনো গোত্র স্বাধীনভাবে মুসলমান অথবা কুরাইশদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে এবং এতে কোনো পক্ষ বাঁধা দেবে না। এই শর্তানুযায়ী দু'টি পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষকারী গোত্রের একটি মুসলমানদের সঙ্গে এবং অপরটি মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিল। মক্কার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বনী বাকর আর মুসলমানদের সাথে চুক্তি করেছিল বনী খুযা'আ। মক্কার নিকটেই বসবাসকারী বনী খুযা'আ ও মুসলমানদের মধ্যে এই মিত্রতা কুরাইশদের সহ্য হলো না। সুতরাং তারা চিরদুশমন এই গোত্রকে বনী বাকর কর্তৃক আক্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য-সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র প্রদান এমনকি ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, সুহাইল ইবনে

আমর প্রমুখ কুরাইশ জওয়ানরা ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়ে বনী খুযা'আর বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করলো না। বনী খুযা'আ অতর্কিত হামলায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তারা ভয়ে প্রাণ-রক্ষার্থে বাইতুল্লাহ্ শরীফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পৌত্তলিকরাও হারাম শরীফের ভেতর হত্যাকাণ্ড ঘটাতে ভয় করতো- কিন্তু বনী বাকার গোত্রের সর্দার নাওফাল বললো, "এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাবো না- কা'বাগৃহের মর্যাদা ভুলে যাও! সবাইকে হত্যা করো"। কুরাইশগণ হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত প্রকাশ্যে ভঙ্গ করে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সদলবলে যোগ দিল।

এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই খুযাঈরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করে সাহায্যের প্রার্থনা করলো। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন, সন্ধির শর্তানুসারে এখন খুযাঈদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মম এই অত্যাচারের ঘটনা শ্রবণে তিনি খুব মর্মাহত হলেন। কুরাইশরা যে সন্ধি ভঙ্গের নিমিত্তে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা বুঝতে বাকী রইলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে না যেয়ে প্রথমে দূত মারফত নিম্নোক্ত প্রস্তাবাদি পেশ করলেন:

ক. বনী খুযা'আকে তোমরা উপযুক্ত রক্তপণ দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করো;

খ. কিংবা বনী বাকরের সাথে সকল সম্বন্ধ বাতিল করো;

গ. অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল হয়েছে বলে ঘোষণা দাও।

কুরাইশগণ আগে থেকেই হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাই তারা দূতকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে, শেষোক্ত শর্তই আমরা মেনে নিলাম। সুতরাং কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে দিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল বিলম্ব না করে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে যে বিরাট ভুল করা হয়েছে কুরাইশরা তা অচিরেই উপলব্ধি করলো। মুসলমানদের আক্রমণের মুখে তাদের টিকে থাকা আর সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান দূত হিসাবে মদীনা শরীফ এসে সন্ধি পুনর্বহালের চেষ্টা চালালেন। মদীনা শরীফ এসে আবু সুফিয়ান স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। পিতাকে দেখে তিনি তড়িঘড়ি করে বিছানা তুলে ফেললেন। আবু সুফিয়ান এই দৃশ্য

দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বিছানা গুটিয়ে রাখলে কেন?"। উম্মে হাবীবা জবাব দিলেন, "আপনি অপবিত্র! কাফির! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিছানায় বসার উপযুক্ত আপনি নন!" আবু সুফিয়ানের মনে এ কথাগুলো বিরাট প্রভাব ফেললো। তিনি স্বভাবতই মনোক্ষুণ্ন হয়ে বের হয়ে গেলেন। মসজিদে নববীতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধি পুনর্বহালের প্রস্তাব দিলেন।

তার এই প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মঞ্জুর হলো না। অনেক চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে আবু সুফিয়ান নিজেই ঘোষণা করলেন, 'হে মদীনাবাসীগণ! শুনো, আমি হুদাইবিয়ার সন্ধিকে পুনঃবলবৎ ও সুদৃঢ় করে গেলাম।' এরপর তিনি মদীনা থেকে প্রস্থান করলেন।

আবু সুফিয়ানের ব্যর্থতা হেতু কুরাইশরা অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পতিত হলো। তারা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চরমভাবে পরাজিত হবে তা তারা জানতো। সুতরাং আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তারা ভীষণ ভয় ও শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো।

মক্কা যাত্রা

পবিত্র রমজান মাসের ১০ তারিখ, অষ্টম হিজরি মুতাবিক ১লা জানুয়ারী ৬৩০ ঈসায়ী সালে মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনীসহ রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

তকদির খুললো ইসলামের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানের

মারউ'জ যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাউনি ফেললেন। দশ হাজার সৈন্যের এই বিরাট বাহিনী পুরো বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাতের বেলা সর্বত্র বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। মক্কা শহর থেকে অদূরে অবস্থানরত এই সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হিযাম ও বুদায়াল ইবনে ওয়ারাকাকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলো। কিন্তু ছাউনির নিকটে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাহারারত একদল মুসলিম বাহিনীর হাতে আবু সুফিয়ান বন্দী

হলেন। তাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো। সবাই অপেক্ষা করছিলেন ইসলামের এই চরম দুশমনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ উপায়ে হত্যার নির্দেশ দেবেন সেটা শ্রবণ করতে। কিন্তু দয়ার সাগর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! তোমার মঙ্গল হোক। এখনও কি সময় আসে নি যে, তুমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই?"

হযরত উমরসহ উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। আবু সুফিয়ানের মনে নবীজীর এই করুণা-ভরা দাওয়াত রেখাপাত করলো। তিনি যে ধীরে ধীরে সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছিলেন তা নিজেই বুঝতে পারেন নি। আল্লাহ পাক তাঁর উপর দয়ার দৃষ্টি দিয়েছিলেন- আর তা অবশ্যই স্বীয় প্রিয় হাবীবের ওয়াসিলায় হয়েছিল। আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন: "আপনার জন্য আমার মাতাপিতা কুরবান হোক! আপনি মহান, দয়ালু ও ধৈর্যশীল আর আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারছি, যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ থাকতো তাহলে আজ আমার অবশ্যই কোনো উপকারে আসতো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে আবার বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপলব্ধির ক্ষমতা দান করুন। তুমি এখনও একথা স্বীকার করবে না যে, আমি আল্লাহর রাসূল?"

কিন্তু আবু সুফিয়ান নির্ভীকভাবে উত্তর করলেন: "আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হতে পানি নি!" একথা শ্রবণ করে হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: "আর কেনো বিলম্ব করছো আবু সুফিয়ান! ইসলাম কবুল করো!" এবার আবু সুফিয়ানের মনে সত্যের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠলো। তার তকদির খুলে গেল। দৃঢ়কণ্ঠে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করলেন: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপরিসীম করুণা! যে ব্যক্তি ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই চরম দুশমন হিসাবে কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন আজ তিনিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আত্মসমর্পণ করলেন- তিনিও এখন থেকে সাহাবা হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হয়ে গেলেন। মাত্র ক'দিনের মধ্যেই আবু সুফিয়ান একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তিনি ইসলামের জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করে একটি চক্ষু বিসর্জন দিয়েছিলেন। তায়েফ অভিযানে এই চক্ষু আহত হয় এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই আবু সুফিয়ানের সন্তান প্রখ্যাত সাহাবী ও সমরনায়ক হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু উমাইয়্যা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দিলেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীকে বাধা না দেয় তাহলে কোন রক্তপাত হবে না। আবু সুফিয়ানের ঘর নিরাপদ থাকবে। আবু সুফিয়ান ফিরে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর কারোর নেই। কেউ যেনো ভুলেও আক্রমণ না করে। এই সংবাদে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারে পালালো। অনেকে পাহাড়ের উপর, নিজের গৃহে এবং আবু সুফিয়ানের ঘরে আত্মগোপন করলো। মহান আল্লাহর অসীম করুণায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা বাধায় পবিত্র মক্কা নগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। তবে তাঁর পবিত্র মস্তক মাটির দিকে অবনমিত ছিলো। উটের মধ্যে সাথে নিলেন প্রিয় পালকপুত্র মু'তা অভিযানে শাহাদাতবরণকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ বিন হারিসার পুত্র হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে। চারদিক থেকে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য মক্কা শরীফ প্রবেশ করলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যে সেনাদল অগ্রসর হয়েছিল তাদেরকে কয়েকজন দুর্দান্ত কুরাইশ জওয়ান আক্রমণ করায় সামান্য যুদ্ধ বাঁধলো। এতে ১২ জন শত্রুসৈন্য নিহত ও ২ জন মুসলমান জিহাদী শাহাদতবরণ করেন। মক্কা বিজয় এভাবে প্রায় রক্তপাতহীনভাবে সুসম্পন্ন হলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরক্ষণে নাজিলকৃত আল্লাহ বাণী:
"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" - সফল হলো। কুরাইশদের উপর মুসলমানদের চুড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হলো।

পবিত্রভূমি মূর্তিমুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বাগৃহের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে হাজারে আসওয়াদে চুমো খেলেন। তারপর কা'বাগৃহের চতুর্দিকে ও ভেতরে অবস্থিত ৩৬০টি মূর্তির সম্মুখে যেয়ে একে একে সবগুলো স্বীয় যষ্টি উত্তোলন করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত পাঠ করতে করতে ভেঙ্গে ফেললেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"এবং বলো, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, আর নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী" [সূরা ইসরা : ৮১]।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'টি প্রাচীন মূর্তি ছিল। এদের নাম ছিলো যথাক্রমে 'ইসাফ' ও 'নায়িলা'। কুরাইশরা বিশ্বাস করতো যে, ইসাফ ছিলো পুরুষ ও নায়িলা ছিলো নারী। একদা এরা হারাম শরীফের ভেতর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এদেরকে পাথরে পরিণত করেছেন। কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে কুরাইশরা দেবতা মনে করে উপাসনা করতো। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে সেদিন এ দু'টোকে ভেঙ্গে চুরমার করা হলো। কাবা শরীফসহ পুরো হারাম এলাকা মূর্তিমুক্ত হলো।

মক্কা শহরের আশপাশ এলাকায় লাত, উযজা, মানাত, সুওয়া ইত্যাদি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন।

বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠে আযান

যুহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে আযান দিলেন। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আত্তাব ও হারিস এই আযান ধ্বনিতে পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করলেন। তারা একেকজন একেকটি মন্তব্য করলেন। আত্তাব বললেন, আমার পিতার ভাগ্য ভালো তাই এই আযান ধ্বনি শ্রবণের পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন! হারিস বললেন, ইসলামের সত্যতা এখনও উপলব্ধি করতে পরি নি- যদি পারতাম তবে এই ধ্বনি শিরোধার্য করে নিতাম। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান। তাই তার মন্তব্য ছিলো ভিন্ন। তিনি বললেন, "আমি কিছু বলবো না। আমাদের নিকটতম কঙ্করগুলো যেয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট তা জানিয়ে দেবে!" তার এই উক্তি সঠিক ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা জানতে পেরেছিলেন, তবে কঙ্করের মাধ্যমে নয়- স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি ওসব নেতাদেরকে বললেন, তোমাদের সকল কথা আমার জানা হয়ে গেছে। এরপর তিনি হুবহু সকল মন্তব্যগুলো বলে দিলেন। এতদশ্রবণে

হারিস ও আত্তাব কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তারা বললেন, আমাদের কথাগুলো কেউই শোনতে পায় নি- একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই এই সংবাদ আপনাকে জানিয়েছেন। আপনি যে আল্লাহর প্রেরিত নবী তাতে আমাদের আর একবিন্দুও সন্দেহ নাই।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের ইসলাম গ্রহণ

উহুদ যুদ্ধে এই হিন্দই বদর যুদ্ধে নিহত তার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যেয়ে হযরত আমীর হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে কতল করিয়েছিলন এবং তাঁর লাশ কেটে কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন। এই দুর্দান্ত নারীও পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা থেকে বঞ্চিত হলন না। তিনিও ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে নবীজীর দরবারে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পেরেছিলেন। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সকলকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তবে গুরুতর অপরাধী চারজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে তিনি ক্ষমা দেন নি। ক্ষমার অযোগ্য এরা হলো: ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, মিকইয়াস ইবনে সাবাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আবী সারাহ এবং মিকইয়াসের দু'জন গায়িকা। এদের মধ্যে ইকরিমা ইয়ামনে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইকরিমার পিতা আবু জাহল ইসলামের চরম দুশমন ছিলেন। লোকেরা স্বীয় পিতাকে প্রকাশ্যে গালি দিতে দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, "আমার সামনে যখন মানুষ পিতাকে গালি দেয় তখন আমার ভীষণ লজ্জা হয়"। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বললেন, "মৃত ব্যক্তিগণ তাদের কর্মফল ভোগ করছে- তাদের গালি দেওয়া ঠিক নয়। মৃতদের জীবনের মন্দ দিক ভুলে শুধু তাদের উত্তম দিক নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ"।

হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশীও পেয়ারে নবীজীর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হলেন না। ওয়াহশী ইসলাম কবুল করলেন। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলে দিলেন, "তুমি আর কখনও আমার সম্মুখে এসো না"। ওয়াহশী সাহাবা ছিলেন- কারণ তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সাহাবা হওয়ার শর্ত তিনি পালন

করেছেন। ওয়াহশী হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হন্তা হিসাবে বেঁচে থেকে ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করতেন। তিনি সে-ই বর্শা দিয়েই আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধের সময় নুবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর সেখানে মোট পনের দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সাহাবায়ে কিরামকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কা শরীফের আশপাশ অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন।

হুনায়নের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর যে ক'দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন এর মধ্যেই এই যুদ্ধ বাধে। আরাফাতের ময়দান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে ঘন খেজুর বৃক্ষবিশিষ্ট একটি উপত্যকার নাম হুনায়ন। এখানে হাওয়াযিন ও ছাকীফ নামক দু'টি গোত্র বসবাস করতো। সংখ্যাবহুল, যুদ্ধবাজ, শক্তিশালী এই গোত্রদ্বয় ইসলামের চরম দুশমন ছিলো। ইসলামের ছায়াতলে দলে দলে লোকজন যোগদান করছে দেখে এদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো। সুতরাং তারা মক্কা শরীফে অবস্থানরত মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ১২ হাজার মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেক নওমুসলিম ছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের অতর্কিত হামলায় তারা চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ২০০ সাহাবীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় থেকে তরবারি চালনা অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন: "হে লোকসকল! তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ!"

তুমুল যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে দু'আ করলেন। শীঘ্রই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য আসলো। তিনি ফিরিশতা পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়ে মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিত

বিজয় দান করলেন। এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে কাফিরদের উপর ছুড়ে মারলেন। এতে তারা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কাফিররা সাথে নিয়ে আসা তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পদ ও গবাদি পশু পেছনে রেখে পলায়ন করলো। হুনায়নের যুদ্ধে যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে, এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিন, যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিলো সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি। বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ নিজ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি এবং তিনি কাফিদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন। এটাই কাফিরদের কর্মফল" [তাওবাহ : ২৫-২৬]।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন হযরত হালীমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কন্যা শায়মা বিনতে হারিছও ছিলেন। প্রথমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পারেন নি। শায়মা বললেন, "আপনি আমার পিঠে একদা কামড় দিয়েছিলেন- এই দাগটি এখনও আছে।" একথা শ্রবণ করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এই মহিলাটিই তাঁর দুধবোন। তিনি তাঁকে সম্মানের সাথে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। শিশুকালের কথা স্মরণ হতেই তাঁর পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো। শায়মা ইসলাম কবুল করলেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় নিজের গোত্রের নিকট চলে গেলেন।

হওয়াযীন ও ছাকীফ গোত্রের একটি দল হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তায়েফ এসে অবস্থান নেয়। এই দলে তাদের নেতা মালিক ইবনে আওফও ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তায়েফ এসে হাজির হন। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শত্রুরা এক বছরের রসদপত্রসহ দুর্গের ভেতর অবস্থান নেয়। মুসলিম বাহিনী দুর্গের নিকটবর্তী হতেই শত্রুরা অজস্র তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো- এতে অনেকেই আহত হলেন এবং শাহাদাতবরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু দূরে সরে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবরোধ তুলে নিলেন। ছাকীফ গোত্রের জন্য তিনি হিদায়াত চেয়ে দু'আ করলেন। এই দু'আ আল্লাহর দরবারে দ্রুত কবুল হয়েছিল। তায়েফ অভিযানে মোট বারোজন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন।

যুদ্ধের পর কাফির বাহিনীর সর্দার মালিক ইবনে আওফসহ উভয় গোত্রের প্রায় সকলেই রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। হুনায়নের নিকট জি'রানায় তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে ইহরাম বেধে মক্কা শরীফ প্রবেশ করে উমরা পালন করলেন। এরপর জি'রানায় ফিরে এসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

নবম হিজরি: তাবুক অভিযান

তাবুক মদীনা শরীফ থেকে সাত শত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। মদীনার মুনাফিকরা মসজিদে দিরার নামে পরিচিত একটি নামেমাত্র মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে বসে কুপরামর্শ করতো। এটা ছিলো তাদের চক্রান্তের আস্তানা। তারা রোমান সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ দিতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন সূত্রে জানতে পারলেন রোমান সম্রাট যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে মদীনা শরীফে বসে সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার চিন্তা বাদ দিয়ে বরং তাবুকের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীসহ যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ দুশমনদেরকে সীমান্তে প্রতিরোধ করাই হলো উত্তম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিরাট কাফিলা প্রস্তুত হয়ে গেল। এই যুদ্ধের জন্য সর্বস্তরের মুসলমান সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। যুদ্ধ তহবিলে উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক অর্থকড়ি প্রদান করেন। হযরত আবু বকর তো সবকিছু দান করে দিয়েছিলেন। তাঁকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রশ্ন করলেন, "পরিবার-পরিজনের জন্য কী পরিমাণ রেখে এসেছো?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি"। মহিলা সাহাবীরা হাতের চুড়ি, ব্রেসলেট, পায়ের নুপুর, কানের দুল, গলার হার, আংটি এবং অন্যান্য মূল্যবান স্বর্ণালংকার দান করেছিলেন। সাহাবায়ে

কিরামের জান-মালের এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত বিসর্জনের ফলেই মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সত্যধর্ম পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের আত্মোৎসর্গ, পরহেজগারী, রাসূলের অনুসরণ ইত্যাদি আমল স্বয়ং আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল, তাই তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে তাঁদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন:

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যারা সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজী হয়েছেন, আর তারাও সকলে আল্লাহর প্রতি রাজী হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এতে তারা হবে চিরস্থায়ী; এটাই হলো বিরাট সফলতা" [তাওবাহ : ১০০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরির রজব মাসে তাবুকের ময়দানে পৌঁছে ছাউনি স্থাপন করে মোট বিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। রোমানরা মুজাহিদদের দৃঢ় মনোবল ও যুদ্ধের প্রস্তুতি অবলোকন করে ভয় পেয়ে গেল। গাসসানী সৈন্যরা ময়দান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। তাবুকের ময়দানে ফজরের নামায পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত মুজাহিদদের সামনে এক আদর্শিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। সীরাত বিশ্বকোষ থেকে এই অপূর্ব সুন্দর ভাষণের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ পেশ করার পর বললেন, "হে জনগণ! সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব; সবচেয়ে মজবুত রজ্জু হলো তাকওয়ার বাক্য; সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিল্লাত হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাত; সবচেয়ে উত্তম সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত; সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বাক্য হলো আল্লাহর যিকির; সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা হলো আল-কুরআন; ... সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো মিথ্যা কথন; ... যে ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাকে মার্জনা করেন; যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে

আল্লাহ তাকে অধিক প্রতিদান দেন; ... হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন।"

কাফির মুশরিক রোমান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ এই শীতের সময় আর তাবুক থাকা সমীচিন মনে করলেন না। তাছাড়া অভিযানের সফলতা অর্জন হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে খবর এলো তাবুকের অদূরে দুমাতুল জান্দালের খৃস্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদিল মালিক কিন্দী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এটা জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি বাহিনী সেথায় প্রেরণ করেন। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে খালিদ তাদেরকে পরাজিত করে স্বয়ং উকাইদিরকে বন্দী করে নবীজীর খিদমাতে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুক্তি দেন।

তাবুকের যুদ্ধই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ যুদ্ধ যাতে তিনি স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট ২৭টি মতান্তরে ২৮টি যুদ্ধে স্বয়ং নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব যুদ্ধকে বলে গাযওয়া। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সাহাবার নেতৃত্বে মোট ৬০টি যুদ্ধ কিংবা অভিযান সংঘটিত হয়েছিল- এগুলোকে বলে সারিয়্যা।

মসজিদে দিরারে অগ্নিসংযোগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযান শেষে মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে যু-আওয়ান নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো। এতে মুনাফিকদের দিরার মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও চক্রান্ত তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত মালিক ইবনে দুখশুম ও মা'ন ইবনে আদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দিলেন, ঐ মসজিদ জ্বালিয়ে ফেলো। তাঁরা তাঁর নির্দেশ মুতাবিক ঐ মসজিদে যেয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। মসজিদের অভ্যন্তরে যারা ছিলো তারা জীবন বাঁচিয়ে পালালো।

ইসলামের প্রথম হজ্জ

এই বছরই (নবম হিজরি) মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরজ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করেন। তিনি তিনশত লোকের এক কাফিলা নিয়ে হজ্জে গমন করেন।

এ বছর মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা নামাযে ইমামতি করেন। তাকে কুর্তা প্রদান করেন যা কাফন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জানাযা নামাযের পূর্বমুহূর্তে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, 'তাদের জন্য আপনি মাগফিরাত কামনা করেন বা না এবং আপনি যদি ৭০ বারও মাগফিরাত কামনা করেন তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না'"। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন জবাব দিলেন: "আমি যদি জানতাম তাদেরকে ক্ষমা করা হবে তাহলে অবশ্যই আমি ৭০ বারেরও বেশী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম"। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে মুনাফিক/কাফিরদের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করে দিলেন। তিনি ইরশাদ করেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَـٰسِقُونَ

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও- বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে" [তাওবাহ : ৮৪]।

আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর মৃত্যুসংবাদ জানার পর সাহাবাদের নিয়ে তিনি 'গায়িবানা জানাযা' নামায আদায় করেন। হানাফী মাযহাব মুতাবিক এরূপ গায়িবানা নামায পড়া একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস ছিলো। মুসলমানদের জন্য

এরূপ নামায পড়া জায়িয নয়। এ বছর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়।

দশম হিজরি

নবম হিজরির শেষ ও দশম হিজরির প্রথম দিকে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে অসংখ্য মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে হাজির হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ১০ হাজার সৈন্যসহ মক্কা বিজয় এবং কুরাইশ সরদারদের ইসলাম গ্রহণ সমগ্র আরবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে মদীনা মুনুওয়ারায়। সুতরাং বিদায় হজ্জ বাদে এ বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এসব প্রতিনিধিদলের ব্যাপক আগমন ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ।

বিদায় হজ্জ

দশম হিজরির জিলহাজ্জ মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জ পালন করেন। এই ঐতিহাসিক হজ্জে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন লক্ষাধিক সাহাবী। মদীনা শরীফ থেকে এই বিরাট কাফিলা ২৫ যিলকদ বাদ যুহর যাত্রা শুরু করে। যুল হুলাইফায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধেন ও উচ্চস্বরে তালবিয়া (লাব্বায়িক) পাঠ করা শুরু করেন। লক্ষাধিক হজ্জযাত্রী তাঁর সঙ্গে তালবিয়া পড়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেন। যি-তুওয়া নামক স্থানে এসে কাফিলা রাত্রি যাপন করে।

জিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ দিনের বেলা উচ্চভূমি হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে প্রবেশ করেন। বাইতুল্লাহ শরীফের উপর চোখ পড়তেই তিনি পাঠ করলেন:

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وتَكْرِيْمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً

"হে আল্লাহ! তোমার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা, তাজিম ও তাকরীম এবং ভীতিকর প্রভাব বৃদ্ধি করে দাও।" (তাবারানী)

আরো পাঠ করলেন:

اَللّٰهم اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"হে আল্লাহ! আপনি শন্তিময় শান্তিদাতা আর আপনার পক্ষ হতেই শান্তি আসে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শন্তিসহ বাঁচিয়ে রাখুন।" (বাইহাকী, সুনানে কুবরা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করে ৮ জিলহাজ্জ পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করেন। অধিকাংশ মতে তিনি ক্বিরান হজ্জ আদায় করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ৮ জিলহাজ্জ যুহরের পূর্বে সমগ্র মুসলিম কাফিলাকে নিয়ে তিনি মীনায় গমন করেন। সেখানে তিনি যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর এই পাঁচ রাকাআত নামায আদায় শেষে, ৯ জিলহাজ্জ ভোরে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তিনি আরাফাতের ময়দানে পৌঁছার পর তাঁর উটনী 'আল-কাসওয়ার' উপর আরোহণ করে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দান করেন। জুমু'আর দিন হওয়াতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামায আদায় করলেন, জুমু'আর নামায পড়লেন না। আরাফাতের প্রখ্যাত জাবালে রাহমাতের নিকট এসে তিনি উকুফ করলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আয় কাটিয়ে দিলেন। দু'আ শেষে কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশটি নাযিল হলো:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا * فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ * فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম; অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহের প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল" [সূরা মাইদা : ৩]।

সূর্যাস্তের পর হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পেছনে বসিয়ে উটনীর উপর আরোহণ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন। ফজরের নামাযের পর পূর্বাকাশ ফর্সা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাশ'আরিল হারামের নিকট কিবলামুখী হয়ে বসে তিনি দু'আ, কান্নাকাটি ও যিকির-আযকারে কাটিয়ে দিলেন। এই সময়টিকে বলে 'উকুফে মুজদালিফা'। এরপর তিনি মুজদালিফা থেকে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বরাবরের মতো তালবিয়া পাঠ করতে করতে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। পুরো কাফিলা তাঁকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলো। ওয়াদিয়ে মুহাসসার নামক জায়গাটির মাঝামাঝি আসতেই তিনি তাঁর উটনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন। এই জায়গায়ই আবরাহার হস্তীবাহিনী আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। মুজদালিফা থেকে কুড়িয়ে আনা ৭টি কঙ্কর জামারাতুল আকাবায় স্থাপিত স্তম্ভে শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। এরপর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করলেন।

মীনার কুরবানীর স্থলে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩টি উট স্বহস্তে কুরবানী করেন। হিসাব করে দেখা গেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩ বছর এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। অবশ্য উটের সংখ্যা ছিলো ১০০। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাকী উটগুলো কুরবানী করেন। কুরবানী শেষে ক্ষৌরকারকে মাথা মুণ্ডানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। মুণ্ডিত কেশ মুবারক নিকটস্থ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বণ্টন করলেন। এরপর তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তাওয়াফে জিয়ারত (যাকে তাওয়াফে ইফাদাও বলে) শেষে তিন যমযম কুপের নিকট গমন করে পানি তুলে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। এরপর ঐদিনই মীনায় ফিরে আসেন ও পরের তিন রাত্রি অর্থাৎ ১৩ জিলহাজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন। উভয় দিন তিনি জামারাতে যেয়ে যথাক্রমে ছোট, মধ্যম ও বড়ো স্তম্ভে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর মক্কা শরীফ যাত্রা করেন, শেষ রাতে বিদায়ী তাওয়াফ করে লোকজনকে তৈরী হতে নির্দেশ দেন। এরপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই ছিলো অতি সংক্ষেপে বিদায় হজ্জের কার্যাবলীর বিবরণ।

পরম প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের প্রস্তুতি

বিদায় হজ্জের সময় যখন আরাফাতের ময়দানে সূরা মাইদার ৩ নং আয়াত নাযিল হলো তখনই বুঝা গিয়েছিল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতী দায়িত্ব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তিনি মানুষকে হিদায়াতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। ভাষণের সময় তিনি সবাইকে এ ব্যাপারে প্রশ্নও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করা হবে, সেদিন তোমরা তার কী জবাব দেবে?" সাহাবায়ে কিরাম সমস্বরে জবাব দিয়েছিলেন, "আমরা বলবো, আপনি আল্লাহর পয়গাম যথাযথ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।" তিনি তখন আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি উঁচিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করেন: "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো।"

তিনি বিদায় হজ্জের বিভিন্ন খুতবায় এ কথাটিও বার বার উচ্চারণ করেছেন: "তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। সম্ভবত এ বছরের পর আমার আর হজ্জ করার সুযোগ হবে না"। এরপর সূরা নাসর অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে প্রদান করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসল এবং তুমি দেখলে লোকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। অতএব তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের প্রশংসাগীতিসহ তাসবীহ পাঠ করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অবশ্যই তাওবা কবুলকারী" [সূরা নাসর : ১-৩]।

শেষ রোগ

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠ থেকে এমন কিছু বাক্য উচ্চারিত হতে লাগলো যে, এতে প্রকাশ্য ইঙ্গিত মিললো, তিনি এই মায়াবী পৃথিবী ছেড়ে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করবেন। এই শেষ সফরে যেতে তিনি যেনো দিন দিন ব্যকুল হয়ে উঠছিলেন। পরম প্রিয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষায় তিনি উন্মুখ। তিনি উহুদের শহীদদের কবর জিয়ারত করলেন।

এরপর একদিন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবাদেরকে বললেন, "আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। এরপর তোমাদের সঙ্গে আমার হাওযে কাওছারে দেখা হবে।" এসব কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তারা জানতেন, তাঁদের মহান সাথী পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বেশিদিন তাঁদের মধ্যে থাকবেন না।

সফর মাসের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি রাতের বেলা জান্নাতুল বাকীতে যেয়ে কবর জিয়ারত করেন। ফিরে এসেই অসুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থানের জন্য তিনি সকল স্ত্রীদের নিকট থেকে অনুমতি নিলেন।

জীবনের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এই বাহিনী যাত্রা করে জুরুফ নামক স্থানে পৌঁছলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়ার তীব্রতা বাড়তে লাগলো। এমতাবস্থায় অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হলো। অবশ্য আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফত লাভ করেই এই অভিযান সম্পন্ন করেছিলেন।

সর্বশেষ ইমামতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ বেড়ে গেল। ইন্তিকালের চারদিন পূর্বে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ ইমামতি করেন যুহরের নামাযে। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার ৮ রবিউল আওয়াল ১১ হিজরি। নামায শেষে তিনি জীবনের শেষ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি হামদ ও ছানা পাঠ শেষে প্রথমেই উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে মাগফিরাত কামনা করলেন। এরপর নিজের কবরকে উপাসনার বস্তু বানাতে নিষেধ দিলেন; কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে তা পরিশোধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন; মুহাজিরদেরকে বললেন, তোমরা আনসারদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে; এরপর বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের সবকিছু প্রদান করতে ইচ্ছা করলেন, সে আখিরাতকেই পছন্দ করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষোক্ত কথাটির মর্মার্থ হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠলো। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! সবর করো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু নসিহত করে ফিরে গেলেন।

অসুস্থতার সময় একদা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর নিকট তাশরিফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁকে কানে কানে কি যেনো বললেন, এতে তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার কানে কানে কিছু বলার পর তিনি খুশী হলেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, প্রথমবার আমার পিতা আমাকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন এতে আমি কেঁদে ফেলি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বললেন, আমার পরে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে মিলিত হবে, এতে আমার মনে আনন্দ অনুভব করলাম।

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমাম নিযুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েত মুতাবিক হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার বর্ণনামতে ইশার নামাযের সময় লোকজন মসজিদে অপেক্ষারত ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার চেষ্টা করছিলেন নামাযে যোগ দিতে কিন্তু তিনি পারলেন না। শেষে বললেন, আবু বকরকে বলো নামাযে ইমামতি করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ১৭ বা ২১ ওয়াক্ত মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়তে পারেন নি।

ওফাতের দিন এসে হাজির হলো

১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার। তেষট্টি বছর পূর্বে এই একই তারিখে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ পয়গম্বর, জগতসমূহের জন্য রাহমাত পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মায়াবী ধরার কোলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছিলেন। আজ তিনি সেই মহান দায়িত্ব পালন শেষে মা'বুদের ডাকে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিভোর করে তুললো। তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবাদের

সঙ্গে আজ ক'দিন যাবৎ মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে পারছিলেন না রোগের প্রাবল্যতা হেতু। সুবহে সাদিকের সময় হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরার পর্দা তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁরই ইঙ্গিতে। তিনি শেষবারের মতো তাঁর সাহাবাদেরকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চান। নবীজীর মুবারক দীপ্তিমান চেহারা ভোরের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে যেনো শতগুণ বেশী নূরানী রূপ ধারণ করলো। তিনি সাহাবাদেরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতরা নামায আদায় করে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন, তিনি বুঝি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এক্ষুণি নামাযের ইমামতির জন্য মসজিদে তাশরীফ আনবেন। সবাই তাঁর আগমনের জন্য সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারায় আবু বকরকে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় তখন ফুটে ওঠেছে অপূর্ব স্নিগ্ধ হাসির রেখা। তিনি হুজরায় ফিরে গেলেন।

ইন্তিকালের পূর্বে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কোলে তাঁর পবিত্র মাথা মুবারক ছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ঐ দীনারগুলো কি করেছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো টাকাকড়ি ছিলো না, তিনি সবকিছু ইতোমধ্যে গুছিয়ে ফেলেছিলেন। তবে সাতটি দীনার তার নিকট অবশিষ্ট ছিলো। তিনি আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে নির্দেশ দিলেন এই টাকাগুলো সদকা করে দিতে।

সর্বশেষ আ'মল মিসওয়াক ব্যবহার

মিসওয়াক করা ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন দেখে অনেকেই যারতার কাজে চলে গেলেন। কিন্তু আসলে এ ছিলো বিদায় মুহূর্তের সংকেত মাত্র। অচিরেই তাঁর অন্তিম সময় এসে হাজির হয়ে গেল। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। এমন সময় আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আসলেন। তাঁর হস্তে একটি কাঁচা মিসওয়াক ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তিনি এটা চাচ্ছেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা আপনাকে দেবো? তিনি হ্যাঁ-সূচক ইশারা করলেন। আমি এটা হাতে নিয়ে চিবিয়ে নরম করলাম, এরপর তাঁকে দিলাম। তিনি খুব উত্তমভাবে মিসওয়াক করলেন। ইতোপূর্বে কখনো আমি তাঁকে এতো ভালোভাবে মিসওয়াক করতে দেখি নি। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা

পরবর্তীতে অত্যন্ত গর্ব করে বলতেন, আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালার সঙ্গে আমার লালা একত্র হয়েছে, তিনি আমার বুকে মাথা মুবারক রেখে, আমারই হুজরায় ইন্তিকাল করেছেন।

শেষ নসিহত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নসিহত ছিলো: নামায ও তোমাদের দাসদাসীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বলেছিলেন, নামায এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

ইন্তিকাল

বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসলো। তিনি এই মায়াবী ধরাধাম থেকে চলে যেতে একরকম ব্যকুল হয়ে ওঠলেন। আল্লাহর সান্নিধ্য সন্নিকটে ভেবে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। অপরদিকে মৃত্যুর পেরেশানী তো ছিলোই। পাশে রাখা পানির পাত্রে হাত মুবারক ডুবিয়ে সিক্ত করে চেহারা মুবারকে বার বার দিচ্ছিলেন আর পাঠ করছিলেন:

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ

"আল্লাহ ব্যতীত কোনও মা'বুদ নাই। মৃত্যুতে রয়েছে পেরেশানী ও যন্ত্রণা"। (তাবারানী)

কোন কোন সময় বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কষ্টের সময় সাহায্য করুন"।

হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একবার বললেন, "হায় আল্লাহ! আমার পিতার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আজকের এই দিন পর তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট হবে না"।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক প্রস্থানের সময় একেবারে নিকটবর্তী হয়ে আসলো। তিনি বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلٰى

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং আমাকে সম্মানিত বন্ধুর সাথে মিলিত করুন" এবং

اَللّٰهُمَّ اَلرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

"হে আল্লাহ! সম্মানিত বন্ধুর নিকট আমি যেতে চাই"।

তাঁর পবিত্র রূহ মুবারক আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীঊন। তিনি ১১ হিজরির ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার দিন, দুপুরে গোটা মদীনা শরীফ তথা পুরো মহাবিশ্বকে কাঁদিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর আগমনের দিনটি ছিলো পৃথিবীর জন্য মহানন্দের আর যাওয়ার দিনটি হলো মহাশোকের। আমরা তাঁর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তিনি চলে গেলেও মানুষের জন্য রেখে গেছেন হিদাআতের দু'টি মহাসত্যের উৎস: আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীম ও তাঁর পবিত্র জীবনের কর্ম, বাণী ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মের সমর্থনসম্মৃদ্ধ পবিত্র হাদীস শরীফ।

হে মহান আরশের অধিপতি! তোমার পেয়ারে হাবীবের শাফায়াত লাভে এই অধম বান্দাকে ধন্য করো। এই লেখাটুকুতে অবশ্যই অনেক ভুল-ত্রূটি করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পেয়ারে হাবিব রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো রোজ কিয়ামতে আমাকে মায়ার দৃষ্টিতে দেখেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ওয়াসিলায়। আপনি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজন এবং পাঠকদের ক্ষমা করুন এবং এ লেখা থেকে উপকৃত করুন। আমীন।

আমি যদি মুখগহ্বর হাজার বার মিশক ও গোলাপজলে ধৌত করি, তোমার পবিত্র নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার যোগ্যতা লাভে ঐ মুখটি ব্যর্থ হবে।

দু' জাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারিক জিনিসপত্র

রাহ্মাতুল্লিল আলামীন, সয়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, উভয় জগতের সরদার, পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নশ্বর এ ধরার বুকে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। জীবনচলার জন্য একান্ত জরুরী রসদপত্র ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তাঁর গৃহে থাকতো না। সকল যুগের সকল ওলিদের পথপ্রদর্শক, শরীয়ত ও মা'রিফাতের মধ্যমণি, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ 'ইনসানে কামিল' মহামানব- যদি চাইতেন, তাহলে বাদশাহদের বাদশাহর মতো জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চান নি। অবিনশ্বর মহাজগতের অফুরন্ত নিয়ামত এবং খাস করে রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও দীদারের সামনে দুনিয়াবী যাবতীয় ভোগ-বিলাস মহাসাগরের মাঝে মাত্র একফোটা পানির চেয়েও তুচ্ছ। হযরতের ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও গৃহের আসবাব নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তালিকাভুক্ত করেছি। পাঠক এ থেকেই আন্দাজ করে নিতে পারবেন দুনিয়ার প্রতি তাঁর চরম অনাকর্ষণের মাত্রা।[৮]

তাঁর পানপাত্র

তিনি মোট তিনটি পানপাত্র ব্যবহার করতেন: ১. রাইয়্যান। ২. মুদাব্বাব: ধাতুর তৈরী এই পাত্রে ছিলো রৌপ্যের নির্মিত একটি চেইন ও হাতল। এটা তিনি সফরকালে ব্যবহার করতেন। ৩. কাচের তৈরী কাপ।

পানি পানের জন্য ছিলো একটি ক্বাদ- এটা ছিলো কাঠের তৈরী। অযুর বদনা হিসাবেও এটা ব্যবহার করতেন। খেজুর বৃক্ষের তৈরী একটি পাত্র ছিলো যা তিনি রাতে প্রস্রাবের জন্য ব্যবহার করতেন।

চামড়ার তৈরী পানির পাত্র ছিলো মোট ৫টি: ১. ক্বিরবা: অযু ও পানের জন্য ব্যবহার করতেন। ২. আদওয়া: চামড়ার ছোট্ট পাত্র। ৩. মিযাদা: চামড়ার তৈরী পানির পাত্র। ৪. শান্না: পুরাতন চামড়ার পানির পাত্র। গরমের সময় এ পাত্রে পানি রাখলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা ঠাণ্ডা থাকতো। ৫. সিক্বা: চামড়ার পানির পাত্র।

---

[৮] এসব বর্ণনার তথ্যসূত্র হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ‘সীরাত বিশ্বকোষ’, হযরত আবুল হাসান আলী নদবী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ‘নবীয়ে রহমত’ [ইফাবা কর্তৃক অনূদিত] এবং হযরত ইদ্রিস কান্ধলবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘সীরাতে মুস্তফা [স.]’ [ইফাবা কর্তৃক অনূদিত] । রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনালোচনায় আরোও বেশ কিছু সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে: আল্লামা শিবলী নুমানী রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘সীরাতুন্নবী’, ইবনে কাছির রাহিমাহুল্লাহর ‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘তারিখে তাবারী’ [ইংরেজিতে অনূদিত], ‘সীরাতে ইনবে হিশাম’ ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য সীরতাগ্রন্থ।

ছুরি

তিনি তিনখানা ছুরি ব্যবহার করতেন: ১. সিক্কিন, ২. মুদিয়া ও ৩. শাফরা: এটা ছিলো অনেকটা চওড়া ছুরি।

মুবারক যষ্টি

তাঁর মোট তিনটি যষ্টি (গল্লা) ছিলো: ১. মিহজান: এর অপর নাম ছিলো 'দাক্বন' (বা দাফন)। এটা ছিলো ১ গজ লম্বা (৩ ফুট)। চলতে ও আরোহী অবস্থায় এটা তাঁর হাত মুবারকে থাকতো। ২. ক্বাদিব: এই গল্লার নাম ছিলো, 'মামশুক'। কাঠের তৈরী এই যষ্টি পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীন ব্যবহার করেছেন বরকতের জন্য। ৩. মিকশারা: এই গল্লার নাম ছিলো 'আরজুন'।

বিছানাপত্র

১. ফিরাশ (বিছানা): এ বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরী। এর ভেতর খেজুর বৃক্ষের ছাল ছিলো। ২. উইসাদা (বালিশ): চামড়ার তৈরী এই বালিশের ভেতরও খেজুর গাছের ছাল ছিলো। ৩. মিরফাদা মিন আদাম: এটাও একটি চামড়ার তৈরী বালিশ।

কাঠের খাট

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা কাঠের তৈরী খাট ছিলো। তিনি প্রায়ই এতে বিশ্রাম নিতেন। এরূপ কাঠের তৈরী খাটে করে মাইয়্যিতকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্য কুরাইশদের মধ্যে ছিলো। এই কৃষ্টিটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এই খাট দিয়ে হুজরা শরীফে সমাহিত উভয় খলিফা- হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে শায়িত অনেক সাহাবায়ে কিরামের লাশও এই খাটে করে বহন করা হয়েছে।

পানীয়

তিনি পানি ছাড়াও বকরির দুধ খুব বেশী পছন্দ করতেন। মাঝে মধ্যে উটের দুগ্ধও পান করেছেন। দুধের তৈরী অন্যান্য জিনিষও তিনি আহার করতেন। যেমন: জুবনা (পনির), আক্বিত (এটাও একজাতীয় পনির), সাম্ন (ঘি) এবং জুবদা (তাজা ঘি)। দুধে পানি মিশিয়েও পান করেছেন। অপর আরেক ধরনের পানীয় যা খেজুরের রস থেকে তৈরী হয়, তিনি পান করতে ভালোবাসতেন। এটার নাম হলো 'নাবিদ্ব তামর'।

আরেক ধরনের পানীয় ছিলো যার নাম 'নাবিদ্ব জাবিব'। এটা কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে তৈরী হতো। এছাড়া 'নাবিদ্ব শা'ইর' নামক আরেক ধরনের পানীয় ছিলো- যা তিনি পান করতে পছন্দ করতেন। এটা তৈরী হয় পানির মধ্যে যব ভিজিয়ে।

মধু

মধু মানুষের জন্য উপকারী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু খেতে ভালোবাসতেন। তিনি খাঁটি মধু খেতেন এবং পানি কিংবা দুধ মিশ্রিত মধুও পান করেছেন।

খেজুর

তিনি খেজুর খেতে ভালোবাসতেন। খেজুর পাকা হওয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন: বুসর (কাঁচা), রুতাব (তাজা), তামর (শুকনো) এবং তামর আতিক্ব (পুরাতন খেজুর)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের খেজুর খেয়েছেন। তবে রুতাব (তাজা) খেজুর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে খেতে ভালোবাসতেন, যেমন: ১. রুতাবের সাথে শশা, ২. রুতাবের সাথে তাজা ঘি, ৩. রুতাবের সাথে পনির ও ৪. রুতাবের সাথে তরমুজ।

নূরোজ্জ্বল মুবারক চেহারা

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখনই পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতেন তখনই নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

اِمِیْن بِالْمُصْطَفٰی بِالْخَیْرِ یَدْعُو
کَضَوْءِ الْبَدْرُ زَایَلَهُ الظَّلَامُ

তিনি 'বিশ্বস্ত' ঐশীসূত্রে নির্বাচিত জন, তিনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন
তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো- যা দৃশ্য হয় অমাবস্যা রাতের পর।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায়ই কবি জুহায়ির ইবনে আবি সালমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

لَوْ كُنْتُ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الْبَشَرِ
كُنْتُ المضَيْء لَيْلَةَ الْبَدْرِ

আপনি যদি মানব না হয়ে অন্য কিছু হতেন, তাহলে আকাশের চাঁদের মতো
হতেন, আপনার নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো সমস্ত জগৎ।

হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা অত্যন্ত আবেগভরে বলেন:

لنا شمس وللافاق شمس
شمسي تطلع بعد العشاء

আমার নিজস্ব জগতের একটি সূর্য আছে
আমার সে সূর্য উদয় হয় ইশার পরে।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক ছিলো লালচে-উজ্জ্বল-সাদা। তাঁর মুবারক চোখ দু'টোর রং ছিলো গাঢ় কালো। কালো চুল মুবারক অধিকাংশ সময় কানের লতি মুবারক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। বুক মুবারকে একটি পাতলা লোমের রেখা ছিলো।

তিনি খুব লম্বা কিংবা বেঁটেও ছিলেন না। যখন তিনি হাঁটতেন, মনে হতো কোন টিলা থেকে নীচের দিকে নামছেন। সৈন্যদের মতো উভয় পদ মুবারক দ্রুত ওঠাতেন এবং ধীরে ধীরে মাটিতে নামাতেন। [*আমার শায়খ কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এভাবে হাঁটতেন আর বলতেন, এরূপ হাঁটা হলো সুন্নাত।*]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ঘর্মে ছিলো মিশক-আম্বরের সুঘ্রাণ। যখন তা নির্গত হতো, মনে হতো মোতি ঝরে পড়ছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাঢ় কালো দীর্ঘ মুবারক দাড়ি ছিলো। বুক মুবারক পর্যন্ত দাড়িতে আবৃত হয়ে যেতো।

মু'জিযাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবী-রাসূলদের কর্তৃক প্রকাশিত মু'জিযা সত্য। অপরদিকে আউলিয়াদের মাধ্যমেও মাঝে-মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। একে বলে 'কারামত'। এটাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর আক্বীদানুযায়ী সত্য। উভয়টি কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন, মু'জিযা তারই প্রমাণ হিসাবে তাঁদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: ১. খন্দক খননের সময় পাথর চুরমার করে দেওয়া। ২. কাবা ঘরে সংরক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি মক্কা বিজয়ের দিন লাঠির ইশারায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ৩. পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-তরু-লতা ও পাথরখণ্ড থেকে নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান। ৪. হিজরতের দিন ভোরে একমুষ্ঠি বালু নিক্ষেপ করে কাফিরদের চোখ সাময়িক অন্ধ করে দেওয়া ও তাদের অজান্তে গৃহ থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া। ৫. গারে সূরে অবস্থানকালে মাকড়শার জাল বোনা ও কবুতরের ডিম পাড়া। ৬. বৃক্ষরাজি চলন্ত হওয়া। ৭. কাষ্ঠখণ্ড উত্তম তলোয়ারে রূপান্তর। ৮. জীব-জন্তুর অভিযোগ ও তাদের পক্ষ থেকে সম্মানের সিজদা দেওয়া। ৯. পবিত্র হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত হওয়া। ১০. ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক বিষমিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করা। ১১. বৃষ্টির জন্য দু'আ ও বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

অধিকাংশ গবেষকের মতে তাঁর মু'জিযার সংখ্যা হাজারেরও অধিক। নিম্নে আমরা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাঠকদের অন্তরের খোরাক হিসাবে লিপিবদ্ধ করলাম। আল-মিরাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃহৎ একটি মু'জিযা। ইতোমধ্যে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে পুনরুল্লেখ করছি না।

১. সর্ববৃহৎ মু'জিযা কুরআনুল করীম

এটা এমন এক ঐশি কিতাব যার তুলনা জগতসৃষ্টির পর থেকে কখনো হয় নি- কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর হতে চললো। অবতীর্ণ হতে শুরু হয় এই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান কিতাব মক্কা মুকাররমার জাবালে নূরের চূড়ার সেই 'হিরা' গুহায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন মানুষের জন্য হিদায়াতের চিরসত্য বাণী স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম। এরপর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়তী জিন্দেগীতে নাযিল হয় বিভিন্ন সময় পুরো কুরআনে করীম। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য লিখিত কিতাব হিসাবে প্রকাশ করেন। তবে কুরআন শরীফ সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমারই।" (হিজর : ৯)

কুরআন শরীফ যে মানুষের পক্ষে রচনা অসম্ভব তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করে বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস, তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (বাক্বারাহ : ২৩)

এই চ্যালেঞ্জ আরব-অনারব তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি। কিয়ামত পর্যন্ত এটা বহাল থাকবে। সে যুগের আরবের খ্যাতিমান বাগ্মি, বাকপটু, কবি-সাহিত্যিকরা পারেন নি এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে। সুতরাং এ যুগে কিংবা পরবর্তী যে কোনো যুগেও যে কেউ তা পারবে না তা নিশ্চিত। আরব ভাষা-পণ্ডিতগণ যেখানে ব্যর্থ সেখানে

অনারবদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এরপরও এই চ্যালেঞ্জ সবার প্রতি জারী আছে।

কুরআন শরীফের মু'জিযাত ভাব যা তত্ত্ব জগতের সাথে সম্পর্কিত। অলৌকিক এই ভাবের দু'টি দিক আছে: ১. ভাষালঙ্কার ও ২. ভবিষ্যদ্বাণী। ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য এতোই উন্নতমানের যে, এরূপ কোনো কিতাব পৃথিবীতে কখনো রচিত হয় নি। বার বার পাঠ করলে এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যান্য কিতাব একবার পাঠ করে নিলে আর দ্বিতীয়বার পাঠ করার ইচ্ছেই হয় না। এছাড়া কুরআন শরীফ সহজ করে দেওয়া হয়েছে হিফজ করার জন্য। একজন হাফিজ হতে বড়জোর তিন বছর সময় লাগে। তবে কেউ কেউ মাত্র এক মাসের মধ্যেও কুরআন শরীফ হিফজ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। সুবহানাল্লাহ! এ সবই কুরআন শরীফের মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। অনেকে বলেছেন, পবিত্র কিতাবুল্লায় অন্তত ৭ হাজার মু'জিযা আছে। তবে এই ভাষালঙ্কার, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুরূপ বাক্য-রচনার চ্যালেঞ্জ এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ হলো অধিকাংশের মতে কুরআন শরীফের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মু'জিযা।

দ্বিতীয়ত, কুরআন শরীফে যেমন অতীতের অনেক ঘটনাবলী, জনপদ ধ্বংসের ইতিহাস ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যার অনেকগুলো ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। এ সবগুলোই একেকটি মু'জিযা। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি।

(ক) নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ: হুদাইবিয়ার সন্ধির পরই সূরা 'ফাতাহ' এর প্রথম আয়াতেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

(খ) পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী: ইরশাদ হয়েছে,

وَأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

"এছাড়া অন্য আরেকটি বিজয় রয়েছে, যা তোমাদের আয়ত্তে আসে নি। আল্লাহ একে (নিজ ক্ষমতাবলে) পরিবেষ্টন করে আছেন।"

জমহুর মুফাসসিরীনে কিরাম বলেছেন, উক্ত আয়াতে করীমে আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও সিরিয়া (রোমানদের বিরুদ্ধে) বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে।

(গ) কিছু মুসলমান মুরতাদ হওয়ার পূর্বাভাস: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (মাইদাহ : ৩০)

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়-গ্রহণের পর আরবের কোনো কোনো গোত্রের বেশ কিছু লোক ধর্মত্যাগ করে। এরা মুরতাদ হয়ে যায়। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে। বিরাট একদল লোক মিথ্যা নবী-দাবীদার মুসাইলামা বিল কাজ্জাবের অনুসারী হলো। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে 'ইয়ামামার যুদ্ধে (৬৩৩ খ্রি.)' জঙ্গে উহুদের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা মহাবীর হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) ঐ একই বর্ম দ্বারা মুসাইলামাকে হত্যা করেন।

(ঘ) পারস্য ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী: পবিত্র কুরআনের সূরা রূমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ*

"আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায়। তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্তর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে।" (রূম ১-৪)

এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধের ফলাফল রোমানদের পক্ষে যায়। উক্ত দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ পাক এই ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণার ৯ বছরের মধ্যেই পারস্য সৈন্যরা রোমান সৈন্যদের হাতে পরাজয়বরণ করে। উল্লেখ্য যেদিন রোমানদের বিজয় হয় ঠিক সেদিন মুসলমানরা বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে রোমানদের বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে দেন। এতে মুসলমানরা দু'টি বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। ইতোপূর্বে পারস্য মুশরিকরা রোমানদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে। তারা বলাবলি করছিলো, 'একদল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে মুশরিকরা বিজয়ী হয়েছে!'। এ খবরে মুসলমানরা মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়েন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, পারস্যের এই বিজয় সাময়িক। কিছুদিন পর তারা রোমানদের হাতে পরাজিত হবে এবং সর্বোপরি মুসলমানরা অবশেষে উভয় দলকে পরাজিত করবেন। আর তা-ই হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ!

২. মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী

(ক) সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি দ্বীন সুরাইয়া (সিরিয়াস) নক্ষত্রের গায়ে ঝুলন্ত থাকে, তথাপি পারস্যের কিছু লোক এই দ্বীনকে পেয়ে যাবে।"

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে একদল এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মাওলানা

আহমদ সাঈদ দেহলবী প্রণীত, মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), অনুবাদ: মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা ১৯৯৫ ঈ।]

(খ) মুসতাদারায়ে হাকিমে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিকট ভবিষ্যতে এমন হবে যে, লোকজন জ্ঞানের সন্ধানে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করবে। কিন্তু মদীনার আলিম অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আলিম তারা পাবে না।"

হযরত সুফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মদীনার আলিম দ্বারা ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইশারা করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(গ) ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুরাইশ বংশে একজন বড় আলিমের জন্ম হবে। তিনি পৃথিবীকে জ্ঞানের ভাণ্ডার দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন।" রিওয়ায়েতটি বাইহাকী শরীফে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে ইমাম শাফিঈ অপেক্ষা বড় কোনো কুরাইশ বংশীয় আলিম জন্মগ্রহণ করেন নি।

৩. মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বিরাট অগ্নিকুণ্ড

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ৬০০ বছর পর পূর্ণ হয়েছিল। এই বাণীটি সহীহাইন শরীফাইনে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বে হিজায অঞ্চলে এমন তীব্র অগ্নি নির্গত হবে যে, এর

আলোকে সিরিয়া থেকে বসরা নগরীর উটগুলোর গর্দান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে।"

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। ৬৪৫ হিজরি সনের ৩ জুমাদাল উখরা রোজ শুক্রবার ইশার পর মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে হঠাৎ মাটির গর্ভ থেকে এক প্রকাণ্ড অগ্নি নির্গত হতে থাকে। বিরাট এলাকা জুড়ে অগ্নিশিখা দেখাচ্ছিল। অনেকে বলেছেন, দূর থেকে মনে হতো, "এক বিরাট জ্বলন্ত শহর"। অগ্নির দৈর্ঘ্য ছিলো ১২ মাইল এবং প্রস্থ ৪ মাইল। অগ্নির শিখা ৯-১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ছিলো।

ঘটনার সময় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা কাসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত ছিলেন। তিনি এই অগ্নি সম্পর্কে আলাদা একখানা কিতাব রচনা করেন। তিনি বলেছেন, এই অগ্নি মোট ৫৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো।

৪. হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুকালীন অবস্থা

তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আ'রিফ জলিলুল কদর সাহাবী। তিনি জাগতিক সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। আমির-উমারাদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনকে ঘৃণা করতেন। শেষ জীবন লোকালয়হীন 'যুবদাহ' নামক এক স্থানে কাটান। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো। স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কাঁদতে লাগলেন। স্বামীর নিকট যেয়ে মন্তব্য করলেন, "হায়! আমরা এমন এক স্থানে অবস্থান করছি যেখানে ঝোপঝাড় ছাড়া কিছুই নাই! সাহায্যকারী একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না!" হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "হে আমার স্ত্রী! তুমি কেঁদো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে যে এমন এক জায়গায় মারা যাবে, যেখানে লোকজন থাকবে না। তার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল হঠাৎ পৌঁছে যাবে।" হে উম্মে যর! শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কেই বলেছিলেন। যাও বাইরে গিয়ে সেই আগন্তুক দলের অপেক্ষা করো।"

উম্মে যর রাদ্বিআল্লাহু আনহা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সত্যিই দেখা গেল একদল মুসাফির তাঁর বাড়ির দিকে আসছেন। তিনি

তাঁদেরকে হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে সব অবগত করলেন। তাঁরা ছুটে গেলেন ভেতরবাড়ি। তখনও তিনি জীবিত। বললেন, ওহে আগন্তুক ভাইগণ! আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো সরকারী চাকুরী করেন না কিংবা আমির-উমারা নন তিনিই আমার কাফন পরাবেন, জানাযায় ইমামতি করবেন ও দাফন দেবেন। একথা শোনে একজন যুবক এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি আপনার কাফনের জন্য নিজের ইযারবন্দ এবং দু'টি কাপড় দান করবো। এগুলো আমার মায়ের হাতের কাটা সূতায় তৈরী।' হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা কবুল করলেন। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অসিয়ত মতো তাঁকে গোসল, কাফন-দাফন করা হলো। (বাইহাকী শরীফ)

৫. পারস্য সম্রাট পারভেজের মৃত্যুসংবাদ প্রদান

ইমাম বাইহাকী এই ঘটনাটি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই। হিজরি ৬ষ্ঠ সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগের বিভিন্ন সম্রাট ও শাসকবর্গের নিকট পত্রযোগে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাট পারভেজের নিকটও একখানা পত্র প্রেরিত হয় দূত মারফত। অহঙ্কারী বে-আদব পারস্য সম্রাট পত্রখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। বললো, 'মুহাম্মদ' নাম কেন আমার নামের পূর্বে লিখা হলো? রাগান্বিত হয়ে পারস্য সম্রাজ্যাধীন ইয়ামনের শাসনকর্তা 'বাযান'কে নির্দেশ দিল, তুমি দু'জন চৌকস ও বিচক্ষণ লোক মদীনায় প্রেরণ করো। মুহাম্মদকে বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে এসো! [নাউযুবিল্লাহ!]

নির্দেশ পেয়ে বাযান দু'জন দক্ষ ও বিচক্ষণ লোক মদীনা শরীফ প্রেরণ করে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। বে-আদবীপূর্ণ কিছু কথা উচ্চারণ করে বললো, আপনি পারস্য সম্রাটের নিকট চলুন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তচিত্তে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, "তোমাদের সম্রাট পারভেজ তো গতরাতে স্বীয় পুত্র কর্তৃক নিহত হয়েছেন! আল্লাহ তা'আলা ওহির মাধ্যমে এ সংবাদ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা চলে যাও!" তারা বাযানের নিকট ফিরে যেয়ে সব কথা খুলে বললো। বাযান পারভেজের মৃত্যু সংবাদ তখনও জানতেন না। তিনি মন্তব্য করলেন, এই সংবাদ যদি সঠিক হয়- তাহলে তিনি সত্যিই আল্লাহর নবী। খুব শীঘ্র পারভেজের হন্তা শিরভিয়া একখানা চিঠির মাধ্যমে তাকে জানালো, "পারভেজ অত্যাচারী বিধায় আমি তাকে রাতে হত্যা

করে ফেলেছি। আরব দেশে যে লোকটি নবুওয়াতের দাবী করছেন, আপনি তার সাথে কোনো সংঘাতে যাবেন না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই সংবাদের সত্যতা যখন বাযানের নিকট প্রমাণিত হয়ে গেল তখন তিনি দু'জন পুত্রসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান।

৬. ফিরিশতাদের কর্তৃক নিরাপত্তা দান

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুদ্ধে ফিরিশতাদের কর্তৃক সাহায্য করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত আছে। এ সবই তাঁর মু'জিযা হিসাবে স্বীকৃত। তাঁকে ফিরিশতাদের দ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। এ সম্পর্কেও একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এরূপ একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

একবার পাপিষ্ঠ মুশরিক আবু জাহল বললো, 'আমি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদকে মাটির উপর (নামায অবস্থায়) নাক ঘষতে দেখি তাহলে (নাউযুবিল্লাহ্) আমার পা দ্বারা তাঁর গর্দান পিষ্ট করে ফেলব!" ঘটনাক্রমে একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করাকালে পাপিষ্ঠ আবু জাহল উপস্থিত হয়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে অগ্রসর হলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর উভয় হাতে সে অদৃশ্য কিছু প্রতিহত করতে করতে পেছনের দিকে সরতে লাগলো। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললো, 'আমি ও মুহাম্মদের মাঝখানে ভীতিপ্রদ জ্বলন্ত অগ্নির এক বিরাট গর্ত দেখতে পেলাম। কতিপয় ডানাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আবু জাহল যদি আমার নিকটে আগমন করতো তাহলে ফিরিশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে যেতেন!" আল্লাহু আকবার!

৭. খাবারে অতিমাত্রায় বরকত

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তী জিন্দেগীতে 'খাবারে বরকতের' ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এরূপ মু'জিযার সবগুলো এখানে বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মাত্র বিশুদ্ধ বর্ণনা তুলে ধরছি।

(ক) পেয়ালার খাবারে বরকত: তিরমিযী ও দারিমী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কোনো একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটি পেয়ালায় রাখা খাদ্য ভক্ষণ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর পর ১০ জন করে লোকসংখ্যা বাড়ছিলো। সকলেই ঐ একই পেয়ালা থেকে খাচ্ছিলেন। প্রথম ১০ জনের খাওয়া শেষ হওয়ার পর আরো ১০ জন এসে বসছিলেন। এভাবে পালাক্রমে আহার গ্রহণ চলছিলো। মানুষ হযরত জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, পেয়ালার মধ্যে খাদ্য কিভাবে আসছিলো? তিনি আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওখান থেকে আসছিলো।

(খ) দু'জনের খাবার একশত ত্রিশ জনে খেলেন: বাইহাকী ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সহীহ সদনে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশজন আনসার নিয়ে উপস্থিত হলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সবাই ঐ দু'জনের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার দ্বারা পেট পুরে খেলেন। আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার, খাবার তখনও সম্পূর্ণ শেষ হলো না- কিছুটা রয়ে গেল। এরপর আরো কিছু লোক এসে খাবার খেতে লাগলেন। মোট ১৩০ জন লোক দু'জনের জন্য পাক করা খাবার খেলেন। অনেকে মুসলমান হলেন ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন।"

(গ) আসহাবে সুফফার সকলকে নিয়ে আহার: মুসলিম ইবনে আবু শাইবা ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি রিওয়ায়েত তাঁদের স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে আসহাবে সুফফার সকল লোককে ডেকে আনতে আদেশ দিলেন। সবাইকে নিয়ে আসার পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মুখে একটি খাদ্যভর্তি পেয়ালা রাখলেন। সকলে এ থেকে তৃপ্তিসহ আহার করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পেয়ালার খাদ্য যেই-সেই রয়ে গেল। শুধু এটুকু লক্ষ্য করলাম, পেয়ালার খাদ্যে আঙ্গুলের অনেক দাগ আছে।" উল্লেখ্য মুহাদ্দিসীনে

কিরাম উল্লেখ করেছেন, আসহাবে সুফফায় একান্ত গরীব অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন শতাধিক সাহাবায়ে কিরাম বাস করতেন। কারো কারো মতে তাঁদের সংখ্যা ৪ শতাধিক ছিলো।

(ঘ) আধা সের আটার রুটি খেলেন চল্লিশ ব্যক্তি: ইমাম আহমদ ও ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনা স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তালিব গোত্রের চল্লিশ জনকে দাওয়াত করলেন। এদের কেউ কেউ খুব বেশী পেটুক ছিলেন। একাই একটা আস্ত বকরি খেয়ে নিতেন। এছাড়া একজনে আট সের পর্যন্ত দুগ্ধ পান করে ফেলতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পেটুকদের জন্য মাত্র আধা সের আটার রুটি তৈরী করালেন। অতিথিরা এটুকু রুটি খেয়ে শেষ করতে পারলেন না- বেশ কিছু রয়ে গেল! এরপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালায় বড়জোর ৪ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, দুধ আনলেন। এবারও তারা সকলে তৃপ্তিসহ দুধ পান করলেন- কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। মনে হচ্ছিল, কেউই দুধ পান করেন নি!" সুবহানাল্লাহ!

৮. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এই মু'জিযার বর্ণনা সর্বাধিক সহীহ হাদীসগ্রন্থ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। মূল বর্ণনাকারীদের মধ্যে আছেন হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। ঘটনাটির বর্ণনা নিম্নরূপ।

হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জমায় একদা আবু জাহল, ওলিদ ইবনে মুগিরা, আস ইবনে ওয়ায়িল প্রমুখ মুশরিক একত্রিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে চ্যালেঞ্জ করলো, 'আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আকাশের চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান!' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি এরূপ করে দেখাতে পারি, তবে কি তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে?" তারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে যাবো'।

হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি চন্দ্রটির দিকে অঙ্গুলি মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন। আল্লাহর কী কুদরত! সত্যিই চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল! উপস্থিত সকলেই তা দেখলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজের চোখে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে দেখেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের নাম ধরে ধরে বললেন, "হে অমুক, হে তমুক! সাক্ষী থাকো, সাক্ষী থাকো ..."।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য সকলের চোখে পড়লো। উভয় খণ্ড এতো দূর পর্যন্ত চলে গেলো যে মাঝখানে হিরা পর্বত দেখাচ্ছিল। স্বচক্ষে এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা অবলোকন করার পরও পাপিষ্ঠ কাফিররা বলে ওঠলো, 'এ-তো প্রকাশ্য যাদু!' আবু জাহল বললো, 'আমরা এ ব্যাপারে আরো খোঁজ-খবর নেবো। যদি এটা যাদু হয়ে থাকে, তাহলে শুধু আমাদের উপরই হতে পারে। অনুপস্থিত যারা এবং অন্যান্য শহরে বসবাসকারীদের উপর তো যাদুর ক্রিয়া বিস্তৃত হতে পারে না। তাই বাইর থেকে আগত লোকজনদের নিকট থেকে ব্যাপারটি জেনে নেওয়া উচিৎ।' আবু জাহলের এই চ্যালেঞ্জও বাতিল হলো। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে বলতে লাগলেন, তারাও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখেছেন।

এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেছেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

-"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা ক্বামার ১-২)

তারিখে ফিরিশতা, সাওয়ানিহুল হারামাইন ইত্যাদি ইতিহাসগ্রন্থে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ অবলোকন করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তারিখে ফিরিশতায় আছে, মালাবারের এক রাজা মুসলমানদের নিকট থেকে এই ঘটনা শ্রবণ করে যুগের পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থ খোঁজে দেখেছি, আরবের এক নবীর ইশারায়

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবে। আপনি যে ঘটনার কথা বলছেন, সেটা সে-ই ঘটনা।' একথা শোনে রাজা মুসলমান হয়ে যান।

সাওয়ানিহুল হারামাইন কিতাবে আছে, মালোহ রাজ্যের চম্বল নদীর তীরে 'দিহার' নামক একটি শহর আছে। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ক্ষণে সেখানকার রাজা তাঁর প্রাসাদের ছাদে বসা ছিলেন। তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আকাশের চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এরপর আবার একত্রিত হলো। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি সম্পর্কে দেশের পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আরব দেশে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ পাবে।' এটা জানার পর রাজা একজন দূত মক্কা মুয়াজ্জমায় হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে নিজে মুসলমানও হয়ে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাজার নাম রেখেছিলেন, আবদুল্লাহ। রাজা আবদুল্লাহর কবর এখন দিহার শহরের বাইরে অবস্থিত। (মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১২০-১২২)

৯. পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া

ইমাম বুখারী রিওয়ায়েত করেন, একদা এক পাহাড়ের উপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হঠাৎ পাহাড়ে কম্পন শুরু হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পা মুবারক দ্বারা সজোরে পাহাড়ের উপর আঘাত হেনে বললেন, "হে পাহাড়! কম্পন করো না, তুমি কি জানো না তোমার উপর অবস্থান করছেন একজন নবী, একজন সত্যবাদী ও দু'জন শহীদ?" আল্লাহর কুদরতে পাহাড়ের কম্পন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। এখানে দু'টি মু'জিযা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথমত পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া এবং দ্বিতীয়ত হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার শাহাদাতবরণের ভবিষ্যদ্বাণী।

১০. খর্জুর শাখার ক্রন্দন

এই মু'জিযাটির বর্ণনা সহীহ বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ আছে। ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মসজিদে নববীর মধ্যে তখনও কোনো মিহরাব নির্মিত হয় নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খর্জুর বৃক্ষের একটি শাখার মধ্যে হেলান দিয়ে জুমু'আর খুতবা প্রদান করতেন। এরপর তিনি একটি মিহ্‌রাব তৈরী করলেন। প্রথমদিন নবনির্মিত মিহ্‌রাবে আরোহণ করে খুতবা প্রদানের সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামসহ সকলে শুনতে পেলেন ঐ খর্জুর শাখাটি শিশুদের মতো করুণ সুরে ক্রন্দন করছে! পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাখাটির কাছে যেয়ে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে একে সান্ত্বনা দান করলেন। শাখার ক্রন্দন তখন থেমে গেল।

সুফিদের আদর্শ পুরুষ

এই গ্রন্থে আমরা তাসাওউফ-শাস্ত্রপন্থী তথা সুফি-দরবেশ-ওলিদের জীবনালোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও কর্মের ওপর উপরে বর্ণিত আলোচনায় স্বভাবতই তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা জরুরী ছিলো। তিনি ছিলেন সমগ্র মানব ও জিন জাতির জন্য পথপ্রদর্শন এবং সর্দার। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার ওপর তিনি আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত নন। তবে আমাদের গ্রন্থের মূল বিষয় তথা তাসাওউফ শাস্ত্রেরও উৎপত্তিস্থল তাঁরই পবিত্র জীবন থেকে উৎসারিত। এই শাস্ত্র যা কিছু শিক্ষা দেয়, তা সবই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আ'মল থেকে উদ্ভুত।

সুফিরা যেসব গুণাবলী অর্জনের জন্য জীবনভর সাধনা করে থাকেন তার সবই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর অন্যতম দিক ছিলো। তিনিই প্রথম পুরুষ যার মধ্যে একই সাথে ইখলাস, তাওবাহ, মুহাব্বাত, শাওক (আগ্রহ), খাওফ (খোদাভীতি), রাজা (আল্লাহর রাহমাতের আশা), যুহদ (দুনিয়ার জাঁকজমক থেকে উদাসীন), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা), কিনাআত (অল্পেতুষ্টি), হিলম্ (সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্যতা), সবর (ধৈর্য), শুকুর (কৃতজ্ঞতা), সিদক্ব (দৃঢ়তা), রেজা (সন্তুষ্টি), ফানা (আল্লাহতে বিলীন), ফানাউল ফানা (আল্লাহতে বিলীনের মধ্যে বিলীন) ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল। এক কথায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 'ইনসানে কামীল' - পুর্ণাঙ্গ আদর্শ পুরুষ। সুতরাং একমাত্র তাঁর অনুসরণের মধ্যেই মানুষের ইহ-পরকালের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পবিত্র নৈকট্যে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত উসমান ইবনে আফফান, হযরত যায়িদ বিন হারিসা, হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আবু যর গিফারী, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আমর ইবনে আস, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন প্রমুখ মহাত্মনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহিলা সাহাবীরা তো ছিলেনই। বিশেষ করে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রাত্মা স্ত্রীরা যে কতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না নারী ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ভাগ্যবান এসব পুরুষ ও নারীরা সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদৃষ্টি, দু'আ, আধ্যাত্মিক উষ্ণতা, তাওয়াজ্জুহ ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা-বান্দী ও ওলি-ওলিয়্যাতে রূপান্তর হয়েছিলেন। আর এদের নৈকট্যে ও সুদৃষ্টিতে যারা উপকৃত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন তাবিঈগণ।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ক্বাদিরীয়া সুফি তরীকার মূলে ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু
(২৩ হিজরীপূর্ব - ৪০ হিজরী, সমাধি: নাজাফ, ইরাক।)

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলিম উম্মার চতুর্থ খলীফা ছিলেন। অনেকের মতে মাত্র ৯ কিংবা ১০ বছর বয়সে তাঁর ইসলামগ্রহণ ছিলো পুরুষদের মধ্যে প্রথম। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আপনজন ছিলেন। শরীয়ত, তরীকত, হাক্বিকাত ও মা'রিফাতে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ক্বাদিরীয়া তরীকার শাজারায় ফায়েজে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারিধারা তাঁরই মাধ্যমে পরবর্তী সুফিদের মধ্যে বিকাশ ঘটেছিল।[৯]

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হিজরীপূর্ব ২৩ সাল মুতাবিক ৫৯৯ কিংবা ৬০০ ঈসায়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ২৯ কিংবা ৩০ বছর ছিলো। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতার নাম ছিলো আবু তালিব। কুরাইশ (হাশিমী) বংশের প্রসিদ্ধ এই পুরুষ ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা। সুতরাং এ হিসাবে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন হযরতের চাচাতো ভাই। তাঁর মাতার নাম ছিলো ফাতিমা বিনতে আসআদ। তিনিও হাশিমী বংশের মহিলা ছিলেন।

ইসলামগ্রহণ

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বয়স ৯ কিংবা ১০ হবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি এক রাত্রে লক্ষ্য করলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা

---

[৯] এখানে উল্লেখ্য যে, চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি তরিকা হযরত আলী মুর্তাজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ফায়েজ ও বরকতের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে।

রাদ্বিআল্লাহু আনহা অজু করে নামায আদায় শেষে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন আছেন। এ দৃশ্য দেখে বালক আলীর মনে আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো। এমন সুন্দর, আত্মিক প্রশান্তপূর্ণ ক্ষণ তাঁর জীবনে ইতোমধ্যে কখনো তিনি উপলব্ধি করেন নি। এভাবে ইবাদাতের গুঢ় রসহ্য সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর কচি মন আন্দোলিত হয়ে উঠলো।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবকিছু জিজ্ঞেস করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সবকিছু বুঝিয়ে বলার পর বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান বালক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু আর কালবিলম্ব না করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলাম ধর্ম কবুল করে নিলেন। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা যে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম মুসলমান ছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আলী এবং হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, এই তিন জনই প্রথম মুসলমান হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি উত্তম সমাধান হলো, বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, দাসদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু (পরবর্তীতে তাঁকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত করে দেন) এবং বালকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান ছিলেন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

তুমি আমার ভাই, তুমি আমার উত্তরাধিকারী

হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বয়স মাত্র ১৫ বছর। নুবুওয়াত লাভের প্রাথমিক দিকে একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের একটি টিলায় দাঁড়িয়ে ৪০ ব্যক্তির সামনে কথা বললেন। এই দলে কুরাইশদের হাশিমী শাখার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আমীর হামযা, আব্বাস, আবু তালিব এবং কিশোর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, “হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সম্মুখে দুজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ হাজির

করেছি। বলো, তোমাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে এবং কে আমাকে সাহায্য করবে?"

কেউ কথা বলছিলো না। এরূপ নীরবতা দেখে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সহ্য হলো না, বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখানে সবার ছোট এবং এখনও দুর্বল। এরপরও আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আমি আপনার সাহায্যে অটল ও আস্থাশীল থাকবো"। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত খুশী হলেন। তবে তিনি চাচ্ছিলেন অন্যরা কী জবাব দেন তা জানতে। তাই আবার একই প্রশ্ন করলেন। এবারও সবাই নীরব। তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকলো। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু পুনরায় দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারায় বসিয়ে দিলেন। সবার মধ্যে নীরবতা লক্ষ্য করে আবারো তিনি একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! একটা লোকও কিছু বললো না। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সহ্য করতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাহায্য করবো, আপনার প্রতি আস্থাশীল থাকবো"।

কিশোর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এরূপ বক্তব্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হয়ে বললেন, "হে আলী! সত্যিই তুমি আমার ভাই, তুমি আমার উত্তরাধিকারী"।

হিজরতের পর মদীনার আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। মুহাজিরদের সকলেই নিজেদের আনসার ভাই পেয়ে গেলেন কিন্তু বাকী রইলেন একমাত্র আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কিছুটা ম্লান বদনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবাই তাদের ভাই পেয়ে গেলো- কিন্তু আমি তো পেলাম না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আদর করে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমার সাথে ইহ-পরকালে ভাইয়ের সম্পর্ক তো আমার আগে থেকেই রয়েছে। আজ হতে তুমি জেনে রাখো, আমি তোমার ভাই"। এ সংবাদে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অন্তরাত্মায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। অনন্তর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উত্তোলন করে দু'আ করলেন,

হে আল্লাহ! আলী আজ হতে আমার একান্ত আপন, আর আমিও তার একান্ত আপন। আমি তাকে ভালোবাসি।”

ইলমের সাগর

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু যে ইলমে দ্বীনের সাগর ছিলেন তার স্বীকৃতি এসেছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি বলেছেন:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

“আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী এর দরজা”। (তাবারানী, মুসতাদারাকে হাকিম, মা’রিফাতুস-সাহাবা- আবি নুয়াঈম)

হযরত আলীর বোধশক্তি, হাক্বিকাতের ব্যাখ্যা ইত্যাদি ছিলো অদ্বিতীয়। তিনি সুলেখকও ছিলেন। এছাড়া কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর আত্মত্যাগ ও কুরবানী ছিলো রীতিমতো বিস্ময়কর। হিজরতের প্রাক্কালে যে রাতে মক্কার কাফিরগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, সে রাতে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজীর বিছানায় শুয়ে থাকার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। কাফিররা তাঁকে যে হত্যা করতে পারে তা তিনি জানতেন, তথাপি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের নিরাপত্তার সম্মুখে নিজের জীবন তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেছিলেন। তাঁর এই কাজটি স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা পছন্দ করে ফিরিশতাদের নিকট গর্ব করেছিলেন।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি শের-ই-খোদা [আল্লাহর ব্যাঘ্র] হিসাবে সুপরিচিত। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদর, উহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, খায়বার ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁরই হাতে বিজিত হয়েছিল। আমরা এই ঘটনাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

সুফিদের সর্দার হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

অধিকাংশ সুফি তরীকা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলমে মা'রিফাতের সুধা আহরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, ধর্মের মূল হলো আল্লাহর পরিচিতি তথা মা'রিফাত লাভ করা। তিনি বলেন, "মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বাম হলো তাঁর (আল্লাহর) অস্তিত্বের প্রমাণ; অস্তিত্বের প্রমাণের উচ্চতর মাক্বাম হলো তাওহিদ; তাওহিদের উচ্চতর মাক্বাম হলো সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আধিপত্যের স্বীকৃতি। তিনি (আল্লাহ) সকল গুণাবলীর ঊর্ধ্বে। কোনো বিশেষ গুণ তাঁর সঠিক স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক নয়। তিনি কোনকিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত নন। কিন্তু সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অসীম, সীমাহীন, সময়ের ঊর্ধ্বে, স্থানের ঊর্ধ্বে, কল্পনার বাইরে। সময় তাঁর উপর ক্রিয়া করে না। যখন কোনকিছু ছিলো না তখন তিনি ছিলেন, তিনি অনন্তকাল অস্তিত্বশীল থাকবেন। জন্ম-মৃত্যুর আইন-কানুন তাঁর অস্তিত্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান অথচ কোনকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি কোন কিছুর কারণ নন, অথচ সবকিছুর কারণ তিনি। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টি করেন ধ্বংসও করেন। সবকিছু তাঁর নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। তিনি কোনকিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু নির্দেশ দেন (كُنْ- হও!) এবং তা হয়ে যায় (فَيَكُونُ)।"

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বাপেক্ষা নিষ্কলুষ জিনিস কি যা অর্জন সম্ভব? তিনি জবাব দিলেন, "এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক আলোকিত হৃদয়"।

মা'রিফাত কী? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "আল্লাহকে আল্লাহর মাধ্যমে জানা, যা আল্লাহর মাধ্যমে নয় তা আল্লাহর নূরে জানা।"

যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, "অবশ্যই! তাঁকে না জানলে আমি কিভাবে তাঁর উপাসনা করবো?"

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নামায

কথিত আছে তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কলা পাতার মতো তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হতো। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "একটি আমানত পূর্ণ

করার সময় এসেছে। যে আমানতকে আকাশ-পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে নি- কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করেছে।” হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, “হযরত আলীর মতো এই পৃথিবীতে কেউ এমন উচ্চমানের নামায আদায় করতে পারে নি।”

নামাযের সময় তাঁর অবস্থা এমন হতো যে, তিনি প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতেন। একদা হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অজ্ঞান অবস্থায় নামাযের মুসাল্লায় পড়ে আছেন দেখে ভাবলেন, তিনি বুঝি এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছেন! হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তখন জানালেন যে, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায়ই এভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক। হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা শ্রবণ করে কাঁদতে শুরু করলেন এবং কিছু পানি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দিলেন। এতে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলো। তিনি আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ক্রন্দন করছো কেন? এই অবস্থায় আমাকে দেখে তোমার চোখে অশ্রু এসেছে। কিন্তু ভেবে দেখো, যেদিন ফিরিশতারা টেনেহেঁচড়ে আল্লাহর সম্মুখে নিয়ে যাবে এবং আমাকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন আমার কি অবস্থা হবে? তাঁরা আমাকে লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে নেবে আল্লাহর সম্মুখে এবং আমার বন্ধুদের যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে, কিছুই করার শক্তি রাখবে না। তারা কোনো সাহায্যে আসবে না- একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহই সেদিন আমার কাজে আসতে পারে।”

ফানাফিল্লাহ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফানাফিল্লাহর সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেছেন, “আল্লাহর অনন্ত মহাসাগরে মানুষ একটি ঢেউ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরাত্মা অজ্ঞতা ও জৈবিক ক্ষুধা দ্বারা অন্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে আলাদা সত্তা হিসাবে অনুভব করতে থাকবে। কিন্তু সে ও প্রভুর মধ্যকার হিযাব বা পর্দা যখন উঠে যাবে তখন সে সত্যিকার হাক্বিকাত সম্পর্কে অবহিত হবে। তখন সেই ঢেউ সাগরের সাথে মিশে যাবে”।

তিনি সর্বদাই বলতেন, মানুষকে প্রথমে নিজের পরিচয় অর্জন করতে হবে। আর নিজেকে না চিনে প্রভুকে জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং এই জানার প্রথম স্তর হলো শরীয়তের অনুসরণ। শরীয়তের ভেতরই তাসাওউফ বিদ্যমান।

জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর উপর গুণিজনের মন্তব্য

হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার স্বামী ছিলেন। তবে তিনি কিভাবে নবী-দুলালীর স্বামী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন সে ঘটনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

কথিত আছে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর সামনে ঘোষণা দিলেন, “যে কেউ সবার আগে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করে আসতে পারবে, তারই নিকট আমার মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে দেবো।” সবাই দ্রুত কুরআন তিলাওয়াতে লেগে গেলেন। কিন্তু দেখা গেলো হযরত আলী কিছুক্ষণ পরই হযরতের নিকট এসে হাজির হয়ে গেছেন! আশ-পাশে তখনও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন সাহাবারা আশ্চর্যবোধ করলেন, সবাই হযরত আলীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি, তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। আর তিলাওয়াতের মধ্যে সওয়াবই মূখ্য উদ্দেশ্য- সুতরাং আমি তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে চলে এসেছি!” একথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঠোঁটদ্বয়ে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমিই আমার মেয়ের স্বামী হওয়ার যোগ্য।

তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব যে পাওয়া যায়, তা সহীহ ইবনে হিব্বানে শুদ্ধ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

দাওয়াতী কাজেও তাঁর জুটি ছিলো না। দশম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ইয়ামনে প্রেরণ করেন। এই অভিযানের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ইয়ামনবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা। হযরত খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু দীর্ঘ ৬

মাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হলেন। কেউই মুসলমান হলো না। শেষ পর্যন্ত রমযান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে এই মিশনে প্রেরণ করলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাঁর পবিত্র হাত মুবারক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বুকের উপর রেখে দু'আ করলেন। তিনি ইয়ামনে পৌঁছে দাওয়াতী কাজ শুরু করতেই ইয়ামনবাসী অবিশ্বাস্যভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন "আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু উম্মত হলেন আবু বকর; আল্লাহর দ্বীনের উপর একনিষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন উমর; সর্বাপেক্ষা বিনয়ী হলেন উসমান; এবং আলী হলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম জ্ঞানের অধিকারী"।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হযরত আবু আবদুল্লাহ জাদালীকে একদা বললেন, "[কুফায়] আল্লাহর রাসূলকে কি কেউ অপমান করছে?" তিনি বিস্ময়ে জবাব দিলেন, "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি!" উম্মুল মু'মিনীন আবার বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে কেউ আলীকে অপমান করে, আমাকেই অপমান করে'।"

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তি হচ্ছেন আলী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এবং উবাই ইবনে কাব (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) হলেন কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে সর্বাধিক দক্ষ।" হযরত আলী সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে 'খারিজী' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এই দলটিই ছিলো ইসলামের প্রথম চরমপন্থী বিদআতী। এরা বিশ্বাস করতো, সকল পাপীই কাফির এবং যারা তাদের এই আক্বীদায় বিশ্বাস রাখে না, তারাও কাফির। তাদের এই ভ্রান্ত আক্বীদার উপর ভিত্তি করে তারা মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাদের দলে যোগ

দেওয়ার একটি শর্ত ছিলো, প্রথমে নিজেকে অমুসলিম ঘোষণা করে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে।

এই খারিজীরা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আমর ইবনে আ'স রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একই সঙ্গে হত্যার এক গুরুতর ষড়যন্ত্র করে। তারা তিনজন ঘাতককে এই দায়িত্ব অর্পণ করে। এরা ছিলো: আমর ইবনে বকর তামিমী, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিরিয়ার মসজিদে যেয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করা; দ্বিতীয় জনের নাম ছিলো, বকর ইবনে আবদুল্লাহ তামিমী। সে দায়িত্ব নেয় মিসরে যেয়ে হযরত আমর ইবনে আসকে হত্যা করার এবং তৃতীয় ঘাতকের নাম ছিলো আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম। সে দায়িত্ব নেয় কুফার মসজিদে যেয়ে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে হত্যা করতে।

তিন জনের মধ্যে একমাত্র মুলজাম সফলকাম হয়েছিল। সে তার শপথ অনুযায়ী ১৭ রমযান বদর দিবসে রোজ শুক্রবার ফজরের নামাযে মসজিদে অবস্থান নেয়। সে সারা রাতই মসজিদে থেকে হত্যার ফন্দি আঁটছিলো অন্যান্য খারিজীদের সঙ্গে। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মসজিদের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন সেখানে ইবনে মুলজাম ও তার এক সহযোগী আত্মগোপন করে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। এদিকে হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহুর) সারারাত ঘুম হয় নি। একবার সামান্য চোখ লাগতেই তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি এই স্বপ্নের বর্ণনা স্বীয় পুত্র হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাবা হাসান, আমি তোমার নানাজানকে দেখলাম, তাঁকে সবিনয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উম্মত দ্বারা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। তিনি জবাব দিলেন, দু'আ করো আল্লাহ তা'আলা যেনো তোমাকে শীঘ্রই তাদের কবল থেকে মুক্ত করেন। তিনি বলেন, মহানবীর পরামর্শ অনুযায়ী আমি ঠিক এই দু'আ করলাম।

হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সে-ই চরম বেদনাময় ক্ষণটি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন, আমি আব্বাজানের হাত ধরে যেই মাত্র মসজিদের ভেতর পা দিয়েছি, তখনই দেখলাম দু'টি তরবারি একসাথে চমকে উঠেছে। শাবির নামক অপর ঘাতকের আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ইবনে মুলজাম সফল হলো। হযরত আলী

রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মস্তক প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। তিনি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি। ঘাতককে তোমরা পাকড়াও করো! শাবির ও ইবনে মুলজাম উভয়ই ধরা পড়ে গেল। ইতোমধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর নির্দেশে ঘাতক ইবনে মুলজামকে সামনে হাজির করা হলে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তোর উপর আমার কোনো অনুগ্রহ নেই কি?

ইবনে মুলজাম স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিল। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাকে আর কিছু না বলে স্বীয় পুত্র হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, বাবা! ইবনে মুলজাম এখন বন্দী তাই তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আমি বেঁচে থাকলে তার দণ্ড আমিই দেবো। এটুকু বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এরপর আবার তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলো। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও অপর পুত্র মুহাম্মদ বিন হাফিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে উপদেশ দিলেন। উপস্থিত মুসলমানদেরকেও কিছু নসিহত করলেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁর দেহখানা শীতল হয়ে এলো। তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। সবার মুখে উচ্চারিত হলো অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে সেই বাক্য:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৩ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ৪ বছর ৯ মাস স্থায়ী ছিলো। ঘাতক ইবনে মুলজামকে শরয়ী আইন মুতাবিক মৃত্যুদ দণ্ডিত করা হয়।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মূল্যবান উপদেশ বাণী

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলমানদের জন্য মহামূল্যবান অনেক উপদেশ বাণী রেখে গেছেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত এসব বাণীর একটি তালিকা নীচে পেশ করা হলো।

১. তিনি বলেন, তোমরা জ্ঞানার্জন করো- তাহলে আল্লাহর মা'রিফাত ও তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পাবে। মনে রেখো, তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে যখন সত্যের দশ ভাগের নয় ভাগই মানুষ অস্বীকার করবে। একমাত্র আল্লাহমুখী, তাওবাকারী ছাড়া কেউই এই ফিৎনা থেকে রেহাই পাবে না।

২. হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সাবধান! দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার হয়ো না।

৩. সাবধান! যারা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ তারা মাটিকে বিছানা ও ধূলাকে বিছানার চাদর রূপে গ্রহণ করে। তারা পানিকে সুগন্ধিরূপে বরণ করে।

৪. আখিরাতমুখিরা কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। যে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে তার নিকট যাবতীয় সমস্যা অতি তুচ্ছ মনে হয়।

৫. জেনে রাখো, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন যারা জান্নাতীদের ও জাহান্নামীদের বসবাস করতে দেখেছেন। এসব মহাত্মনদের অন্তর-আত্মা পূত-পবিত্র। তাঁদের পার্থিব চাহিদা খুব সীমিত।

৬. একদিন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসাবাণী উচ্চারণের পর মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! মৃত্যুকে ভয় করো। তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে চাইলে, সেটি তোমাদেরকে খুঁজে বের করবে। সুতরাং পরকালীন মুক্তি চাও, পরকালীন মুক্তি কামনা করো। জলদি করো, জলদি করো। কবরের মাটি তোমাদেরকে পেছন থেকে তাড়া করছে।

৭. কবর হয়তো আগুনের গর্ত অথবা বেহেশতের বাগান হবে। জেনে রেখো প্রতিটি কবর দৈনিক তিন বার কথা বলে। সে বলে, আমি অন্ধকার, পোকা-মাকড় ও একাকীত্বের ঘর।

৮. সত্য যার কল্যাণ করতে পারে না, মিথ্যা তার অকল্যাণ করবেই। হিদায়াত যাকে সরল পথে আনতে পারে না, গোমরাহী তাকে বাঁকা পথে নিয়ে যাবেই।

৯. দুনিয়া হচ্ছে নগদ পণ্য। পুণ্যবান ও পাপাচারী সবাই তা থেকে খায়।

১০. কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ সৎ ব্যক্তিকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দীর্ঘ কামনা ও আশা মানুষকে আখিরাতের কথা থেকে গাফিল করে দেয়।

১১. ক্ষেত দু'প্রকার: দুনিয়ার ক্ষেত আর আখিরাতের ক্ষেত। দুনিয়ার ক্ষেত হলো ধন-সম্পদ ও তাকওয়া, আর আখিরাতের ক্ষেত হলো জমা থাকা সৎকর্মগুলো। কতেক লোককে মহান আল্লাহ উভয় ক্ষেতের মালিক বানিয়ে দেন।

১২. দুনিয়া হলো গলিত শব এবং একে যারা ভালোবাসে তারা হলো কুকুর। যে কেউ এই দুনিয়া থেকে কিছু পেতে ইচ্ছুক সে যেনো নিজেকে কুকুরদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেয়।

হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(জন্ম ২২ হিজরী - মৃত্যু ১১০ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো হাসান ইবনে আবুল হাসান ইয়াসির আবু সাঈদ বসরী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবিঈ, ফকীহ, বসরার ইমাম, সুফিদের সর্দার এবং তাঁর যুগের আলীমদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতার নাম ছিলো ইয়াসির। তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ ইবনে তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। হযরত হাসান বসরীর মাতার নাম ছিলো খায়রাহ। তিনিও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মুক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁর জন্মের পর মাতা খায়রাহ তাঁকে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে যান এবং দু'আ কামনা করেন। তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দিলেন এরপর দু'আ করলেন: "হে আল্লাহ! একে ইসলামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করো, মানুষের নিকট সে হয়ে উঠুক প্রিয়।" তিনি আরো বললেন, "এর নাম রাখো হাসান, কারণ তার চেহারা খুব সুন্দর"।

উম্মত জননী হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নিজেই হযরত হাসান বসরীকে শিশু থাকাকালে লালন-পালনে সহায়তা করেছিলেন। মাতা খায়রাকে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকতে হতো, তখন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হাসান বসরীকে নিজের স্তন্যদান করে শান্তি রাখতেন। এভাবে শিশু হাসান বসরী নবী-পরিবারের একজন নারীর দুধপান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের কঠোর অনুসারী ছিলেন। এছাড়া প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও সাধনার ক্ষেত্রে তিনি সে যুগে খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে সবার নিকট সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি অবশ্য সুফিদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। সারা জীবন একটিমাত্র পশমী জুব্বা পরে কাটিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন: "আমি হাসান ও ইবনে সীরীন এই দু'ব্যক্তির কারণে বসরাবাসীদের প্রতি ঈর্ষা করি!" প্রখ্যাত স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা ও তাবিঈ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "আমি যতো ফকীহ ব্যক্তির সঙ্গে বসেছি, তাদের মধ্যে সবার সেরা

হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পেয়েছি। আমার চোখ তাঁকে অপেক্ষা বড় ফকীহ আর দেখে নি।”

মুহাম্মদ ইবনে সা’দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী সম্পর্কে মন্তব্য করেন: “ইতিহাসবিদগণের মতে, হাসান বসরী ইলম ও আমলের সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি ছিলেন আলিম, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, ফকীহ, নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ, অধিক ইলম ও আমলের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, সুশ্রী ও সুদর্শন। একবার তিনি পবিত্র মক্কায় গমন করে মঞ্চে উপবেশন করেন। আলিমগণ তাঁর চারপার্শ্বে বসেন এবং জনতা এসে তাঁর নিকট ভিড় জমায়। তিনি তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - বঙ্গানুবাদ)

বাইআত

হযরত আবু যুরআহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র ১৪ বছর বয়সে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত হন। এরপর তিনি কুফা ও বসরাতে চলে যান।

সালফে সালিহীন মহাত্মনরা হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একজন ‘আবদাল’ ওলি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একটি হাদীসে আছে: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “পৃথিবীর জমিনে চল্লিশ ব্যক্তি সর্বদাই জীবিত থাকবেন যারা হবেন (ইব্রাহীম) খলীলুল্লাহর মতো। এদের মাধ্যমেই মানুষ বৃষ্টি (অর্থাৎ রাহমাত) এবং সাহায্য পাবে। কেউ মারা গেলে তার বদলে আরেক জনকে আল্লাহ তা’আলা নিযুক্ত করে দেন।” হযরত আবু কাতাদা (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বলেন, “আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, হযরত হাসান বসরী সেই আবদালদের একজন।” (তাবারানী)

তাবিঈনদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এই মহাত্মন ওলিআল্লাহ অন্তত ১৪০০ হাদীসের বর্ণনাকারী। তিনি বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী বিন আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণ মিলে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম সূয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে দলীল

পেশ করে মন্তব্য করেছেন যে, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সরাসরি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বিচারকার্যে হাসান বসরীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন”। (মুসান্নাফ, ৭ : ৪১২)

অলিআল্লাহদের প্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ ‘হিলায়াতুল আওলিয়া’ এর প্রণেতা আবু নু’আইম ইসফাহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ হযরত ওয়াহিদ ইবনে যায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ: ১৭৭) সর্বপ্রথম আবাদান নামক শহরে সুফিদের ‘খানক্বাহ’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (হিলায়াতুল আওলিয়া, ৬ : ১৫৫) হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর মুরীদানের ব্যাপক সুনাম তখনকার বসরা ও আশপাশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ কারণেই পরবর্তীতে ইবনে তাইমিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘আস-সুফিয়্যা ওয়াল ফুক্বারা’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, “তাসাওউফের উৎসস্থল হলো বসরা”। তবে অধিক সত্য কথা হলো, বসরা ছিলো তাসাওউফশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক তথা আত্ম-সংযম, সাধনা, আত্ম-শুদ্ধি এবং অন্যান্য জরুরী মানবিক গুণাবলী অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের স্থান। এর অর্থ এটা নয় যে, অন্যত্র এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য মুসলমানরা তখন সম্পূর্ণ গাফিল ছিলেন। কারণ তাসাওউফের যাবতীয় মূলসূত্র পবিত্র কুরআন ও হাদীস ছাড়া আর কিছু নয়।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তিরা এ পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করেন না। তিনি বলেন, “আমাদের লবণ গায়েব হয়ে গেছে; আমাদের মধ্যে ভালো বলতে কী আর অবশিষ্ট আছে?” (নাসিম আর-রিয়াদ, ৩:৪৬০) উল্লেখ্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার সাহাবীদের তুলনা হলো খাদ্যের মধ্যে লবণের মতো। খাদ্য লবণ ছাড়া মোটেই ভালো নয়।” হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীস শরীফের অনুসরণেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, “আমরা হাসতে আছি, অথচ কে জানে, হয়তো আল্লাহ তা’আলা আমাদের কিছু আমলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং বলছেন, “আমি তোমাদের পক্ষ থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না।” হে আদম সন্তান! তোমার প্রতি ধিক্কার! তুমি কী কখনো আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া

করতে পারবে? কারণ যে কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে ঝগড়া করে। আল্লাহর শপথ! আমি ৭০ জন বদরী মহাত্মন সাহাবার সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তাঁদের অধিকাংশের পরনে ছিলো পশমী কাপড়ের জুব্বা। তুমি যদি তাঁদের দেখতে তাহলে বলতে, তাঁরা পাগল। কিন্তু তাঁরা যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটিকেও দেখতেন তাহলে বলতেন, "এই লোকগুলোর জন্য আখিরাতে কোনো হিস্সা থাকবে না!"। আর তোমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তিটিকে দেখলে তাঁরা বলতেন, "এই লোকগুলো কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না!"। আমি এমন মহাত্মনদের দেখেছি যাঁদের জন্য এই পৃথিবীর মূল্য তাঁদের চরণধূলি থেকেও কম ছিলো। আমি ঐসব ব্যক্তিকে দেখেছি যারা রাতে গৃহে প্রবেশ করে নিজের অল্প খাবার হাতে নিয়ে বলেছেন, আমি এই খাবারের সবটুকু পেটের ভেতর ঢুকাবো না। এ থেকে কিছুটা অবশ্যই আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে দান করবো। এরপর তিনি কিছুটা খাবার দান করে দিলেন, যদিও এর চাহিদা প্রাপ্ত ব্যক্তির তুলনায় নিজের অনেক বেশী ছিলো।" (হিলায়াতুল আওলিয়া, ২:১৩৪)

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন ইমাম আবু হামিদ গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইহ্ইয়া-উলূমিদ্দিন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মানুষের আত্মার মধ্যে দু'টি চিন্তা ঘোরাফেরা করে। এর একটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা থেকে আর অপরটি দুশমন থেকে উদ্ভুত। যে চিন্তাটি আল্লাহর কাছ থেকে আসে, যদি বান্দা তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম হয় তবে তিনি (আল্লাহ) এই বান্দার উপর স্বীয় রহমত নাজিল করেন। এই বান্দা দুশমন থেকে আগত চিন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই দু'টি শক্তিশালী চিন্তার প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'ঈমানদারের হৃদয় মহান দয়ালুর দু'টি অঙ্গুলির মধ্যখানে অবস্থান করে'। অঙ্গুলি অর্থ হৃদয়ের মধ্যস্থ উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা। মানুষ যদি রাগ ও চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে, শয়তানের প্রভাব তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং তার হৃদয় শয়তানের আস্তানা ও পাত্রে পরিণত হয়। শয়তানের খাদ্য হলো 'হাওয়া' বা জাগতিক আকর্ষণ। যদি মানুষ তার জাগতিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে এবং নফসকে তার দ্বারা প্রভাবিত হতে বিরত রাখতে সক্ষম হয় তাহলে, সে ফিরিশতাসূলভ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। তখন তার হৃদয় ফিরিশতাদের বিশ্রামাগারে পরিণত হবে। তাদের নূরে হৃদয়টা আলোকিত হয়ে ওঠবে।"

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনা থেকে আমরা হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাহাত্ম্যের প্রমাণ পাই। তিনি বলেন, "গাফিলতা ও আশা হলো আদম সন্তানের উপর দু'টি বিরাট নিয়ামত; এগুলো না থাকলে মুসলমানরা রাস্তায় চলতে অপারগ হতো।"

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

"কখনই নয়, তাঁর উভয় হস্ত প্রশস্তভাবে বিস্তারিত, এবং তিনি ইচ্ছামতো প্রদান করেন.." (৫:৬৪)

-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াত আল্লাহর দয়া ও মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আল্লাহর 'ক্বদম' (পা) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো 'ওরা, যাদেরকে তিনি পাঠিয়েছেন'। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দোযখের অগ্নি বার বার প্রশ্ন করতে থাকবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত মহান প্রভু তাঁর কুদরতি ক্বদম এতে রাখবেন। তখন দোযখ বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট! এবং এর সকল অংশ একত্রিত করবে। বেহেশতে তখনো অনেক স্থান বাকী থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক একটি নতুন সৃষ্টি শুরু করবেন যা তিনি বেহেশতের বাকী অংশে রাখবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির সুপারিশে রাবি'আ ও মুদার গোত্রের সমপরিমাণ মানুষকে আল্লাহ পাক বেহেশত দান করবেন"। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী বলেন, "এই ভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত ওয়ায়িস কারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি"। (আহমদ)

একবার উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পত্র লিখলেন: দীনার-দিরহামের প্রতি আপনার ভালোবাসা কিরূপ? তিনি জবাব দিলেন: 'আমি ওসব মোটেই ভালোবাসি না'।

আব্দুল আজিজ পুনরায় লিখলেন: আপনি শাসনভার গ্রহণ করুন। আপনি ন্যায়বিচার করতে পারবেন।

ইয়াযীদ ইবনে হাওশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি হাসান ও উমর ইবনে আব্দুল আজিজ অপেক্ষা চিন্তিত কাউকে দেখি নি। জাহান্নাম শুধু তাঁরা দু'জনের জন্যেই যেনো সৃষ্টি করা হয়েছে!

হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কারামত

১. পবিত্র হজ্জযাত্রায় একদল জ্ঞানী-গুণী মানুষ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাস্তার উপর একটি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে যেয়ে দেখা গেল পানির স্তর কূপের তলায়। আশেপাশে কোন দড়ি কিংবা বালতিও চোখে পড়লো না। তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিষয়টি অবগত করলেন। তিনি বললেন, আমি যখন নামাযে দাঁড়াবো তখন তোমরা সেই কূপের নিকট যাবে।

তিনি কিছুক্ষণ পর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্দেশ মুতাবিক তারাও কূপের নিকট গেলেন। কী আশ্চর্য! সবাই লক্ষ্য করলেন, কূপটি এখন কানায় কানায় পানিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং সবাই ইচ্ছেমতো পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলেন। একজন কিছু পানি তুলে একটি পাত্রে জমা রাখলেন- পরে পান করবেন এই বাসনা নিয়ে। কিন্তু দেখা গেলো পানির স্তর আবার নেমে নীচে চলে গেছে- ঠিক আগের মতো। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো না, তাই এমনটি হয়েছে।

২. কাফিলা পবিত্র বাইতুল্লাহর পথে চলছে। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাস্তা থেকে কিছু খেজুর সংগ্রহ করে অন্যান্য সদস্যদেরকে খেতে দিলেন। তাঁরা তা খেয়ে অবাক দৃষ্টিতে বীচিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এগুলো দেখতে যে ঠিক স্বর্ণের মতো লাগে! ঠিক তা-ই ছিলো। মক্কা শরীফ পৌঁছে স্বর্ণকারের দোকানে যেয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখলেন, এগুলো সত্যিই খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে।

কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা

১. একদিন এক কুকুর দেখে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ইয়া আল্লাহ! পরকালে আমি কি এই কুকুরটির সঙ্গে হাশর করতে পারবো? তাঁর এই কথাটি একজন পথচারী শ্রবণ করে প্রশ্ন করলো, হুজুর! কুকুরটি আপনার চেয়ে উত্তম না অধম?

তিনি জবাব দিলেন, রোজ কিয়ামতে যদি মুক্তি পাই তাহলে নিজেকে কুকুরটির তুলনায় উত্তম বলতে পারি। আর যদি না পাই, তাহলে বুঝতে হবে সে আমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম।

২. একদা তিনি তাঁর এক নিন্দুকের বাড়িতে বেশ কিছু খেজুর তুহফাস্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, দেখুন জনাব! আমি শোনেছি আপনি আপনার আমলনামা থেকে অনেক নেকী আমারটিতে স্থানান্তরিত করছেন। সুতরাং এই কাজের বিনিময় হিসাবে কিছু নিয়ে এসেছি পুরস্কার হিসাবে!

৩. একদিন তিনি এক নপুংসকের কাপড় ধরে টান দিলেন। লোকটি বললো, আমার গোপন রসহ্য এখনো বাইরে প্রকাশ পয় নি- আপনি কি তা প্রকাশ করতে চান?

৪. এক মাতাল মধ্যপানের নেশায় টলতে টলতে রাস্তা অতিক্রম করছিলো। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, আরে মিয়া! সাবধানে পা ফেলো- নইলে আছাড় খাবে! সে জবাব দিলো, আমি আছাড় খেলে কী-ই বা হবে! কারো কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনি সঠিকভাবে চলবেন- আপনার মতো এতো বড় সাধকের চলার পথে বেশকম হলে অসংখ্য মানুষের ক্ষতি হবে কারণ, তারা তো আপনাকে ইত্তিবা করে।

৫. মোমবাতি হাতে নিয়ে চলছে এক বালক। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আলো কোথা থেকে আনলে? সে এক ফুঁৎকারে বাতিটি নিভিয়ে দিয়ে বললো, আগে বলুন এখন এটা কোথায় গেল? এরপর বলবো, তা কোথায় থেকে এনেছি!

অমূল্য উপদেশ বাণী

হযরত হাসান বসরী মানুষের জন্য রেখে গেছেন অসংখ্য উপদেশ বাণী। আমরা বিভিন্ন কিতাব থেকে নিম্নে বর্ণিত বাণীগুলো অত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলাম। এগুলো পাঠ ও উপদেশ হিসাবে গ্রহণ করলে উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে হিদাআতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা’আলা।

১. কথা কম বলাই উত্তম। এক ব্যক্তি হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট এসে দীর্ঘক্ষণ কথা বললো। তিনি তাকে একটি ঘুষি মেরে বললেন: নিশ্চয় এর মধ্যে ফিতনা আছে।

২. ক্ষমার আশা ও রহমতের প্রত্যাশা একদল মানুষকে উদাসীন করে ফেলে। ফলে তারা কোনো নেক আমল ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তাদের কেউ বলতো: আমি মহান আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করি এবং মহান আল্লাহর রহমতের আশা করি। অথচ সে মিথ্যা বলেছে! যদি সে মহান আল্লাহ সম্বন্ধে ভালো ধারণা করতো, তাহলে অবশ্যই সে মহান আল্লাহর জন্য ভালো আমল করতো। আর যদি সে মহান আল্লাহর রাহমাতের আশা করতো, তাহলে অবশ্যই নেক আমলের মাধ্যমে সে তাঁর অন্বেষণ করতো। পাথেয় ও পানি ছাড়া বিজন মরু এলাকায় প্রবেশ করলে, ধ্বংস অনিবার্য।

৩. নিজের অন্তরের সঙ্গে মত বিনিময় করো। কারণ এগুলো দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমার নফসকে ঘৃণা করো- কেননা, তাকে চরম শোচনীয়ভাবে পাকড়াও করা হবে।

৪. মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, আলিম যখন দুনিয়াকে ভালোবাসবে তখন তার পরিণতি কী হবে? তিনি জবাব দিলেন: আত্মার মৃত্যু। তার দুনিয়া অন্বেষণ হবে আখিরাতের বিনিময়ে। সুতরাং তার থেকে ইলমের বরকত উঠে যাবে এবং তার নিকট ইলমের বাহ্যিক রূপটাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

৫. রোগ হলো দয়ালু বাদশাহর পক্ষ থেকে একটি বেত্রাঘাত। রুগ্ন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পর হয়তো দ্রুতগামী ঘোড়ায় পরিণত হবে, না হয় পদস্খলিত দংশিত গর্দভে পরিণত হবে।

৬. মানবতা ছাড়া দ্বীন হয় না।

৭. ক্রন্দন মানুষকে রাহমাতের দিকে নিয়ে যায়। কাজেই যদি পারো, জীবনটা ক্রন্দনের মধ্যে কেটে দাও।

৮. মুসলমানের লক্ষণ হলো: দ্বীনে শক্তিশালী হওয়া, কোমলতা প্রদর্শনে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া, ইয়াক্বীনের সঙ্গে ঈমান থাকা, বিদ্যায় প্রজ্ঞাবান হওয়া, কোমল আচরণে কঠিন হওয়া, হকের পথে দান করা, স্বচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অভাবে ধৈর্যধারণ করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনুগ্রহ করা, আনুগত্যের সাথে হিতকামনা করা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাকওয়া অবলম্বন করা এবং বিপদে পবিত্রতা ও ধৈর্য ধারণ করা। মু'মিনের লক্ষণ হলো: তার উদ্দীপনা তাকে ধ্বংস করে না, তার

জিহ্বা তাকে ছাড়িয়ে যায় না, তার চক্ষু তাকে অতিক্রম করে না, তার গোপনাঙ্গ তাকে পরাজিত করে না, তার প্রবৃত্তি তাকে আকৃষ্ট করে না, তার রসনা তাকে অপদস্থ করে না, তার লোভ তাকে হীন করে না এবং তার নিয়ত ছোট হয় না।

১০. বান্দা যদি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যথাযথ বিশ্বাস লালন করে, তাহলে অবশ্যই সে বিনীত, বিগলিত, দৃঢ়পদ, সরল-সোজা হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে।

১১. আমি বিশ্বাস দ্বারা জান্নাত অন্বেষণ করেছি, বিশ্বাস দ্বারা জাহান্নাম থেকে পলায়ন করেছি, বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণরূপে ফরযসমূহ আদায় করেছি এবং বিশ্বাস দ্বারা সত্যের উপর অবিচল থেকেছি।

১২. বিপদ আসলে বুঝা যায়, কে আল্লাহর দাস আর কে গাইরুল্লাহর দাস।

১৩. তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! পঁচন যেরূপ মানুষের দেহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গীবতও মু'মিনের দ্বীনের মধ্যে দ্রুত (ফিতনা) বিস্তার লাভ করে। তবে তিন শ্রেণির মানুষের গীবত হারাম নয়: প্রকাশ্য পাপকারী, অত্যাচারী শাসক ও বিদআতী।

১৪. কেউ যদি কোনো পাপ করার পর তওবা করে থাকে, আর অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে এই পাপের অপবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে এই অপবাদকারী ঐ পাপ স্বয়ং নিজে না করা পর্যন্ত মরবে না।

১৫. মানুষকে তার আমল দ্বারা যাচাই করো- মুখের কথা দ্বারা নয়।

১৬. যার পরিধেয় পাতলা, তার দ্বীনও পাতলা। যার দেহ (অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের দরুন) মোটা, দার দ্বীন হলো জীর্ণ। যার খাদ্য যতো সুস্বাদু তার উপার্জন ততো গন্ধময়।

১৭. মু'মিনের মূলধন হলো দ্বীন। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন আছে, ততক্ষণ তার পুঁজি আছে। চলার পথে দ্বীন কখনো মু'মিনের বিপক্ষে কাজ করে না।

১৮. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ - "এবং আরোও শপথ তিরস্কারকারী আত্মার!"- এই আয়াতে করীমের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: তুমি এমন মু'মিনের সাক্ষাৎ পাবে না, যে তার আত্মাকে তিরস্কার করে না। সে বলে, আমি তো এ কথা বলতে চাই নি, এ খাবার খেতে চাইনি কিংবা এ মজলিসে বসার ইচ্ছে করি নি। কিন্তু অবিশ্বাসীরা পা পা অগ্রসর হয় কিন্তু স্বীয় আত্মাকে তিরস্কার করে না।

১৯. তাওবার দ্বারা আল্লাহর দরবারে মানুষের মর্যাদা বাড়তে থাকে।

২০. বন্ধু-বান্ধবের জন্য কে কতটুকু খরচ করলো আর নিজের মা-বাবার জন্য কতটুকু খরচ করলো তার হিসাব আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখেন।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন: হাসান ইবনে আবুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একশত দশ হিজরী সনের রজব মাসে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে লোকে দেখলো তিনি মৃদু হাসছেন। এতে সবাই অবাক হলো কারণ তিনি জীবনে কোনদিন হাসেন নি। তিনি বার বার বলছিলেন, সে কোন্ পাপটি, কোন্ পাপটি?

মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে হাসি ও কোন্ পাপটি? এ প্রশ্নের রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে আমি শুনতে পেলাম কে যেনো প্রাণ সংহারকারী ফিরিশতাকে বলছে, একটু কষ্ট দিয়ে তার প্রাণ বের করো। তার একটি গুনাহ রয়েছে। এ কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম এ ভেবে যে, তাহলে আমার বাকী সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। একটি মাত্র বাকী আছে যা মৃত্যুর কষ্ট দ্বারা মুছে যাবে। এজন্যই আমি এভাবে হেসেছিলাম।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অসংখ্য মুরীদান এবং বেশ ক'জন খলীফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ক্বাদিরীয়া তরীকার শাজারায় হযরত শায়খ হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম আসে। সুতরাং এখন আমরা তাঁরই জীবনালোচনায় মনোনিবেশ করছি।

হযরত শায়খ হাবিব ইবনে মুহাম্মদ আজমী বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু: ১২০ হিজরি, সমাধি: বাগদাদ, ইরাক্ব।)

তাঁর জন্মস্থান ছিলো পারস্যে। তবে ইরাকের বসরা শহরে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদিস বর্ণনাকারী ও সুফি দরবেশ। স্বীয় শায়খ মহাত্মন হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ ও ইবনে সিরীন রাহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য হাদিস বিশারদদের থেকে তিনি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। প্রাথমিক জীবনে হযরত হাবিব আজমী ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুদের ব্যবসা করতেন। ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী এ রাস্তা থেকে বিলায়াতের উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হওয়ার এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী বিখ্যাত জীবনীকার হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুদখোর থেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা

সুদী ব্যবসার সাথে জড়িত হাবিব আজমী বসরা শহরের সর্বত্র স্বীয় মক্কেলদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতে প্রায় দিনই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর মক্কেলদের কেউ টাকা দিতে অপারগ হলে জুতো তৈরির চামড়া সংগ্রহ করতেন। একদিন তিনি তাঁরই নিকট থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণগ্রস্ত এক লোকের সাথে দেখা করতে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিলো ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করা। কিন্তু লোকটি বাড়িতে ছিলো না। তিনি ঋণগ্রহিতার স্ত্রীকে কড়া নির্দেশ দিলেন: "জুতার জন্য চামড়া দাও!"

মহিলা জবাব দিলেন: "আমার স্বামী বাড়িতে নেই। আমার নিকট দেবারও কিছু নেই। আমরা একটি বকরি জবাই করেছিলাম। একমাত্র মাথাটা আছে- আপনি পছন্দ করলে এটাই নিয়ে যান।"

হাবিব আজমী ভাবলেন, কী আর করা যায়? অন্তত এ মাথাটার চামড়া নিয়ে যাই। বললেন, "আপনি হাড়িতে আগুন দিন।"

মহিলা বললেন, "আমাদের না আছে রুটি আর না কেনো জ্বালানি কাষ্ঠ।"

তিনি বললেন: "ঠিক আছে। আমি বাইরে যাচ্ছি, নিয়ে আসছি জ্বালানি কাষ্ঠ ও রুটি।"

সুতরাং, হাবিব আজমী বেরিয়ে গেলেন। রুটি ও জ্বালানি কাষ্ঠ নিয়ে আসলেন। মহিলা উনুনে হাড়ি বসাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রান্না প্রস্তুত হওয়ার পরই কিন্তু এক ফকির এসে দরোজার কড়া নাড়লো।
হাবিব দরোজা খুলে ফকিরকে ধমক দিয়ে বললেন, “এ মিয়া! আমাদের নিকট থেকে কিছু তোমাকে দিলে, তুমি তো আর ধনী হবে না- অথচ আমরা কিছুটা গরীব হবো ঠিকই! যাও এখান থেকে!”

ফকির হতাশ হয়ে মহিলাকে আবদার জানালো, “আমার পাত্রে কিছুটা খাবার দিন, মা!”
মহিলা তার হাড়ির ঢাকনা উঠালেন। ইয়া আল্লাহ! একী? হাড়ির ভেতর যে শুধুমাত্র কালো রক্ত! তিনি দরোজার নিকট ছুটে গেলেন। হাবিবকে টেনে হাড়ির কাছে নিয়ে আসলেন। বললেন: “দেখো, দেখো! তোমার অভিশপ্ত সুদী কারবার ও ফকিরের প্রতি দুর্ব্যবহার হেতু আমাদের কী সর্বনাশ হয়েছে!” মহিলা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, “হায়, হায়! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে গেলো!”

ঘটনার আকস্মিকতায় হাবিব আজমীর অন্তরে প্রচণ্ড ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। এর প্রভাব থেকে তিরি আর মুক্ত হতে পারলেন না। মহিলাকে বললেন, “হে নারী! আমি যা করেছি তার জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করলাম।” একথা বলে মহিলার ঘর থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন। তিনি কিন্তু তখনও সুদী ব্যবসার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হন নি।

পরদিন পুনরায় তিনি মক্কেলের খুঁজে বের হলেন। সেদিন ছিলো পবিত্র জুমুআ বার। বসরার রাস্তায় শিশু-কিশোররা খেলাধূলা করছিলো। হাবিবকে দেখেই তারা চিৎকার দিলো: “এই তো আসছে সুদখোর হাবিব! দৌড়ে পালাও। তার পদধূলি আমাদের গায়ে লাগলে সবাই তার মতো পাপী হবো!”

বাচ্চাদের তিরস্কার হাবিবকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতবিক্ষত করলো। তিনি সামনেই স্থাপিত একটি বড়ো কক্ষে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, অনেক লোক এক বুজুর্গের বয়ান শ্রবণ করছেন। কিছুক্ষণ বয়ান শুনার পর হঠাৎ তার মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বয়ানকারী বুজুর্গ ছিলেন বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি স্বীয়

কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করলেন। এদিকে হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর নজরে পড়লো হাবিব আজমীকে। এগিয়ে এসে তাঁকে হাতে ধরে ওঠালেন। সান্ত্বনা দান করলেন। মুবারক এ সাক্ষাতের পর বাড়িতে ফেরার পথে পথিমধ্যে একজন সুদ গ্রহিতা ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখেই সে ছুটে পালালো। হাবিব লোকটিকে ডাক দিলেন: “থামো! তোমাকে আর আমার কাছ থেকে ছুটে পালানোর প্রয়োজন নেই। এখন সময় এসেছে আমাকে তোমার নিকট থেকে ছুটে পালানোর!”

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন, সে-ই শিশু-কিশোররা তখনও খেলাধূলা করছিলো। তারা আগের মতো চিৎকার দিলো: “এই তো আসছে সুদখোর হাবিব! পালাও, পালাও! আমাদের পদধূলি তার গায়ে লাগলে আমাদের গুনাহ কেটে যাবে।”

হাবিব আজমী রাহিমহুল্লাহ একথা শুনে বলতে লাগলেন: “হে আমার প্রভু! যেদিন আমি আপনার সকাশে তাওবাহ করতে সক্ষম হলাম, সেদিনই আপনি মানুষের হৃদয়ে বুলন্দ করলে আমার সম্পর্কিত আওয়াজ আমারই উপকারার্থে।” এরপর তিনি বসরা শহরের সর্বত্র ঘোষণা দিলেন: “যে কেউ হাবিবের নিকট থেকে কিছু নিতে ইচ্ছুক, এসো! নিয়ে যাও!”

শহরের মানুষ তাঁর কাছে এসে জড়োত হলো। তিনি টাকা-কড়ি যা-ই তাঁর নিকট রক্ষিত ছিলো সবকিছু বিলিয়ে দিলেন। সুদী কারবারী হাবিব আজমী এভাবে নিঃস্ব ফকিরে রূপান্তর হলেন। এরপর একব্যক্তি এসে বললো, আপনি আমার নিকট থেকে অনেক অর্থকড়ি সুদ হিসেবে নিয়েছেন। এবার এসব ফিরিয়ে দিন। হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর নিকট দেবার মতো কিছুই ছিলো না। স্বীয় স্ত্রীর একখানা দামি চাদর ছিলো। তিনি সেটি দাবীদার লোকটিকে দিলেন। আরেক দাবীদার আসলো। তাকে দিলেন নিজের পরনের জুব্বা। এবার তিনি কোনো মতে ছতর রক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর ছুটে গেলেন ফুরাত নদীর তীরে। আল্লাহর ইবাদত ও রিয়াজত-মুরাক্বাবায় নিজেকে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট বাইআত গ্রহণ করে তাঁর সুহবতে সময় কাটাতে থাকেন।

আজমী পরিচিতি

হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট কুরআনের দারস নিতে যেয়ে তিনি বেশ সমস্যায় পড়েন। অনারব হিসেবে তিলাওয়াত সহীহ হতে বেশ বেগ পেতে হয়। পরবর্তীতে এ কারণেই তিনি 'আজমী' বা অনারব হিসেবে পরিচিত হন।

গায়েবি খাবার

দিন চলতে থাকে। হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন হিসেবে জীবন কাটাতে থাকেন। ভীষণ অভাব-অনটন হেতু জরুরী খাবার-দাবর ও রসদপত্রের জোগান হচ্ছিলো না তাঁর পরিবারে। তাঁর স্ত্রী এসব জোগাড় করে দিতে বার বার তাঁকে আবদার জানাচ্ছিলেন। একদিন তিনি ভোরে ওঠে চলে গেলেন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায়। বেশ গভীর রাতে বাড়িতে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসলেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে? কাজ করে কিছু আয় করেছো? কিছু নিয়ে এসেছো?"
হাবিব আজমী জবাব দিলেন: "আমি যার কাজ করেছি, তিনি খুব দয়ালু। আমি বিনিময়ে তাঁর নিকট কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করি। সঠিক সময় উপস্থিত হলে তিনি প্রতিদান দেবেন। কারণ তিনি বলেছেন, "প্রতি ১০ দিন পর পর আমি বেতন দিই।"

বাস্তবে হাবিব আজমী খানক্বায় যেয়ে ইবাদতে মশগুল হতেন। তিনি কারো কাজ করতেন না। এভাবে দশদিন ইবাদত করলেন। ঐদিন যুহরের নামাজ শেষে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আজ তো দশদিন পূর্ণ হয়েছে। আমি কী নিয়ে বাড়িতে যাবো? স্ত্রীকেই বা কী বলবো? তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলেন।

কী আশ্চর্য! তাঁর অজান্তেই একব্যক্তি বাড়ির দরোজায় এসে হাজির হলেন। নিয়ে এসেছেন গাধার পিঠে করে কয়েক ব্যাগভর্তি আটা। আরেকজন নিয়ে আসলেন একটি দুম্বা এবং অপর আরেক ব্যক্তি আনলেন তৈল, মধু, মসলাপাতি ইত্যাদি। এসব বস্তু তাঁর ঘরের দরোজার সামনে রেখে সবাই প্রস্থান করলো। এরপর খুব সুদর্শন এক যুবক তিনশত রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘরের দরোজার কড়া নাড়লেন। হাবিব আজমীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? কেনো এসেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "মালিক এসব বস্তু পাঠিয়েছেন। আপনি আপনার স্বামীকে বলবেন, 'তুমি তোমার কর্ম [নেক-আমল] বাড়াতে থাকো, আমরা তোমার বেতন

বাড়িয়ে দেবো।'" একথা বলেই রৌপ্যমুদ্রা হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে যুবক প্রস্থান করলেন।

এদিকে রাত গভীর হয়ে আসলে হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। ভাবতে থাকেন, স্বীয় স্ত্রীর নিকট যেয়ে কী জবাব দেবেন? তিনি তো কিছুই নিয়ে আসেন নি। অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে বাড়ির নিকটে আসলেন।

একী! সুস্বাদু তাজা রুটি ও শুরবার ঘ্রাণ! তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে ছুটে আসলেন। পরনের কাপড়ের আঁচল দিয়ে স্বামীর মুখখানা মুছে দিলেন। নিজের স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র যে একেবারে উল্টে গেছে! এতো হাসিখুশি উজ্জ্বল চেহারায় তাকে তিনি কখনো দেখেন নি। কী ব্যাপার? হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ অবাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে বললেন, "প্রিয় স্বামী! আপনি যে ব্যক্তির জন্য কাজ করছেন তিনি খুবই ভালো লোক। তিনি দয়ালু ও অতীব মেহেরবান এবং উদার। এই দেখো না, তিনি কতো জিনিস পাঠিয়েছেন! একজন সুদর্শন যুবক এসে এসব দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, 'হাবিব যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁকে বলো, তোমার কাজের মাত্রা বাড়াও- আর আমি এর বিনিময় আরো বাড়িয়ে দেবো।'"

স্ত্রীর কথাগুলো শুনে হাবিব আজমীর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিভুত হয়ে পড়লেন। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, "আমার প্রিয়তমা স্ত্রী! দশ দিনের কাজের বিনিময়ে তিনি এতো কিছু পাঠিয়েছেন। এতো দয়ালু তিনি! আমি যদি আরো বেশি করে কাজ করি তাহলে- কে জানে, তিনি বিনিময়ে আরো কতো কিছু দেবেন।"

এদিন থেকে হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ জাগতিক সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন।

কারামত

১. একদা এক বৃদ্ধা হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর নিকট এসে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "হযরত! আমার একমাত্র পুত্র দীর্ঘদিন যাবৎ আমাকে একা রেখে কোথায় চলে গেছে। আমি তাকে ছাড়া আর বেঁচে থাকতে পারবো না।

দয়াকরে দুআ করুন আল্লাহর দরবারে। তাকে আমি দেখতে চাই। দয়া করুন। আপনার দুআর বদলৌতে আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমার জাদুকে বুকের মধ্যে আবার তুলে দেবেন।"

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কোনো টাকা আছে?"

"হাঁ, দুটি দিরহাম আছে", বৃদ্ধা জবাবে বললেন।

"ওগুলো গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দাও।"

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ এরপর দুআ করলেন। তারপর বৃদ্ধাকে বললেন, "ফিরে যাও! তোমার আদরের দুলাল তোমার নিকট ফিরে এসেছে!"

বৃদ্ধা বাড়িতে পৌঁছার পূর্বেই নিজের সন্তানকে দেখতে পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, "এই তো আমার আদরের দুলাল! এই তো আমার প্রিয় পুত্র!" তিনি ছেলেকে নিয়ে ছুটে আসলেন হযরত হাবিব আজমীর দরবারে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, "এতো দিন কোথায় ছিলে বাবা?" জবাবে সে এক আশ্চর্য বর্ণনা দিলো।

ছেলে বললো, "আমি দীর্ঘদিন যাবৎ কিমান শহরে বাস করছিলাম। আমি সেখানে একটি মাদরাসায় পড়াশুনায় ছিলাম। আজ আমার উস্তাদ নির্দেশ দিলেন, বাজার থেকে কিছু মাংস ক্রয় করে নিয়ে আসতে। মাংস ক্রয় করে যখন আমি ফিরতি যাত্রা করি তখন হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস এসে আমাকে আকড়ে ধরে। আমি একটি গায়েবি আওয়াজ শুনলাম, "হে বাতাস! একে তার বাড়িয়ে নিয়ে চলো! হাবিবের দুআর বরকতে ও দুটি দিরহামের বিনিময়ে সে তার মায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে।" এরপরই দেখতে পেলাম আমি বাড়ির পাশে আমার মায়ের নিকট এসে গেছি।"

২. পবিত্র হজ্জের মওসুম। বসরার লোকজন জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ হযরত হাবিব আজমীকে শহরের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পেলেন। পরদিন ছিলো ইয়াওমুল আরাফাহ। সেখানে অবস্থানকারী বসরার হজ্জযাত্রীরা দেখলো তিনিও ইহরাম পরে আরাফার ময়দানে উপস্থিত আছেন।

৩. একদা বসরা শহরের লোকজন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লো। খাদ্যাভাবে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটলো। হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ ধনীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে অভাবী লোকদেরকে খাবার ক্রয় করে দিলেন। ঋণদাতারা যখন তাঁর নিকট এসে টাকা চাইলো, তিনি নিজের বিছানার নীচে থাকা টাকার থলে থেকে মুদ্রা বের করতে লাগলেন ও ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। এই দিরহামগুলো কোত্থেকে আসলো তা কেউই বুঝতে পারলো না।

৪. হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িটি বসরা শহরের দুটি রাস্তার সংলগ্নে ছিলো। তিনি গরম ও ঠাণ্ডা মওসুমে একটি পশুর চামড়ার তৈরি জুব্বা পরতেন। একদিন তিনি অযু করতে যেয়ে জুব্বাটি খুলে রাস্তার মধ্যে রাখলেন। ঘটনাক্রমে হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ এ রাস্তা দিয়েই আসছিলেন। জুব্বাটি রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে দেখে এটির নিকট যেয়ে মন্তব্য করলেন: "কোথাকার আজমী! সে এই জুব্বার মূল্য বুঝে না। এ জুব্বা এখানে থাকা উচিৎ নয়- এটি হারিয়ে যেতে পারে।" একথা বলে তিনি জুব্বাটি পাহারা দিতে লাগলেন। এদিকে হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ অযু সেরে এসে জুব্বার নিকট স্বীয় মুর্শিদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে যেয়ে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম হে ইমামুল মুসলিমীন! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?"
হযরত বসরী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তুমি কী জানো না, এ জুব্বাটি এখানে থাকা উচিৎ নয়? এটা হারিয়ে যেতে পারে। বলো, কার নিকট এটি রেখে গিয়েছিলে?"
হাবিব রাহিমাহুল্লাহ জবাবে বললেন, "তাঁর নিকট রেখে গিয়েছিলাম, যিনি এটি দেখভালের দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছেন!"

৫. একদিন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িতে বেড়াতে আসলেন। হাবিব রাহিমাহুল্লাহ খাবার হিসেবে হযরতের সম্মুখে দুটি রুটি ও সামান্য লবণ এনে দিলেন। হাসান রাহিমাহুল্লাহ খাওয়া শুরু করলেন। ইতোমধ্যে একজন ফকির এসে দরোজার কড়া নাড়লো। হাবিব আজমী মেহমানের সম্মুখ থেকে খাবারের থালাটি তুলে ফকিরের সামনে দিয়ে দিলেন! হযরত বসরী বললেন, "তুমি একজন ভালো লোক। আহ! যদি তোমার কিছুটা জ্ঞান থাকতো। তুমি তোমার মেহমানের সামন থেকে রুটি তুলে নিয়ে ফকিরকে দিয়ে দিলে। উচিৎ ছিলো, এক অংশ ফকিরকে দেবে ও অপর অংশ মেহানের সামনে রাখবে।"

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ কিছুই বললেন না। এরপর একজন খাদিম বড়ো একটি থালা ভর্তি খাবার নিয়ে উভয়ের সামনে হাজির হলো। থালার মধ্যে একটি আস্ত বকরির ভুনা মাংস ছিলো। আরো ছিলো মিষ্টি ভাত, উত্তম রুটি ও পাঁচ শত দিরহাম। খাদিম থালাটি হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর সামনে রেখে চলে গেলো। তিনি দিরহামগুলো গরীবদের জন্য রেখে দিলেন। খাবারটুকু স্বীয় মুর্শিদ হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সামনে রেখে বললেন, "অনুগ্রহপূর্বক আপ্যায়ন করুন ইয়া শাইখী!" হাসান রাহিমাহুল্লাহ কিছুটা খাওয়ার পর হাবিব রাহিমাহুল্লাহ পুনরায় বললেন, "ইয়া শাইখী! আপনি একজন উত্তম ব্যক্তি। তবে যদি আরো কিছু ভরসা রাখতেন, তাহলে ভালো হতো। জ্ঞানের সঙ্গে ভরসা রাখাও জরুরি!"[১০]

৬. কেনো একদিন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সৈন্যরা হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সন্ধানে ছুটোছুটি করছিলো। হাসান রাহিমাহুল্লাহ তখন হাবিব আজমীর খানক্বায় লুকিয়ে ছিলেন।
সৈন্যরা হাবিব রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, "আপনি কী আজ হাসানকে দেখেছেন?"
তিনি জবাব দিলান, "আমি তাঁকে দেখেছি।"
"তিনি কোথায়?"
"এই খানক্বায়।"

সৈন্যরা খানক্বায় প্রবেশ করলো। তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলো। হাসান বসরীকে কোথাও পেলো না। পরবর্তীতে হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা সাত বার আমার উপর হাত রেখেছে কিন্তু আমাকে দেখতে পায় নি!

সৈন্যরা প্রস্থান করার পর হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "হে হাবিব! তুমি তোমার মুর্শিদের হক্ব আদায় করো নি। তুমি আমার দিকে তাদেরকে লেলিয়ে দিলে!"
হাবিব আজমী বললেন, "হে আমার শায়খ! আপনি যে এখানে লুকিয়ে আছেন সে সত্যটা আমি ব্যক্ত করেছি মাত্র। মিথ্যা বললে আমরা উভয়েই তাদের হাতে আটক হতাম।"

---

[১০] এখানে কোনো ভুলবুঝাবুঝির সুযোগ নেই। হযরত হাসান বসরী ও তাঁর খলিফা হযরত হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মধ্যকার এসব ঘটনাবলী দ্বারা কারো মর্যাদা অপরের তুলনায় বেশি- সেটা ভাবা সঠিক হবে না। বাস্তবে উভয় ওলির বরকতেই এসব কারামতের ঘটনা ঘটেছিল। -গ্রন্থকার।

হাসান রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "তারা যখন আমাকে খোঁজছিলো তুমি তখন কী পাঠ করছিলে?"
হাবিব রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "প্রথমে আমি আয়াতুল কুরসি দশ বার পাঠ করেছি। এরপর দরুদ শরীফ দশ বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- দশ বার পাঠ করার পর দুআ করলাম: 'হে আল্লাহ! আমি আমার শায়খকে আপনার নিকট সোপর্দ করলাম। তাঁকে আপনিই নিরাপদ রাখুন।'"

৭. হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ কোনো এক জায়গায় যেতে ইচ্ছে করলেন। তিনি প্রথমে তুরাগ নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। এখানে দাঁড়িয়ে কী একটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। একটু পরই সেখানে এসে হাজির হলেন হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে ইমাম! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেনো?"
হাসান রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি একটি জায়গায় যেতে চাচ্ছিলাম। নৌকা আসতে দেরি হচ্ছে।"
হাবিব আজমী বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "ইয়া শাইখী! আপনি কী বলছেন? আমি তো আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। তোমার হৃদয় থেকে অন্য সকল মানুষের হিংসা মুছে দাও, গাইরুল্লাহর কাছ থেকে নিজের হৃদয়কে দূরে রাখো। জেনে রাখো, ক্লেশ-কষ্ট একটি মূল্যবান নিয়ামত। সবকিছু হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ। এরপর পানির ওপর পা রেখে হাঁটতে থাকো!" এ কথাগুলো বলে হাবিব আজমী নদীর পানিতে পা রেখে হেঁটে চলে গেলেন। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকা হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফেরার পর লোকজন এসে জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া ইমামুল মুসলিমীন! আপনার কী হয়েছিলো?"
তিনি জবাব দিলেন, "আমার শাগরিদ হাবিব এইমাত্র আমাকে তিরস্কার করলো! এরপর পানিতে পা রেখে চলে গেলো। এদিকে আমি চেতনহীন অবস্থায় এখানেই রয়ে গেলাম। যদি আগামীকাল আমাকে বলা হয়, অগ্নির উপর দিয়ে হেঁটে যাও এবং আমি এভাবে অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি- তখন আমার কী হবে?"

পরবর্তীতে হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ শীর্ষস্থানীয় মুরিদকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে হাবিব! তুমি কীভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী হলে?"

"এর কারণ হচ্ছে আমি আমার হৃদয়কে সাদা বানিয়েছি। আর আপনি বানিয়েছেন ভীষণ কালো।"
হযরত হাসান রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, "আমার শিক্ষা অপরকে উপকৃত করলো আর আমি রয়ে গেলাম বঞ্চিত!"

ইন্তিকাল

সবাই একদিন যেতে হবে অন্ধকার সেই মাটির ঘরে। দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান সকল মানুষের জন্য। ঠিক যেমন একজন মুসাফির কোথাও যেয়ে কিছুদিন অবস্থান করে পুনরায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন, আমাদের সবার ক্ষেত্রে তা-ই মহাসত্য। আমাদের মূল চিরন্তন বাসস্থান আখিরাতে অবস্থিত। যেখান থেকে আসা সেখানেই ফের যাত্রা। ক্বাদিরীয়া ও চিশতিয়া সুফি তরিকার বিখ্যাত ওলি, হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট খলিফা ও তাবিঈ হযরত হাবিব ইবনে মুহাম্মদ আজমী রায়ী বসরী রাহিমাহুল্লাহ ১২০ হিজরি সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বাগদাদেই সমাহিত আছেন।

ক্বাদিরীয়া শাজারাহ মুবারক অনুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন মহাত্মন শায়খ দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো, ইসশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফিক ইনায়েত করুন।

হযরত শায়খ দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১৬০ থেকে ১৬৫ হিজরির মধ্যে, সমাধি- কুফা, ইরাক।)

তাঁর পূর্ণ নাম আবু সুলাইমান দাউদ ইবনে নোসাইর তায়ী কুফী রাহিমাহুল্লাহ। তবে তিনি দাউদ তায়ী নামেই বেশি পরিচিত। ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা [৮০-১৫০ হিজরি] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ছিলেন। সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমানোর জন্য কামিল মুর্শিদের প্রয়োজন একান্ত জরুরী। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন তাবিঈ হযরত হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণ

আগেই বলেছি, দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর তিনি ইমাম সাহেবের নিকট থেকে শরীয়তের ওপর উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন। এ দুটি দশকেই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে 'হানাফি ফিকাহ' শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ ইমামে আজমের অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন ছিলেন। তবে শুধুমাত্র শরয়ী বাহ্যিক জ্ঞান দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন ও সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে সর্বদাই উদগ্রীব থাকতেন। একাকী থাকাকে তিনি পছন্দ করতেন। আল্লাহর জিকির-ফিকিরে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন।

এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি একদা একজন ক্রন্দনরত বৃদ্ধার কণ্ঠে নিম্নোল্লিখিত দুটি পংক্তি শুনতে পেলেন।

তোমার কোন্ কপোলটিতে ক্ষয়ের চিহ্ন দৃশ্যমান হয়েছে,
এবং কোন্ চোখটিতে অশ্রু এসে কপোল বেয়ে ঝরে পড়ছে?[১১]

---

[১১] এ পংক্তি দুটি তাযকিরাতুল আউলিয়ার লেখক শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, পংক্তি দুটি ছিলো: [বঙ্গানুবাদ] "এমন কোনো মুখশ্রী আছে কী- যা ধূলায় পরিণত হয় নি? / এমন কোনো চোখ আছে কী- যার মধ্য থেকে অশ্রু গড়িয়ে মৃত্তিকায় পড়ে নি?"

আহ! কী করুণ আর্তনাদ, ভাবলেন দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ। পংক্তি দুটি তাঁর হৃদয়ে নাড়া জাগালো। ক্ষণকালের জন্য তিনি অপ্রকিতিস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি ছুটে গেলেন স্বীয় উস্তাদ ইমামে আজমের নিকট।

অবস্থাদৃষ্টে ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে, তোমার কী হয়েছে?" দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ সব খুলে বললেন। তিনি আরো বললেন, "ইমাম সাহেব! পৃথিবীর আকর্ষণ আমার মধ্য থেকে বিদায় হয়ে গেছে। আমার ভেতরে কী যে একটা পরিবর্তন এসে গেছে, যার বর্ণনা দিতে আমি অপারগ। আমি এর ব্যাখ্যা কোনো শরয়ী কিতাব বা আইন-কানুনেও খুঁজে পাচ্ছি না।"

হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে উপদেশ দিলেন: "তুমি মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকো। খিলওয়াত অবলম্বন করো।"

সুতরাং হযরত দাউদ তায়ী সেদিন থেকেই মানুষের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে নিজের বাড়ির একটি কক্ষে অবস্থান করতে থাকেন। বেশ কিছুদিন পর ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে দেখতে যান। তিনি দাউদ তায়ীকে বললেন, "আরে, নিজের ঘরে এভাবে নিরবে বসে থাকলে তোমার সমস্যা দূর হবে না। তোমাকে বরং উচিৎ হবে ইমামদের মজলিসে যেয়ে নিরবে তাঁদের দারস শ্রবণ করা। এতে তুমি তাঁরা যা বলছেন তার নিগূঢ় মর্ম তাঁদের থেকেও বেশি বুঝতে সক্ষম হবে।"

ইমাম সাহেবের উপদেশ মুতাবিক বেশ কিছুদিন ইমামদের দারসে তিনি যোগ দিলেন। নিরবে কথাগুলো শুনতেন। এক বছরের মধ্যে একবারও একটি শব্দ উচ্চারণ করেন নি। অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে বোবা হয়ে গেছেন ভাবতো। বছর শেষে তিনি মন্তব্য করলেন, "এই একটি বছরে যা শিখেছি, ত্রিশ বছরেও তা শিখতে পারতাম না।" এরপর তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে তরিকতের মুর্শিদ হযরত হাবিব আজমী রায়ী বসরী রাহিমাহুল্লাহর সাথে। হযরত তাঁকে মুরিদ করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আত্মশুদ্ধির এ রাস্তায় অসীম সাহসসহ পদার্পণ করলেন।

একদিন অনেক বই নিজের কাঁধে তুলে ফুরাত নদীর তীরে গেলেন। ছুড়ে মারলেন সবগুলো গ্রন্থ নদীর পানিতে। এরপর খিলওয়াত [নির্জনবাস] পালনে নিজেকে

আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কারো ধারে-কাছেই যেতেন না। শুধু ইবাদত-বন্দেগি-রিয়াজত-মুরাক্বাবা-মুশাহাদার মধ্যে দিনরাত নিমগ্ন থাকতেন।[১২]

কথিত আছে, হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ উত্তরাধিকার সূত্রে ২০টি দীনারের মালিক হন। দীর্ঘ বিশ বছরে এ মুদ্রাগুলো দিয়েই তিনি কালাতিপাত করেন। তাঁর কোনো কোনো পীর ভাই এতে আপত্তি জানালে বলতেন: "এই [সুলুকের] রাস্তার দাবি হচ্ছে অপরকে দান করা আর নিজের জন্য কিছুই না রাখা। আমি এই বিশ দীনারও রাখতাম না- শুধুমাত্র মনকে লালসা থেকে মুক্ত রাখতে এগুলো রেখেছি। আমি এগুলো রেখে রেখেই এ ধরা থেকে বিদেয় হয়ে যাবো।"

তাঁর ফকরের অবস্থা এমন ছিলো যে, সময় সময় শুকনো রুটি পানির মধ্যে ভিজিয়ে শুধু চুষতেন মাত্র। বলতেন, "রুটি ভক্ষণ করার জন্য যেটুকু সময় অতিবাহিত হয়, তার মধ্যে আমি পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারি। আমি কেনো রুটি খেতে খেতে আমার জীবনের মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করে দেবো?"

হযরত আবু বকর আয়াশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি দাউদের খানক্বায় গেলাম। দেখতে পেলাম তাঁর হাতে এক টুকরো শুকনো রুটি। তিনি কাঁদছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে দাউদ! কী হয়েছে, কাঁদছো কেনো?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমি এ রুটির টুকরোটি খেতে চাচ্ছি, কিন্তু জানি না- এটি হালাল না হারাম।'"

অপর এক বর্ণনায় হযরত আয়াশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি একদা দাউদকে দেখতে গেলাম। লক্ষ করলাম একটি পানিভর্তি জগ রৌদ্রের মধ্যে রাখা আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জগটি ছায়ায় রাখলে ভালো হয় না?' তিনি জবাব দিলেন, 'দেখো, এটি আগে ছায়ার মধ্যেই ছিলো- এখন সূর্য কিছুটা হেলে যাওয়ার ফলে রৌদ্রে পড়েছে। আমি মহাপ্রভুর সম্মুখে এতোই লজ্জাবোধ করছি যে, তাঁর হুকুমে যে জগটি ছায়া থেকে রৌদ্রে গিয়েছে, সেটি পুনরায় স্বেচ্ছায় ছায়ায় নিয়ে আসি কীভাবে!'"

---

[১২] মনে রাখা জরুরি যে, উত্তম গ্রন্থাদি বিনা কারণে পানিতে ফেলে দেওয়া বা অন্যভাবে ধ্বংস করা বৈধ কাজ নয়। হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ সম্ভবত পুরাতন পাঠযোগ্যহীন বইপত্র নদীর পানিতে ফেলে দিয়েছিলেন। অবশ্যই তরিকতের রাস্তার ভ্রমণে যে, বই-পুস্তকের জ্ঞান যথেষ্ট নয়- এটা যে একটি আধ্যাত্মিক ভ্রমণ, সে কারণেই হয়তো নিজের নফসকে কঠিন সাধনার পথে প্রস্তুত করতে যেয়ে তিনি এ কাজটি করেছিলেন। তবে সবকিছুর সঠিক জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। -গ্রন্থকার।

বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা

১. হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িটি প্রাসাদতুল্য ছিলো। এতে ছিলো অনেকগুলো আলাদা কক্ষ। তিনি যে কক্ষে থাকতেন সেটি নষ্ট হয়ে থাকার অযোগ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্যটিতে যেতেন না। এভাবে একটার পর আরেকটায় যেয়ে থাকতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনি কেনো নষ্ট হয়ে যাওয়া কক্ষগুলো মেরামত করেন না?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি যে, এ দুনিয়ার কিছুই মেরামত করবো না।" দীর্ঘদিন পরে তাঁর পুরো প্রাসাদই ধ্বসে পড়লো। বাকি থাকলো শুধুমাত্র প্রবেশ দ্বারটি। যেদিন হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেলেন সেদিনই ঐ দরোজাটিও ধ্বসে পড়ে।

একজন মেহমান তাঁর থাকার কক্ষে ঢুকে দেখলেন, ছাদটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বললেন, "হে দাউদ! আপনার কক্ষের ছাদটি যে কোনো সময় ধ্বসে পড়বে।" তিনি বললেন, "গত বিশ বছর যাবৎ আমি একবারও আমার কক্ষের ছাদের দিকে তাকাই নি!"

২. কেউ একজন হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, "আপনি কেনো বিবাহ করছেন না?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমি একজন ঈমানদার মহিলার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই না।"

প্রশ্নকারী বললেন, "তা কীভাবে হয়?"

তিনি বললেন, "আমি যদি কোনো মহিলাকে বিয়ে করি তাহলে তার ভরপোষণের দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হবে। সুতরাং বিয়ে করলে পরে, যেহেতু আমি যেভাবে চাই সেরূপ ইবাতদ-বন্দেগী-জিকির-মুরাক্বাবা করতে পারবো না- তাই বিয়ে না করাই আমার জন্য শ্রেয়। একই সময় উভয় দায়িত্ব পালন করার ভান মূলত মহিলার প্রতি প্রতারণার সামিল।"

লোকটি এবার বললেন, "তাহলে, অন্তত নিজের দাড়িগুলো সময় সময় চিরুনি দ্বারা আঁচড়াবেন!"

দাউদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "হু, এজন্য তো অবসর সময়ের প্রয়োজন। তাতো আমার হাতে নেই!"

৩. জ্যোৎস্নায় আলোকিত এক রাতে হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ বাড়ির ছাদে ওঠে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। মহাপ্রভুর সৃষ্টিলীলার ধ্যান তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠলো। গভীর মুরাক্বাবা অবস্থার মধ্যে তাঁর দুটো চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। তিনি আল্লাহর মুশাহাদার মধ্যে এতোই ডুবে গেলেন যে, এক সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পাশের বাড়ির ছাদে পড়ে গেলেন। ঐ ছাদটি ছিলো তাঁর ছাদের কিছুটা নিচে। আওয়াজ শুনে হযরতের পড়শি ঘুম থেকে উঠলেন। ভাবলেন, তার ছাদে বুঝি চোর ওঠেছে! উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে গেলেন ছাদে। কিন্তু ছাদে যেয়ে দাউদ রাহিমাহুল্লাহকে দেখে তিনি হাত ধরে দাঁড় করালেন। বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে দাউদ! তোমাকে কে এখানে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো?" দাউদ রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি জানি না, জানি না। আমি আমার মধ্যে ছিলাম না- আমি কিছুই জানি না।"

৪. একদিন দেখা গেলো হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ নামাযে যেতে দৌড়াচ্ছেন। কেউ একজন জানতে চাইলো, "কী হে দাউদ! কী হয়েছে? এতো তাড়াহুড়ো কিসের?"
তিনি জবাব দিলেন, "শহরের তোরণে একদল সৈন্য আমাকে ধরে নিতে অপেক্ষা করছে!
লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ সৈন্যদল?"
তিনি বললেন, "এরা হচ্ছে কবরস্থানের লোকজন!"

৫. তখন বাগদাদের মসনদে বাদশাহ হারুন-অর-রশীদ [৭৬৬-৮০৯ ঈ / ১৪৮-১৯৩ হিজরি, শাসনকাল: ৭৮৬-৮০৯ ঈসায়ী]। ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত শিষ্য ইমাম ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আনসারী আবু ইউসুফ [১১৩/১১৭-১৮১ হিজরি] রাহিমাহুল্লাহ কাজি হিসেবে কর্মরত। বাদশাহ একদিন কাজি সাহেবকে বললেন, "চলুন, আমরা দাউদ তায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।"

হযরতের বাড়ির প্রবেশদ্বারে উভয় ব্যক্তি আগমনের পর প্রথমে ইমাম ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ভেতর-বাড়ি গেলেন। যে কক্ষে হযরত দাউদ রাহিমাহুল্লাহ থাকতেন সে কক্ষের দরোজার কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে জবাব আসলো, এখানে কারোর প্রবেশের অনুমতি নেই। ইমাম সাহেব হযরত দাউদের মাতার নিকট অনুরোধ

জানালেন। বললেন, "দেখুন, বাদশাহ হারুন-অর-রশিদ বাইরে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।"
দাউদ রাহিমাহুল্লাহর মাতা বললেন, "দাউদ বাবা! ভেরতে প্রবেশের অনুমতি দাও। দরোজা খুলো। ইমাম ইউসুফ ও বাদশাহ হারুন-অর-রশীদ এসেছেন তোমাকে দেখতে।"
হযরত জবাব দিলেন, "মা-গো, দুনিয়াদার ও শাসকদের সাথে দেখা করার আমার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?"
মা বললেন, "দাউদ! আমি তোমার দুগ্ধ মাতা হিসেবে দাবি জানাচ্ছি, তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে দাও।"
দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ এবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি যখন বলেছো, 'তোমার মায়ের হক্ব আদায় করো, কারণ আমার [আল্লাহর] সন্তুষ্টি তোমার মায়ের সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত'। সুতরাং আমি মায়ের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অন্যথায় এদের সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" তিনি দরোজা খুলে দিলেন।

ইমাম ইউসুফ ও বাদশাহ হারুন-অর-রশিদ কক্ষে ঢুকে দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর সম্মুখে আদবসহকারে বসলেন। হযরত নসিহত করা শুরু করলেন। হারুন-অর-রশিদ কাঁদতে লাগলেন।

বিদায়ের সময় বাদশাহ একখণ্ড স্বর্ণ হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহকে হাদিয়া হিসেবে তাঁর সম্মুখে পেশ করলেন। বললেন, "এটি একটি পবিত্র বস্তু। হালাল উপায়ে প্রাপ্ত।"

হযরত দাউদ বললেন, "আমার এটার প্রয়োজন নেই। নিয়ে যান। আমি একটি বাড়ি বিক্রি করেছি যেখানে পবিত্র ব্যক্তিগণ ভাড়াটে হিসেবে থাকতেন। বিক্রির অর্থ দ্বারা আমার খরচপাতি চলছে। আমি আল্লাহর নিকট আবদার জানিয়েছি, 'এই পবিত্র হালাল অর্থ যখন শেষ হয়ে যাবে, তিনি যেনো আমার আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যান। এতে করে আমার প্রয়োজন পূরণে কারোর দয়ার দানের দরকার পড়বে না। আমি আশাবাদী যে, আমার প্রভু আমার এ প্রার্থনা কবুল করেছেন।"

হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

উক্ত সাক্ষাতের কিছুদিন পর ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর গৃহে ফিরে আসলেন। হযরত তায়ীর মুদ্রাথলে রক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, "দাউদ তায়ীর থলের মধ্যে কটি দিরহাম বাকি আছে?" রক্ষক জবাব দিলেন, "দুটি দিরহাম বাকি আছে।" ইমাম সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "প্রত্যহ তিনি কটি রৌপ্যমুদ্রা খরচ করেন?" রক্ষক জবাব দিলেন, "একটি করে রৌপ্যমুদ্রা খরচ করেন।" ইমাম সাহেব হিসেব করে চলে আসলেন।

একদিন হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, আজই হযরত দাউদ তায়ী মায়াবী এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। উপস্থিত মুসল্লিরা প্রশ্ন করলেন, "আপনি এ সংবাদটি কীভাবে জানলেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি তাঁর দৈনিক খরচের হিসেব করে দেখেছি। আজ তাঁর নিকট আর কোনো দিরহাম অবশিষ্ট নেই। তাঁর দুআ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন।" ইমাম সাহেবের এ ঘোষণা শুনে সবাই ছুটে চললো যুগের এক শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত দাউদ তায়ীর বাড়ির দিকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দা ও ওলির দারাজাত বুলন্দ করুন। সংরক্ষণ করুণ তাঁর সকল গোপন রহস্য।

ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকানুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত মা'রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনায় নিমগ্ন হবো। আমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করছি। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া একটিও অক্ষর লিখার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হযরত শায়খ মা’রুফ ইবনে ফিরুজ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত- ২০০ থেকে ২০৫ হিজরির মধ্যে, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো শায়খ আসাদুদ্দিন আবু মাহফুজ মা’রুফ ইবনে ফিরুজ কারখী রাহিমাহুল্লাহ। তবে তিনি মা’রুফ কারখী নামেই সুপরিচিত। তাঁর পিতার নাম কী ছিলো এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। ফিরুজ, ফিরুজান বা আলী বলেছেন অনেকেই। তবে তাঁর পিমা-মাতা যে খ্রিস্টান থেকে মুসলমান হয়েছিলেন এ ব্যাপারে মতৈক্য বিদ্ধমান।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ ১৩২ হিজরি সনে ইরাকের বাগদাদের নিকটস্থ কারখ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মাতা-পিতার সন্তান হওয়ায় স্বভাবতই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা খ্রিস্টবাদভিত্তিক ও চার্চে যাওয়া-আসার মাধ্যমে শুরু হয়। তবে তাঁর যুগের বাগদাদ ও আশপাশ অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়া করে। ইসলামের প্রতি তিনি সর্বদাই কিছুটা দুর্বলতাও বোধ করতেন। ছোট ছোট মুসলিম শিশু-কিশোরদের সঙ্গে প্রায়ই খেলাধূলায় মেতে ওঠতেন। বাড়িতে যেয়ে মা-বাবার সঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। এমনটি মা-বাবাকে সময় সময় প্রশ্ন করতেন, “আমরা যদি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাই তাহলে কী ভালো হয় না?” কিন্তু তাঁর পিতা মা’রুফের এরূপ প্রশ্নে মোটেই খুশি হতেন না। তিনি পুত্রকে একজন খ্রিস্টান পাদ্রীর নিকট পাঠালেন শিক্ষা-দীক্ষার জন্য।

প্রথম দিন পাঠদানের সময় পাদ্রী মা’রুফকে বললেন, “বলো, প্রভু হচ্ছেন তিন জনের একজন”।[13] মা’রুফ প্রতিবাদের শুরে উস্তাদকে বললেন, “না! বাস্তবে তো প্রভু মাত্র একজন!” পাদ্রী রাগান্বিত হয়ে তাঁকে প্রহার করলেন। বার বার বললেন, “বলো, প্রভু হচ্ছেন তিন জনের একজন!” মা’রুফ বলেন, “না, তিনি এক ও একক!” এভাবে বার বার চেষ্টা করেও পাদ্রী ব্যর্থ হলেন। মা’রুফ কিছুতেই ‘প্রভু

---

[১৩] খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। তারা বলে থাকে: God the Father, God the Son and God the Holy Ghost. অর্থাৎ: ইশ্বর পিতা, ইশ্বর পুত্র ও ইশ্বর পবিত্র আত্মা। -গ্রন্থকার।

হচ্ছেন তিন জনের একজন’ বললেন না। পরবর্তীতে মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “অমুসলিম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও উস্তাদ আমাকে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন তা আমার হৃদয় কখনো মেনে নেয় নি। যখনই তাঁর কোনো পাঠদান শিখতে আমি অসম্মতি জানিয়েছি তখনই তিনি আমাকে বেত্রাঘাত করেছেন। তবে মজার কথা হলো, পাদ্রী আমাকে যতো বেশি প্রহার করতেন আমি ততো বেশি তাঁর শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করতাম। অবশেষে পাদ্রী আরো কঠিন হয়ে ওঠেন আমার প্রতি। আমার পিতাকে বললেন, “এ ছেলেটি ধর্মত্যাগী হচ্ছে! একে বন্দী করে রাখুন।”

তিনি আরো বলেন, “পাদ্রীর নির্দেশে আমার পিতা আমাকে তিন দিনের জন্য একটি কক্ষে বন্দী করে রাখলেন। প্রতিদিন আমাকে একটিমাত্র রুটি আহারের জন্য দেওয়া হতো। তবে আমি এগুলো স্পর্শই করি নি। আমাকে যখন কক্ষ থেকে বের করা হলো তখন আমি বাড়ি থেকে ছুটে পালালাম। তবে যেহেতু আমি মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম তাই তাঁরা আমাকে বার বার চিঠি প্রেরণ করে আবদার জানান, “বাবা! বাড়িতে ফিরে এসো। আমরা তোমাকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তুমি যে ধর্মের অনুসারী হতে চাও- হবে, এতে আমাদের কেনো আপত্তি থাকবে না। আমরাও তোমার ধর্ম অনুসরণ করবো।”

আমি এরপর হযরত মূসা ইবনে আলী রেজা রাহিমাহুল্লাহর নিকট যেয়ে ইসলামে দীক্ষিত হলাম। এরপর এই মহামূল্যবান সম্পদ ‘ইসলাম’ নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাই। আমার মা-বাবা তাঁদের ওয়াদা রক্ষা করলেন। তাঁরাও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।”

হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে

হযরত মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে উদ্রগীব হয়ে ওঠেন। তখনকার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলি ছিলেন কুফা শহরে বসবাসকারী হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তাঁরই হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরীদ হলেন। এরপর দীর্ঘদিন স্বীয় মুর্শিদের সুহবতে থেকে আধ্যাত্মিকতার সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদার ব্যাপারে সকলেই অবগত ছিলেন। এমনকি দূর-বিদেশেও লোকজন এ ব্যাপারে অবহিত ছিলো।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মনসুর তুসী রাহিমাহুল্লাহ নামক একজন ওলিআল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমি হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহকে বাগাদাদে দেখেছি। দেখলাম, তাঁর মুখমণ্ডলে একটি ক্ষতচিহ্ন। জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো গতকালও আপনার সঙ্গে ছিলাম। তখন তো এই চিহ্নটি দেখি নি। কী এটি?" তিনি বললেন, "ওসব ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন না যা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুধুমাত্র ওসব প্রশ্ন করুন যা আপনার জন্য উপকারী।" আমি এবার আরো বেশি আগ্রহান্বিত হলাম ব্যাপারটি জানতে। বললাম, "আমরা যার উপাসনা করি তাঁর কসম! আপনি অবশ্যই বলুন, এ ক্ষতচিহ্ন কী?" তিনি তখন বললেন, "গতরাতে আমি গভীর মুরাক্বাবায় নিমগ্ন ছিলাম। আমার মনে প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মালো মক্কা মুকাররমায় যেতে। বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে। আমি দেখলাম, তাওয়াফ শেষে জমজম কূপের নিকটে আছি। পবিত্র পানি পান করতে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ আমার পা পিছলে গেলো। দেওয়ালের উপর পড়ে আমার মুখে আঘাত পেলাম। আর এতেই মুখের মধ্যে ক্ষতচিহ্ন পড়ে গেলো- যা আপনি দেখছেন।"[১৪]

তাঁর অনুপম চরিত্র-মাধুর্য

হযরত মা'রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যুগের একজন স্বনামধ্য সুফি-দরবেশ ছিলেন। তাঁর উচ্চ পর্যায়ের পরহেজগারী ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে সবাই জ্ঞাত ছিলো। তিনি প্রতি রাতেই দীর্ঘ সময় কাটাতেন ইবাদত-বন্দেগীতে। গভীর ধ্যান-মুরাক্বাবা-মুশাহাদার মধ্যে আল্লাহর দরবারে খুব বেশি কাঁদতেন। তাঁর প্রধান খলিফা হযরত শায়খ সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি যা-ই প্রাপ্ত হয়েছি তা সবই হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর বরকতে।"

ওলিআল্লাহ শায়খ সাইয়্যিদ আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তরক্বে দুনিয়া কোনো ব্যক্তি আমি দেখিনি যেরূপ দেখেছি হাযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহকে। তাঁর মর্যাদা এতোই ঊর্ধ্বে যে, তাঁর কবর থেকেও বরকতের বারিধারা অব্যাহতভাবে বেরিয়ে আসে।"[১৫]

---

[১৪] তাযকিরাতুল আউলিয়া- হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লা।

[১৫] কাশফুল মাহজুব - হযরত আলী হাজভেরী দাতা গঞ্জেবখশ রাহিমাহুল্লাহ।

একটি ঘটনা

কোনো একদিন হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ মসজিদের ভেতর নিজের জায়নামাজ ও কুরআন শরীফ রেখে দজলা নদীতে চলে যান অযু করতে। একজন বৃদ্ধা মসজিদে ঢুকে তাঁর জায়নামাজ ও কুরআন শরীফ চুরি করে নিয়ে গেলো। হযরত মা'রুফ কারখী মহিলাকে তাড়া করলেন। দৌড়ে যেয়ে তাকে ধরে ফেললেন। চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে নামিয়ে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কোনো পুত্র আছে কী যে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে?" বৃদ্ধা জবাব দিলো, "না।" তিনি বললেন, "তাহলে আমার কুরআন শরীফ আমাকে ফেরত দাও। তুমি জায়নামাজ নিয়ে যেতে পারো।" একথা শুনে বৃদ্ধা লজ্জা পেলো। হযরতের প্রতি সে শ্রদ্ধাবোধ করলো। কুরআন শরীফ ও জায়ানামাজ তাঁকে ফেরত দিয়ে চলে যেতে উদ্যোত হলো। তিনি বললেন, "যেয়ো না, জায়নামাজটি নিয়ে যাও। আমি এটি তোমাকে হাদিয়া দিলাম।" বৃদ্ধা জায়নামাজ নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলো। সে ভাবতে থাকে, এমন দয়ালু ব্যক্তি কী এখনও আছেন, যিনি চোর ধরে তার প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন?

হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ সব সময় অযু অবস্থায় থাকতেন। একদিন মরুভূমিতে থাকাবস্থায় তাঁর অযু চলে গেলো। তিনি পানি না পেয়ে তাইয়াম্মুম করে নিলেন। সাথীরা বললেন, "হযরত! দজলা নদী তো তেমন দূরে নয়। আপনি কেনো বালি দ্বারা তায়াম্মুম করলেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি কী দজলা পর্যন্ত পৌঁছুনোর সময় পাবো? এরই মধ্যে যে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যাবো না- তার কী কোনো নিশ্চয়তা আছে?"[১৬]

---

[১৬] আমার শায়খ কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরও অনুরূপ একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমি [লেখক] ছিলাম। পবিত্র হজ্জের সফরে আরাফাত থেকে রাত ৯টায় মুজদালিফায় আসলাম। শায়খ আমাকে বললেন, ইস্তিঞ্জা করবো। আমি দেখলাম অদূরে অবস্থিত প্রস্রাবখানাগুলোর সামনে অসংখ্য মানুষ লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাই হযরতকে নিয়ে অপর একটি প্রস্রাবখানায় গেলাম। সেখানে কেউ ছিলো না। এর কারণ হলো, এ প্রস্রাবখানায় পানি ছিলো না। আমি একটি ছোট্ট বোতলে কিছু পানি নিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলাম। ইস্তিঞ্জা সেরে তিনি দেওয়ালের উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করলেন। আমি বললাম, হুজুর! আমাদের কাফেলার নিকট অযু করার মতো যথেষ্ট পানি বোতলের ভেতর রেখে এসেছি। তিনি বললেন, "ওখান পর্যন্ত যাওয়ার সময় কী আমার হাতে আছে? এরই মধ্যে যদি পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যাই!" -গ্রন্থকার

খিলওয়াত অবলম্বনের ব্যাখ্যা

হযরত মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া শায়খ! আপনি কোন কারণে দুনিয়াবিমুখ হলেন এবং আল্লাহর সৃষ্টি থেকে মুখ ফেরালেন? নিজেকে খিলওয়াত [নির্জনতা] অবলম্বনে আত্মনিয়োগ করলেন ও আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন হলেন? এর কারণ কী মৃত্যুকষ্ট, কবর-আযাব, জাহান্নামের ভীষণ কষ্ট এবং জান্নাত লাভের আশা?” তিনি জবাব দিলেন, “হে আমার বন্ধু! তুমি তো খুব মামুলী বিষয়গুলোর ওপর ব্যাখ্যা চাচ্ছো! এসব ব্যাপার তো আল্লাহর সম্মুখে মূল্যহীন। এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি মাত্র। এগুলো তাঁর দাস। যখন তুমি তাঁর নৈকট্যের স্বাদ পাবে তখন যাকিছু নিয়ে তুমি ভাবছো তা তোমার অন্তরে জাগ্রতই হবে না!”

কারামত

হযরত মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ কারামতওয়ালা ওলি ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে অনেক কারামত প্রকাশ হয়েছে। কারামত যদিও ওলায়েতের জন্য শর্ত নয়- তথাপি এ থেকে সাধারণ মানুষ এবং স্বয়ং ওলি নিজেই উপকৃত হয়ে থাকেন। নিচে আমরা হযরতের কয়েকটি কারামতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করলাম।

১. দু’আর বরকত: একদা লোকজন এক ডাকাতকে ধরে শহরের শাসকের নিকট নিয়ে গেলো। শাসক তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমতো ডকাতকে ফাঁসি দেওয়া হলে সে মৃত্যুবরণ করলো। ডাকাতের মরদেহ তখনো ফাঁসির দড়িতে ঝুলন্ত ছিলো যখন হযরত মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ সেদিকে যাত্রা করছিলেন। ঝুলন্ত মরদেহ দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আহ! কী কষ্টের মধ্যে লোকটির দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়েছে! তাঁর অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। আল্লাহর দরবারে ডাকাতের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দু’আ করলেন, “হে মহান দায়লু প্রভু! হে রাহমানুর রাহীম! এ জগতে পাপের কারণে সে শাস্তি পেয়েছে। হে প্রভু! আপনি যদি তাঁকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনার অসীম দয়ার ভাণ্ডারে কোনো কমতি হবে না।”[১৭]

---

[১৭] মাসালিক আস-সালিকীন, খ. ১, পৃ. ২৮৮।

দু'আ শেষ হতেই এক গায়েবি আওয়াজ শোনা গেলো: "যে কেউ ফাঁসির দড়িতে ঝুলন্ত আমার বান্দার জানাযায় শরীক হবে সে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান পাবে।" সমগ্র শহরব্যাপী এই আওয়াজ বুলন্দ হলো। লোকজন ছুটে এসে ডাকাতের লাশ নামিয়ে গোসল ও কাফন পরিয়ে জানাযা পড়ে কবরস্থ করলো। একব্যক্তি ঐ রাতেই স্বপ্নে দেখলেন, কিয়ামত এসে গেছে। যে লোকটিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তার পরনে উত্তম বস্ত্র এবং তিনি বসে আছেন আল্লাহর প্রিয়জনদের সাথে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন কীভাবে?' তিনি জবাব দিলেন, "দয়ালু আল্লাহ তা'আলা হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর দু'আর বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও মর্যাদাশীল করেছেন।"

২. কুকুরকে নিয়ে রুটি ভক্ষণ: হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর একজন চাচা শহরের শাসক ছিলেন। একদিন তিনি শহরের নির্জন একটি অঞ্চলের নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। লক্ষ করলেন, তাঁর ভাতিজা মা'রুফ সেখানে বসে রুটি খাচ্ছেন। তাঁর সামনেই ছিলো একটি কুকুর। হযরত কারখী এক টুকরো রুটি নিজের মুখে দিচ্ছেন এরপর আরেক টুকরো কুকুরের মুখে ঢুকাচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে শাসক মহোদয় থমকে দাঁড়ালেন। ভাজিতার কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমার ভাতিজা! তুমি এ কী করছো? একটি কুকুরের সাথে বসে রুটি খাচ্ছো! তুমি কী এতে লজ্জা বোধ করো না?" তিনি জবাব দিলেন, "লজ্জাবোধের কারণেই আমি কুকুরকে রুটি দিচ্ছি!" এরপর তিনি আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করলেন। একটি উড়ন্ত পাখিকে ডাক দিলেন। পাখিটি নিচে নেমে তাঁর হাতে এসে বসে পড়লো। সে তার মাথা নিজের পাখা দ্বারা আবৃত করে রাখলো। মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "যে কেউ আল্লাহর সম্মুখে লজ্জিত হয়, অপর সবাই সেই ব্যক্তির সামনে লজ্জাবোধ করে!" তাঁর শাসক চাচা একথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন।[১৮]

৩. দুষ্টদের ভাগ্য উন্মোচন: একদিন মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ শিষ্যদেরসহ কোথাও হেটে যাচ্ছিলেন। কোত্থেকে একদল মদ্যপ দুষ্ট লোক এসে তাদের নিকট দিয়ে চলতে শুরু করলো। এরা অত্যন্ত বে-আদবী ও শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্ম করতে করতে হযরত ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে দজলা নদীর তীর পর্যন্ত গেলো। হযরতের সাথীরা এতে ভীষণভাবে বিরক্ত বোধ করলেন। তারা তাঁকে বললেন, "হে শায়খী!

[১৮] তাজকিরাতুল আউলিয়া।

এই দুষ্ট লোকগুলোকে ধ্বংস করে দিতে আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যাতেকরে এদের দৌরাত্ম্য থেকে পৃথিবীর জমিন মুক্ত হয়।" হযরত মা'রুফ কারখী হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে এ লোকগুলোকে ইহজগতে হাসি-খুশির জীবন দান করেছেন, অনুরূপ পরকালেও তাদেরকে আরো বেশি শান্তি ও হাসি-খুশির জীবন দান করুন!" হযরতের সাথীরা বিস্মিত হয়ে বললেন, "হে আমাদের শায়খ! আপনি এ কীরূপ দু'আ করলেন? আমরা তো এর মর্ম বুঝতে পারলাম না!" হযরত শায়খ মা'রুফ কারখী বললেন, "আরে! আমি যার সাথে কথা বলেছি তিনি এর গোপন রহস্য অবগত আছেন। ... একটু অপেক্ষা করো। এখই হয়তো সে রহস্য উন্মোচন হয়ে যাবে!"

কী আশ্চর্য! একটু পরই দেখা গেলো দুষ্ট লোকগুলো নিজেদের হাতের বাঁশি-বাদ্যযন্ত্র ও মদ ছুড়ে মারলো। তারা সবাই কচু পাতার মতো কাঁপছিলো। সকলে ছুটে আসলো হযরত মা'রুফ কারখীর নিকটে। অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ্ করলো। জীবনে আর কখনো দুষ্টুমি করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করলো।

পরবর্তীতে হযরত কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শাগরিদদের বললেন, "দেখলে তো কীভাবে আল্লাহ তা'আলা তেমোদের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে কবুল করলেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দজলায় ফেলে নিমজ্জিত না করে এবং কষ্ট না দিয়েই রক্ষা করেছেন।"[১৯] সুবহানাল্লাহ!

৪. দয়ার দান: হযরতের প্রধান খলিফা শায়খ সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, এক ঈদের দিনে দেখতে পেলাম হযরত কারখী কিছু খেজুর-বীচি সংগ্রহ করছেন। জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়া শায়খী! আপিন কী করছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি একটি ক্রন্দনরত শিশুকে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেনো কাঁদছো? সে বললো, 'আমি একজন ইয়াতীম। আমার মা-বাবা এ পৃথিবীতে নেই। আজ ঈদের দিন। অন্যান্য শিশুদের পরনে আছে নতুন জামা-কাপড়। কিন্তু আমার নেই। পুরাতন ছেড়া বস্ত্র পরেছি। তাদের হাতে আছে বাদাম। আমার হাতে নেই।' এ কারণে এই বীচিগুলো সংগ্রহ করছি। বিক্রি করে শিশুটির জন্য ক্রয় করবো নতুন জামা ও বাদাম। এগুলো পেলে সে খুশি হয়ে শিশুদের সঙ্গে খেলাধূলা করবে।"

---

[১৯] প্রাগুক্ত।

হযরত সিররি সাক্বাতী বললেন, "হযরত! আপনার আশা পূরণ করতে আমাকে সুযোগ দিন। আপনি আর কষ্ট করবেন না।" এরপর হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ শিশুটির জন্য নতুন কাপড় এনে পরালেন, বাদাম কিনে তার হাতে দিলেন। শিশুটি অত্যন্ত আনন্দিত হলো। সে হাসিমুখে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধূলা করতে ছুটে গেলো। হযরত সাক্বাতী বলেন, "এ মুহূর্তে আমার হৃদয়টি উজ্জ্বল নূরে আলোকিত হয়ে ওঠলো। আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত স্তরে পৌঁছালো।"[২০]

মূল্যবান উপদেশবাণী[২১]

১. নফসের অনুসরণ হলো আল্লাহকে না মানার সামিল।
২. আল্লাহর সৌন্দর্যকে যারা উপলব্ধি করেন তারাই হচ্ছেন আল্লাহর আশিক। আর আল্লাহর আশিকের জন্য পাপকর্মের দরোজা বন্ধ হয়ে যায় এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত থাকে।
৩. নির্লজ্জ কথাবার্তা হচ্ছে গোমরাহীর নিদর্শন। আর সবসময় চেতনশীল থাকা হচ্ছে হাক্বিক্বাত জানার নিদর্শন।
৪. উত্তম আমল ছাড়া বেহেশত লাভের আশা, সুন্নাতের অনুসর ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহর নাফরমানী করে তাঁর রহমত লাভের আশা হচ্ছে বোকামী।
৫. হাক্বাইক্ব [সত্যতা] ও দাক্বাইক্ব [সূক্ষ্মদর্শিতা] সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং সেটা মানুষের নিকট বুঝিয়ে বলার নাম হচ্ছে 'তাসাওউফ'।
৬. পাপ হওয়ার সম্ভাবনা যাচাই-বাছাই না করে অন্যের সম্পর্কে ভালো-মন্দ আলাপচারিতা উচিৎ নয়।
৭. দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত ব্যক্তি ঐশি প্রেমের ছোঁয়া পাবে। এ ভালোবাসার সূত্র প্রভুর সুদৃষ্টি।
৮. মা'রিফাত লাভকারীর অভ্যন্তরে অফুরন্ত ধনভাণ্ডার বিদ্যমান। তাঁদের প্রয়োজন নেই অপর কোনো ধন-সম্পদের।
৯. যে কেউ আল্লাহর প্রতি ভরসা করে, সে মানুষের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকে।
১০. সাবধান! আল্লাহ তোমাকে সর্বদা অবলোকন করছেন।

---

[২০] প্রাগুক্ত।

[২১] এ বাণীগুলো আমরা ইন্টারনেটের সাইট: sufiwiki.com থেকে সংগ্রহ করেছি। এগুলোর মূল সূত্র হচ্ছে 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'কাশফুল মাহযুব' ও 'মাসালিক আস-সালিহীন'।

১১. খোদাপ্রেম হচ্ছে একটি পবিত্র বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর আবিদদের প্রতি রহমত হিসেবে নাযিল করেন। এটা কোনো মানুষের কাছ থেকে শেখার বিষয় নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার যা আসে তাঁর দয়ার বদৌলতে।

১২. আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ তিনি যিনি আল্লাহপ্রেমে বিভোর। তিনি তাঁর প্রেমাস্পদ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না।

১৩. তিনিটি নিদর্শন দ্বারা ওলিদের পরিচয় মিলে: (১) তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাশীল, (২) তাঁরা আল্লাহর সাথী এবং (৩) তাঁদের সকল কাজ আল্লাহর জন্য।

১৪. যারা আল্লাহর মা'রিফাত লাভ করেছেন তাঁরা চিরন্তন প্রশান্তি পেয়েছেন। আ'রিফের মাঝে প্রশান্তি না থাকলে তিনি নিজেই প্রশান্তির মাঝে।

১৫. উদারতার নিদর্শন তিনটি: (১) প্রতিরোধ ছাড়া ঈমান সংরক্ষণ, (২) প্ররোচণা ছাড়া প্রশংসা করা ও (৩) আবদার ছাড়া দান করা।

১৬. ঐ ব্যক্তি সত্যিকার গোলাম নয় যে তার মনিবের বেত্রাঘাতকে স্বচ্ছন্দ্যে মেনে নেয় না। তার গোলাম হওয়ার দাবি মিথ্যা।

১৭. যখন কোনা ঈমানদার কোনো বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পাড়ে যা তার ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়, তখন বুঝতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর এটি একটি অভিশাপের নিদর্শন।

১৮. যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় কারো উপকার হয় না, তার ওপর অনর্থক আলাপচারিতা হচ্ছে গোমরাহীর লক্ষণ।

১৯. সবার ওপর থেকে তোমার চোখ সরিয়ে নাও। কোনো ক্ষতিকর দৃষ্টিপাত করো না কারোর প্রতি।

২০. প্রেম এমন এক বস্তু যা না শিক্ষা দেওয়া যায় না শেখা যায়।

২১. যে ভিত্তি উপড়ে ফেলা যায় না তা হচ্ছে 'বিচার'; যে তিক্ততার ফলাফল মিষ্ট তা হচ্ছে 'ধৈর্য'; এবং যে মিষ্টতা থেকে ফলাফল হয় তিক্ততা তা হলো, 'ইন্দ্রিয়সুখ'। আর যে রোগের নিরাময় নেই তা হচ্ছে 'বোকামি'।

২২. যে ক্লেশ বা বিপর্যয় যা থেকে মানুষকে পালানোর প্রয়োজন, তা হচ্ছে অতি-উৎফুল্লতা।

২৩. মূর্তিপূজা হচ্ছে বাহ্যিক শিরক। আর আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণীর প্রতি ভরসা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ নাস্তিক্যতা।

২৪. শয়তান কৃপণ মুসলমানকে ভালোবাসে এবং উদার গোনাহগারকেও ঘৃণা করে।

২৫. ধনী ব্যক্তিদের সংস্পর্শ যে ক্ষতি করে তা মাপা যায় না- সুতরাং, তাদের থেকে পালিয়ে থাকো!

২৬. তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, “দুঃখ-কষ্টের পরিত্রাণ কী?” তিনি জবাব দিলেন, “মানুষ থেকে দূরে থাকা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ।”
২৭. যে কেউ প্রতিফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভালো আমল করে সে হচ্ছে ব্যবসায়ী; যে কেউ ভালো আমল করে দোযখের অগ্নি থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় সে একজন গোলাম- যে তার মনিবের শাস্তিকে ভয় পায়; আর যে কেউ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ভালো আমল করে সে মুক্তি পেয়েছে।
২৮. ঈমান কামিল না হলে আমলও কামিল হবে না।
২৯. তোমরা যখন ধনী থাকো তখন মনে করো আল্লাহপ্রেমিক। আর যখন বিপর্যয় নেমে আসে তখন তোমরা তাঁর থেকে পালিয়ে যাও। বিপদের সময়ও আনুগত্যে অটল থাকার নাম হচ্ছে সত্যিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা।

হযরতের ইন্তিকাল

যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ হযরত শায়খ মা’রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২০০ হিজরি সনে শুক্রবার দিন ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর মৃত্যুকালীন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন, একদল শিয়া একদিন হযরত মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ শায়খ রেজার দরোজায় এসে গাদাগাদি করছিলো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তাদের বাঁধা দিলেন। এতে তাঁর পাঁজর পিঞ্জরে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তিনি গুরুতরভাবে আহত হলেন। এ থেকেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মৃত্যুর পূর্বে হযরত সাক্বাতী আবদার জানালেন, “হযরত! আমাকে নসিহত করুন।” তিনি বললেন, “আমার মৃত্যুর পর পরনের জুব্বাটি খুলে কাউকে দান করবে। আমি এ জগৎ থেকে বস্ত্রহীন অবস্থায় যেতে চাই।”

মৃত্যুর পর ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা তাঁকে তাদেরই একজন দাবি করলো। তিন ধর্মের লোকই তাঁকে দাফন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ সমস্যা থেকে মুক্তির পথ কেউ খুঁজে পাচ্ছিলো না। এরপর হযরত কারখী রাহিমাহুল্লাহর একজন খাদিম এগিয়ে এসে সবাইকে বললেন, “মৃত্যুর পূর্বে হযরত শায়খ আমাকে বলেছেন,

'যারা আমার মরদেহ বহনকারী খাট মাটি থেকে উপরে উঠাতে সক্ষম হবে, তারাই আমার কাফন-দাফন করবে।'"

সুতরাং প্রথমে খ্রিস্টানরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এরপর ইয়াহুদিরাও বিফলমনোরথ হলো। অবশেষে মুসলমানরা সহজেই তাঁর লাশবাহী খাটখানা কাঁধে তুলে নিলেন। সুতরাং অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো এবং তিনি কবরে সমাহিত হলেন।

হযরতের মৃত্যুর পর সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। লক্ষ করলেন, তিনি আরশে আজিমের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ দুটো খোলা। বড় বড় চোখে তাকাচ্ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: "কে এই লোকটি?" তাঁরা জবাব দিলেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনি এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।" আল্লাহ তা'আলা বললেন, "সে মা'রুফ কারখী। তার চোখে ধাঁধানো অবস্থা ও হতভম্বতা বিরাজ করছে অন্তরে আমাদের ভালোবাসা হেতু। একমাত্র আমার দর্শন পেলে সে আত্মস্থ ফিরে পাবে। একমাত্র আমার সাক্ষাতে সে নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করবে।"

হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ ইরাকের রাজধানী বাগদাদে সমাহিত আছেন। তাঁর প্রধান খলিফা ছিলেন বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন আমরা তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের তাওফিক দিন এবং সকল চেষ্টা কবুল করুন।

হযরত শায়খ আবুল হাসান সিররি ইবনে মুগলিস সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু- ২৫৩ [মতান্তরে ২৫১ বা ২৫৭] হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বাগদাদের ইমাম। তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। যুগের আরেক শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত মা'রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাঁর তরিকতের শায়খ।

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর একজন সাথী ছিলেন হযরত বিশর হাফি রাহিমাহুল্লাহ। এছাড়া তাঁরই ভাগিনা ও তরিকতের খলিফা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি হাদিসেরও রাবী ছিলেন। তিনি হযরত ফাজিল থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী ও হযরত আবুল আব্বাস বিন মাশরুক্ব। হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি 'হাক্বাইক্ব' ও 'ইশারাত' সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাথমিক জীবন

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর পিতার নাম ছিলো হযরত মুগলিস। তাঁর জন্ম হয় ইরাকের রাজধানী বাগদাদে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে তিনি ১৫৫ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন তাবে-তাবিঈ ছিলেন।

পরিণত বয়সে হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। বাগদাদের এক সরু রাস্তায় তাঁর একটি দোকান ছিলো। তিনি সময় পেলেই দোকানের সম্মুখে একখানা পর্দা টেনে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। প্রত্যহ অনেক রাকাআত [নফল] নামায পড়তেন।

একদিন লুকাম পাহাড় থেকে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাতে আসলেন। তখন হযরতের দেকানের সামনে পর্দা টাঙ্গানো ছিলো। আগন্তুক পর্দা তুলে হযরতকে

সালাম জানালেন। বললেন, “লুকাম পাহাড়ের অমুক শায়খ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।”
হযরত সাক্বাতী বললেন, “তিনি তো পাহাড়ে বসে ইবাদতে মশগুল আছেন। তাঁর চেষ্টা-সাধনা কিছুই নয়! মানুষের মধ্যে থেকেও যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির-ফিকির নিয়ে থাকতে সক্ষম, এক মুহূর্তের জন্যই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল নয়- সে-ই তো সত্যিকার ইবাদতকারী।” আগন্তুক তাঁর কথা শুনে নিরব হয়ে গেলেন।

বলা হয়ে থাকে হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ ব্যবসা থেকে ৫ শতাংশের বেশি লাভ কখনো করেন নি। একদা তিনি ষাট দিনারের বিনিময়ে কিছু কাঠবাদাম ক্রয় করেন। এরপরই বাজারে কাঠবাদামের ঘাটতি পড়ে যায়। একজন দালাল হযরতের নিকট ছুটে আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘এগুলো বিক্রি করবেন?’
হযরত সাক্বাতী বললেন, ‘অবশ্যই!’
দালাল: ‘দাম কতো?’
হযরত সাক্বাতি: ‘তেষট্টি দিনার।’
দালাল: ‘কিন্তু হযরত! বর্তমানে এই কাঠবাদামের বাজারমূল্য তো নব্বই দিনার!’
হযরত সাক্বাতি: ‘আমার একটি আইন হলো ৫ শতাংশের বেশি লাভ না করা। আমি এ আইনকে ভঙ্গ করবো না।’
দালাল: ‘কিন্তু আমি মনে করি, কম দামে আপনার পণ্য বিক্রি করা ঠিক হবে না।’
সুতরাং দালাল ব্যক্তি চলে গেলো। হযরত সাক্বাতির কাঠবাদাম বিক্রি হলো না।

সুলুকের রাস্তায়

হযরত সাক্বাতির দোকানে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য বিক্রি হতো। একদিন বাগদাদের বাজারে আগুন লাগলো। মানুষ ছুটে এসে হযরত সাক্বাতি রাহিমাহুল্লাহকে বললো, “হযরত! বাজারে আগুন লেগেছে।” তিনি মন্তব্য করলেন, “তাহলে আমিও মুক্ত হলাম!” আগুন নিভে যাওয়ার পর দেখা গেলো একমাত্র তাঁর দোকান ছাড়া বাকি সবগুলো জ্বলেপুড়ে ছাই। তিনি তখন দোকানের সবকিছু গরিব-দুঃখিদের মধ্যে বণ্টন করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন।

দীর্ঘদিন পরে একবার তিনি উক্ত ঘটনার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, “ত্রিশ বছর অতিবাতি হয়ে গেছে, আমি এখনও তাওবাহ করে যাচ্ছি আল্লাহর দরবারে- কারণ, আমি একটি ব্যাপারে ‘আল্লাহর শুকুর’ বলেছিলাম।” লোকজন ব্যাপারটি সম্পর্কে

আরো একটু ব্যাখ্যা চাইলো। তিনি বললেন, “বাজারের দোকানগুলো একদা জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু আমারটি রক্ষা পেলো। এ খবর শ্রবণ করে আমি বলেছিলাম, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এর পর থেকেই আমি তাওবাহ্ করতে থাকি। কারণ, নিজের দুনিয়াবী সম্পদ সংরক্ষিত থাকায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেই আমার মুসলিম ভাইদের ক্ষতি হওয়াতে আমি তখন আক্ষেপ বা দুঃখবোধ করি নি- এটা আমার পক্ষ থেকে গাফিলতি হিসেবে ধরা পড়ে যায়।”

হযরত সাক্বাতি রাহিমাহুল্লাহকে কেউ একজন প্রশ্ন করলো, “সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণের শুরুটা কীভাবে হয়েছিলো?”
তিনি জবাব দিলেন, “একদিন হযরত হাবিব আজমী রায়ী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আমার সক্ষাত ঘটে। আমি তাঁর হাতে কিছু দিরহাম দিয়ে বললাম, আপনি এগুলো গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। তিনি দুআ করলেন, ‘আল্লাহ্ আপনার প্রতি সদয় হোন।’ তাঁর এ দুআর পরই আমি দুনিয়ার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলি। এর পরের দিন আসলেন মা’রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর সাথে ছিলো একটি ইয়াতীম ছেলে। হযরত বললেন, ‘এই শিশুটিকে বস্ত্র দান করুন।’ আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলাম, ছেলেকে বস্ত্র দিলাম। তিনি দুআ করলেন, ‘আল্লাহ্ তা’আলা আপনার হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করুন। আপনাকে এই কাজ [দোকানদারী] থেকে মুক্ত করে দিন।’ এ দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। আমি দুনিয়াবী সবকিছু বিসর্জন করলাম। উভয় বুজুর্গের দুআর বরকতেই সবকিছু হয়েছে। আমি তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।”

হযরত সিররি সাক্বাতি রাহিমাহুল্লাহ ও সভাসদ ইয়াজিদ

একদিন হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদের একটি খোলা ময়দানে ওয়াজ-নসিহত করছিলেন। শহরের বিশিষ্ট সভাসদ ও অনুলেখক আহমদ ইয়াজিদ সভাস্থলের নিকট দিয়ে গোলাম ও ক্রীতদাসসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, “ও হে, তোমরা থামো! শুনে নেই এ বক্তা কী বলছেন? আমরা ইতোমধ্যে বেশ কটি উত্তম স্থানে গিয়েছি, যেখানে যাওয়ার কথা ছিলো না। আমি ওসব স্থানে বসে কিছু শুনি নি। এখন শুনবো।”

সুতরাং তিনি সভাস্থলে ঢুকে এক জায়গায় বসে ওয়াজ শুনতে লাগলেন। এসময় হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ বলছিলেন, “আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে

কেউই মানুষ থেকে দুর্বল নয়। অথচ আল্লাহর সৃষ্ট সকল প্রাণীর চেয়ে সর্বাধিক বেশি প্রভুর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারী হচ্ছে মানবজাতি। কেউ যদি উত্তম আমল করে তাহলে সে এতোই মর্যাদাশীল হয় যে, সকল ফিরিশতাও তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে। আর সে যদি খারাপ আমল করে তাহলে এতোই নিকৃষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং শয়তানও তার সাথী হতে লজ্জাবোধ করে। কী আশ্চর্য এ পৃথিবীর মানবকূল! সে এতো দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাফরমানী করে!"

এ কথাগুলো সভাসদ আহমদ ইয়াজিদের অন্তরাত্মায় যেনো হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লার ধনুক থেকে ছুড়ে মারা তীরের মতো আঘাত করলো। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফেরার পরও ক্রন্দন থামলো না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। বাড়িতে পৌঁছুনোর পরও তিনি আঘাতের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। এ রাতে তিনি খানা-পিনা পরিত্যাগ করলেন। কারো সাথে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি।

পরের দিন তিনি পায়ে হেটে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর ওয়াজ মাহফিলে যোগ দিলেন। আরো অনেক কথা শ্রবণ করে বাড়িতে ফিরে গেলেন। তৃতীয় দিনও তিনি হযরতের ওয়াজ মাহফিলে আসেন। এদিন তিনি একাই পায়ে হেটে এসেছিলেন। ওয়াজ শেষ হওয়ার পর হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর কাছে আসলেন।

হযরতের সম্মুখে হাজির হয়ে বললেন, "ইয়া শায়খ! গতকালকের আপনার কথাগুলো আমাকে আড়ষ্ট করে নিয়েছে। এ বাক্যগুলো আমার হৃদয়কে দুনিয়াবিমুখ করে ফেলেছে। আমি সবকিছু পরিত্যাগ করে মানবসমাজ থেকে দূরে সরে যেতে চাই। আপনি আমাকে আধ্যাত্মিক রাস্তার সন্ধানী হতে সাহায্য করুন।"

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোন রাস্তায় ভ্রমণে যেতে আগ্রহী- সুলুক না শরীয়তের রাস্তায়?"

ইয়াজিদ বললেন, "উভয়টি।"

হযরত সাক্বাতী বললেন, "সাধারণ্যের রাস্তা হচ্ছে এই: তুমি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইমামের পেছনে আদায় করবে, জাকাত দেবে, রমজানের ফরয রোযা রাখবে, মক্কা শরীফ যেয়ে হজ্জ আদায় করবে। হালাল-হারাম বুঝে চলবে ইত্যাদি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাস্তা হচ্ছে এই: প্রথমোক্ত আমলগুলো সঠিকভাবে পালন করা ছাড়াও তুমি সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াকে পেছনে ফেলে দেবে, দুনিয়ার কোনো জালে

আটকা পড়া থেকে মুক্ত থাকবে, তোমাকে এটি [দুনিয়া] গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে না। এ হচ্ছে উভয় রাস্তার স্বরূপ।” কথাগুলো শুনে আহমদ ইয়াজিদ চলে গেলেন। তিনি মরুভূমির দিকে পা বাড়ালেন।

বেশ কিছুদিন পর জঠলাকেশী, কপোলে আঁচড়ের চিহ্নযুক্ত এক বৃদ্ধা হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। বললেন, “হে মুসলমানদের ইমাম! আমার একটি নওজোয়ান, সুদর্শন পুত্রসন্তান ছিলো। একদিন সে আপনার ওয়াজ-মাহফিলে আসলো, হাসিখুশি ও প্রফুল্লচিত্তে। এরপর যখন সে ফিরলো, তার চোখে-মুখে ভীষণ বেদনার ছাপ, ক্রন্দনরত ও আহাজারি করতে করতে সে বেহুশ বেকরার। এখন, বেশ কদিন চলে গেছে- সে নিরুদ্দেশ, কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তো তার মা! তার অনুপস্থিতিতে আমার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন।”

বৃদ্ধার এরূপ আবদারে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। অনুকম্পা ও সহমর্মিতা হেতু তিনি আপ্লুত হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “হে মা! ক্রন্দন করো না। ধৈর্যধারণ করো। যেদিন সে ফিরে আসবে আপনার কোলে তখন শুধুমাত্র উত্তম জিনিস দেখতে পাবে। আমি তোমাকে তার আগমনের বার্তা দেবো। সে তো দুনিয়াকে বিজর্সন দিয়েছে। সে সত্যিকার তাওবাকারী- তাওবাতুন নাসুহার অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।”

বেশ কয়েকদিন পরে এক রাতে আহমদ ইয়াজিদ কোত্থেকে এসে হাজির হলেন হযরত সিররি সাক্বাতীর দরবারে। হযরত সিররি সাথে সাথেই তাঁর খাদিমকে বললেন, “ছুটে যাও। এক্ষুণি সেদিনের বৃদ্ধাকে গিয়ে বলো, তার আদুরে সন্তান ফিরে এসেছে।” তিনি এবার সম্মুখে উপস্থিত আহমদ ইয়াজিদের দিকে তাকালেন। তাঁর দেহ জরাজীর্ণ। কপোলে বিবর্ণের ছাপ। দীর্ঘকায় দেহখানায় একাধিক বক্রতা। তিনি যেনো এক নির্জীব নিস্ফলা কায়া! হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহকে একান্ত কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, “ইয়া শায়খী! আপনি যখন আমাকে প্রশান্তির দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন, তাহলে এবার আমাকে আরো দিকনির্দেশনা করুন। ... ”
উভয়ে বাক্যালাপ করাকালেই ইয়াজিদের মাতা এসে উপস্থিত হলেন। তার সাথে ছিলো ইয়াজিদের স্ত্রী ও ছোট পুত্র। আহমদ ইয়াজিদের ওপর যখনই মায়ের দৃষ্টি

পড়লো তখন তিনি চমকে ওঠলেন। এরূপ শুকনো জরাজীর্ণ কায়ায় তিনি তার সন্তানকে কখনও দেখেন নি। তিনি পুত্রকে বুকে জিড়য়ে ধরলেন। আহমদ ইয়াজিদের স্ত্রী এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখের অশ্রু ঝরাচ্ছেন। অপরপাশে পুত্রও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। এতে পরিবেশটাই ভারী হয়ে ওঠলো। হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহও নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাঁরও চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পুত্র তার পিতার পায়ে জড়িয়ে ধরলো। সবাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করলো ইয়াজিদকে বুঝাতে। নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে আকুল আবেদন জানালেন তার মাতা, স্ত্রী ও পুত্র। এমনকি শায়খ সাক্বাতীও আবদার জানালেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

আহমদ ইয়াজিদ হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “ইয়া ইমামুল মুসলিমীন! আপনি কেনো এদেরকে আমার আগমনের সংবাদ দিলেন? এখন দেখছি এরাই হবে আমার জন্য বিপদের কারণ।” হযরত সাক্বাতী বললেন, “হে আহমদ! তোমার মাতা বার বার আমাকে আকুতি-মিনতি করায় আমি তোমার সন্ধান দিতে তার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম।”

যা হোক, আহমদ ইয়াজিদ পুনরায় মরুভূমির দিকে যাত্রা করতে প্রস্তুতি নিলেন। মা, স্ত্রী ও পুত্রের অনেক আকুতি-মিনতি কাজে আসলো না। তার স্ত্রী বললেন, “আপনি জীবিত থাকতেই আমাকে বিধবা করলেন এবং নিজের সন্তানকে ইয়াতীম বানালেন। ছেলেটি যখন বার বার আপনার কথা জিজ্ঞেস করবে তখন আমি কী জবাব দেবো? অন্তত ছেলেটিকে সাথে করে নিয়ে যান। আহমদ জবাব দিলেন, “ঠিক আছে। আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি।” তিনি তখন ছেলের জামা ছিড়ে ফেললেন। তাকে পরালেন চামড়ার তৈরি কুর্তা। হাতে দিলেন একটি চামড়ার থলে। এরপর মা ও স্ত্রীকে বললেন, “এবার তোমরা চলে যাও।” স্ত্রী চিৎকার দিলেন, “আমি এসব আর সহ্য করতে পারছি না। তিনি ছেলেটিকে নিজের নিকট টেনে নিয়ে গেলেন। আহমদ বললেন, “আমার ব্যাপারেও তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। তুমি চাইলে আমাকে মুক্ত করে দিতে পারো।” এরপর তিনি শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

দীর্ঘদিন পর এক রাতে ইশার নামায শেষে এক ব্যক্তি হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় প্রবেশ করলেন। হযরতকে বললেন, “আহমদ ইয়াজিদ

আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমার অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাকে সাহায্য করার জন্য শায়খকে অনুরোধ জানাবে।”

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “চলো। আমাকে নিয়ে যাও আহমদের কাছে।” তিনি আহমদকে বাগদাদের বিখ্যাত সুনিজিয়া কবরস্থানে যেয়ে দেখতে পেলেন মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। তার জিহ্বা তখনো নড়াচড়া করছিলো। কি যেনো বলতে চাচ্ছেন। হযরত সাক্বাতী কান পেতে কথাগুলো শুনতে থাকেন: “এরূপ অবস্থার জন্য আমলকারীকে আমল করতে দাও।” হযরত সাক্বাতী আহমদের মাথা তুলে ধূলোবালি ঝেড়ে-মুছে তাঁর কোলে রাখলেন। আহমদ চোখ খুলে তাঁর প্রিয় শায়খের উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখতে থাকেন। ক্ষীণ সুরে বললেন, “অহ, আমার শায়খ! আপনি সময়মতো এসেছেন। আমার জীনবের ইতিক্ষণ উপস্থিত।” এরপর তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। হযরত সাক্বাতীর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

তখন ভোর হয়ে গেছে। হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ আহমদ ইয়াজিদের কাফন-দাফনের আয়োজন শুরু করেন। এসময় দেখতে পেলেন অসংখ্য মানুষ কবরস্থানের দিকে ছুটে আসছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছো?” তারা বললো, “ইয়া শায়খ! আপনি জানেন না, গত রাতে শহরের সকল মানুষ একটি গায়েবি আওয়াজ শুনেছেন: ‘যে কেউ আল্লাহর এক নির্বাচিত বন্ধুর জানাযায় শরীক হতে আগ্রহী সে যেনো সুনিজিয়া কবরস্থানে চলে যায়।’ এ গায়েবী সংবাদ শ্রবণ করে আমরা ছুটে এসেছি।”

তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা

১. হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ নিচের ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন:

“একদিন আমি হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহকে দেখতে যাই। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি জানতে চাইলাম, “কী হয়েছে শায়খ?” তিনি জবাব দিলেন, “আমার মধ্যে একটি বিশেষ চিন্তা জাগ্রত হয়েছে। আজ রাত আমি পানির জগটি টাঙ্গিয়ে রাখবো ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য। একটি স্বপ্ন দেখলাম, একজন হুর আমাকে এ কথাটি বলছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার সাথী? সে বললো, ‘আমি ঐ ব্যক্তির সাথী যে পানি ঠাণ্ডা করার জন্য জগ টাঙ্গিয়ে রাখে না। এর পর আমার টাঙ্গানো জগটি সে টেনে মাটিতে ফেলে দিলো। এই দ্যাখো সে জগটি!’ হযরত

জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি দেখলাম, জগের ভাঙ্গা টুকরোগুলো মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এই টুকরোগুলো সেখানে এভাবেই ছিলো।”

২. নিচের বর্ণনাটিও হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন:
“এক রাতে আমি শান্তিমতো ঘুমোচ্ছিলাম। জেগে ওঠার পর আমার গোপন আত্মা আমাকে নির্দেশ দিলো সুনিজিয়া কবরস্থানে যেতে। আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি উপস্থিত আছে। তাঁর চেহারা ভয়ঙ্কর। আমি ভয় পেলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, “হে জুনাইদ! তুমি কী আমাকে ভয় পাচ্ছো?”
জবাব দিলাম, “জী, ভয় পাচ্ছি।”
সে বললো, “তুমি যদি আল্লাহকে জানার মতো জানতে তাহলে একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে না।”
আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কে?”
জবাব দিলো, “ইবলিস!”
আমি বললাম, “আমি তোকে দেখতে চেয়েছিলাম।”
সে বললো, “যে মুহূর্তে তুমি আমাকে দেখেছো, সে মুহূর্তে নিজের অজান্তেই আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে। তুমি কেনো আমাকে দেখতে চেয়েছিলে?”
আমি বললাম, “আমি জানতে চাচ্ছি, ফকরদের [দুনিয়াবিমুখদের] ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা আছে কী না?”
সে বললো, “না!”
জিজ্ঞেস করলাম, “কেনো নয়?”
সে বললো, “আমি যখনই তাদেরকে দুনিয়াবী বিষয়ে জড়িয়ে দিতে চাই, তখনই তারা পরকালের দিকে পাড়ি জমায়। আর যখন আমি পরকালীন বিষয়ে তাদেরকে জব্দ করতে চাই তখনই তারা প্রভুর দরবারে ছুটে যায়। আর ওখান পর্যন্ত যাওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়।”
পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি যেহেতু তাদেরকে জব্দ করতে অপারগ, তুমি কী তাদের দেখতে পাও?”
সে জবাব দিলো, “আমি দেখতে পাই। যখন তারা সা’মায় যেয়ে ওয়াজদের [আধ্যাত্মিক পরমানন্দ] অবস্থায় পড়ে। আমি তাদের পরমানন্দ ও বিরহ-বেদনার চিৎকারের সূত্র দেখতে পাই।” একথা বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমি মসজিদের ভেতর প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম সেখানে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ হাটুর উপর মাথা রেখে [মুরাক্বাবার অবস্থায়] বসে আছেন। [আমি কিছু বলার পূর্বেই] তিনি আমাকে বললেন, "সে [ইবলিস] মিথ্যাবাদী! সে হচ্ছে আল্লাহর দুশমন।" মাথা উত্তোলন করে বলতে থাকেন, "তাঁরা [ফকরকারীরা] আল্লাহর নিকট এতো বেশি মূল্যবান যে, তাঁদেরকে তিনি কখনো ইবলিসকে দেখতে দেন না।"

৩. হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর একজন বোন ছিলেন। তিনি ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাইলেন: "আমাকে আপনার কক্ষটি ঝাড়ু দেওয়ার সুযোগ দিন।" হযরত সাক্বাতী এতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "আমার জীবন এতটুকু মূল্যবান নয়।"
একদিন তাঁর এ বোন হযরতের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা ঝাড়ু দিচ্ছেন। ভাইকে অভিযোগের সুরে বললেন, "আপনি নিজের বোনকে ঝাড়ু দিতে অনুমতি দিলেন না। এখন দেখছি একজন বেগানা বৃদ্ধাকে অনুমতি দিয়েছেন, যে আপনার পরিবারের কেউ নন?"
হযরত সিররি সাক্বাতী বোনকে বুঝিয়ে বললেন, "বোনটি আমার! রাগ করো না। এই মহিলা আমার প্রতি আসক্ত ছিলো, কিন্তু আমি তাকে আশ্রয় দিই নি। সে তখন আল্লাহর দরবারে আবদার জানালো, আমার কক্ষটি ঝাড়ু দেওয়ার অনুমতি চেয়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ কাজে নিয়োজিত হতে অনুমতি দান করেছেন।"

৪. একদিন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। লক্ষ করলেন রাস্তার পাশে মদ্যপ এক ব্যক্তি 'আল্লাহ! আল্লাহ!' বলছে। হযরত এগিয়ে গিয়ে তার মুখমণ্ডল ভালো করে ধুয়ে দিলেন। এরপর মন্তব্য করলেন, "লোকটি জানে না, অপিবিত্র মুখে সে সর্বাধিক পবিত্র নামটি উচ্চারণ করছে!" হযরত চলে যাওয়ার পর মদ্যপ লোকটির হুশ ফিরে আসলো। উপস্থিত লোকজন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর হাতে তার মুখমণ্ডল ধৌত করার ব্যাপারটি তাকে বললো। সে লজ্জিত হলো। নিজের নফসকে সে ধিক্বার দিতে লাগলো। বললো, "হে আমার দুষ্ট নির্লজ্জ নফস! হযরত সিররি সাক্বাতী তোকে মদ্যপ অবস্থায় দেখে গেছেন। এবার তুই আল্লাহকে ভয় ও তাওবাহ কর!" সুতরাং সে মদপানের নেশা ছেড়ে ইবাদতের নেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।

এদিকে ঐদিন রাতে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ একটি গায়েবি আওয়াজ শ্রবণ করলেন:

"তুমি আমার সম্মানে তার মুখমণ্ডল ধুয়ে দিয়েছো।
আর আমি তার অন্তরকে ধুয়ে দিয়েছি তোমার সম্মানে।"

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর চরিত্র-মাধুর্য

তিনি ছিলেন আহলে তাসাওউফের ইমাম। শরীয়ত ও তরিকতের ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। এতো বড় মাফের জ্ঞানবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো অনন্যসাধারণ।

মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-মুহাব্বাতের উপমা পাওয়া যায় সমসাময়িক ওলিআল্লাহ হযরত বিশরে হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেন, "আমি কখনো কারোর নিকট থেকে কোনোকিছু চাইতাম না। তবে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আবদার জানাতাম। কারণ আমি জানতাম তিনি হচ্ছেন উচ্চমানের একজন পরগেজগার ওলিআল্লাহ এবং দাতা।"

ইবাদত

কথিত আছে, হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ দৈনিক এক হাজার রাকাআত নফল নামায পড়তেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হযরত সাক্বাতীর মতো বড়ো কোনো আবিদ [উপসনাকারী] ও জাহিদ [কঠোর সাধক] দেখি নি। তাঁর দীর্ঘ জীবনভর নিজের মধ্যে ইবাদত ও জুহদের মাক্বাম সমুন্নত ছিলো। এমনকি ৯৮ বছর বয়সেও তিনি ক্ষান্ত হন নি। যে সময় এগুলোর সমাপ্তি ঘটে তা ছিলো হযরতের মৃত্যুর ক্ষণটি।"

সবর অবলম্বনের ব্যাখ্যা

একদিন হযরত সিররি সাক্বাতীর একজন মুরিদ প্রশ্ন করলেন, "ইয়া শায়খী! আমাদেরকে সবর সম্পর্কে উপদেশ দিন।" হযরত সাক্বাতী সবরের ওপর বেশ দীর্ঘ আলোচনায় নিমগ্ন হলেন। এক পর্যায়ে দেখা গেলো একটি বিচ্ছু এসে তাঁর পায়ে কামড়াতে লাগলো। তিনি সম্পূর্ণ অনড় থেকে বয়ান অব্যাহত রাখলেন। একজন মুরিদ বললেন, "হযরত! একটা বিচ্ছু আপনার পায়ে কামড় দিচ্ছে। এটিকে সরিয়ে

দিন!” তিনি বললেন, “আমি সবর সম্পর্কে বয়ান করছি, সুতরাং কীভাবে এ কাজটি করি?”

উপদেশমূলক বাণী

১. তিনি বলেন, “সত্যিকার মা’রিফাতলাভকারী তাওহীদের মধ্যে অবস্থান করেন।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বাধিক বড়ো শাস্তি হচ্ছে, বান্দাকে তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত রাখা।

৩. তিনি দুআ করতেন, “হে আল্লাহ! যাকিছু শাস্তি আপনি আমাকে দেন না কোনো আমি মাথা পেতে গ্রহণ করতে রাজী। কিন্তু দয়া করে আমার থেকে আপনি পর্দার আড়ালে থাকার শাস্তি দিয়ে বেইজ্জত করবেন না।”

৪. যুবক বয়সে তিনি বলতেন, “যুবক অবস্থায় আল্লাহর উপসনায় লেগে থাকো।”

৫. ঐসব ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাগ করো যে ধনী প্রতিবেশী, ধনী বুদ্ধিজীবী ও কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণকারী।

৬. সমগ্র পৃথিবী মূল্যহীন শুধুমাত্র ৫টি জিনিস ছাড়া: (১) বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাবার, (২) পিপাসা নিবারণের জন্য পানি, (৩) শরীর ঢাকার জন্য বস্ত্র [সতর], (৪) থাকার জন্য কুঠির ও (৫) নেক আমলের জন্য যথেষ্ট জ্ঞান।

৭. প্রয়োজনের তাগিদে গোনাহের কাজ ক্ষমাযোগ্য হতে পারে। কিন্তু আত্ম-গরিমা ও ফখর ক্ষমার অযোগ্য। এগুলো পরিত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই।

৮. যে কেউ নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সে কীভাবে অপরের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে? [অর্থাৎ নফসের তাবেদার পীর তাঁর মুরীদের কোনো উপকার করতে পারেন না। -গ্রন্থকার]

৯. ঐশি নৈকট্যশীলতার মাত্রাই নির্ধারণ করে আধ্যাত্মিক ফিরাসাতের [ধীশক্তির] স্তর।

১০. যে কেউ পবিত্র কুরআনের রহস্য সম্পর্কে ধ্যান-ফিকির করে, সে-ই হাক্বিক্বাতের প্রাজ্ঞতা লাভে ধন্য হতে পারে।

১১. আ’রিফের আধ্যাত্মিক স্তর উন্নত। তিনি অল্প খাবার ভক্ষণ করেন, অল্প নিদ্রা যান ও অল্প বিশ্রাম করেন। তিনি হচ্ছেন, রাতের উজ্জ্বল চাঁদের মতো। যার থেকে জ্যোৎসার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নূর মানুষকে দেখায় সীরাতুল মুস্তাক্বীম। ভাগ্যবান হৃদয়ে এ আলো যেনো নতুন জীবনের পানীয়।

১২. তাঁর [আল্লাহর] মধ্যে ফানার মাধ্যমে আ’রিফ প্রশান্ত হন।

১৩. সর্বাধিক উত্তম আচরণ হলো মানুষের নিপীড়নকে ধৈর্যসহ্য মুকাবিলা করা। অন্যায়কারীর মতো নিজেও তার প্রতি অন্যায় না করা।

১৪. আমি দৈনিক অনেকবার নিজের নাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমার ভয় হয় মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় কী না।

১৫. সকল মানুষের দুঃখকষ্ট নিজে বহন করতে আমি ইচ্ছে পোষাণ করি।

১৬. যে কেউ আল্লাহর আনুগত্য করে ইখলাসের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্ব তার প্রতি আনুগত্যশীল হবে।

১৭. জিহ্বা ও চেহারা হৃদয়ের অবস্থা উন্মোচন করে। তবে হৃদয় হচ্ছে তিন ধরনের: (১) প্রথমটি যেনো একটি বড়ো পর্বত যা সম্পূর্ণ ধীর-স্থির। (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৃক্ষের মতো যার মূল শক্ত হলেও কাণ্ড, ডাল-পালা ও পত্রগুলো বাতাসে আন্দোলন করে। (৩) তৃতীয়টি হচ্ছে পাখিদের মতো যা আকাশে এদিক-সেদিক উড়ে চলে।

১৮. সিদক্ব [সত্যবাদিতা] ঐ ব্যক্তি অর্জন করে না, যে মানুষের সঙ্গে অতিবেশি মেলামেলা করে।

১৯. আল্লাহর একান্ত নৈকট্যশীল ক্ষণে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই বলতেন, “হে আল্লাহ! আপনার মাহাত্ম্য আমাকে যাচঞা থেকে বিরত রেখেছে। আপনার মা’রিফাত আমাকে নৈকট্যের মর্যাদা দান করেছে ও জিহ্বা দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনায় অপারগতা সৃষ্টি করেছে। আমি কখনো চেষ্টা করবো না জিহ্বা দ্বারা আপনার গুণগাণ করতে! কারণ আপনার মহান ও অসীম গুণাবলী প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার জিহ্বায় নেই।”

২০. যে কেউ প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাউকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তা’আলা খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।

২১. তিনি একদা বললেন, “মানুষের শান্তির মূলে আছে ৫টি বিষয়: (১) দুষ্ট লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা। (২) ভালো লোকের সঙ্গ লাভ করা। (৩) সাধারণ মানুষ থেকে পারতপক্ষে দূরে থাকা। (৪) নিজের আমলের প্রতি খেয়াল রাখা। (৫) অপরের দোষত্রুতি অন্বেষণ থেকে বিরত থাকা।” তিনি আরো বললেন, “মানুষকে ৫টি নাফসানী রোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। এগুলোর চিকিৎসক হচ্ছেন কামিল পীর। (১) মুনাফিকী, (২) ঝগড়া-ফাসাদ, (৩) শাহওয়াত [অবৈধ যৌনাকর্ষণ], (৪) লোকদেখানো আমল বা দর্শনেচ্ছু ও (৫) প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনোলোভ।” আরো বললেন, “৫টি বিষয় থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়া চাই: (১) কৃপণতা, (২) উচ্চাকাঙ্ক্ষা, (৩) রাগ-গোস্বা, (৪) লালসা ও (৫) অতিভক্ষণ।”

২৯. হযরতের প্রধান খলিফা জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ একদিন ভোরে তাঁকে দেখতে গেলেন। হযরত বললেন, "আবুল ক্বাসিম! আজ আমাকে কিছুটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার আত্মাকে বলা হলো, 'হে সিররি! আমি মানুষকে সৃষ্টি করার পর তারা আমার দিকে ধাবমান ছিলো। তারা আমার দিকে আসছিলো। আমি যখন তাদেরকে দুনিয়া দেখালাম, তখন দশ জনের নয় জনই দুনিয়ামুখী হয়ে গেলো। দশ জনের একজন মাত্র আমার সঙ্গে রইলো। এরই [যে দশ জনের একজন আল্লাহর সঙ্গে রইলো- সেই দলের] মধ্যে তাদেরকে যখন আমি বেহেশতের কথা বললাম, তখন দশ জনের ১ জন আমার সঙ্গে রইলো আর বাকীরা বেহেশত লাভের আশায় নিমগ্ন হলো। যখন আমি [যে একজন আল্লাহর সাথী -সেই দলের] সকলের ওপর কিছুটা দুঃখ-ক্লেশ-যাতনা [পরীক্ষা করতে] আপতিত করলাম তখন দশ জনের একজন কষ্ট সহ্য করেও [পরীক্ষায় পাশ করে] আমার সঙ্গে থাকলো আর বাকিরা অধৈয্য হয়ে দূরে সরে পড়লো। আমি তখন [এখনও] সঙ্গে থাকা সাথীদের বললাম, "তোমরা না দুনিয়াকে চেয়েছো না চেয়েছো বেহেশত। না তোমরা আমার থেকে পতিত [পরীক্ষাস্বরূপ] ক্লেশ-কষ্ট থেকে পালিয়ে গিয়েছো। তোমরা কী চাও?" তারা বললো, "আপনি জানেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা কী?" আমি বললাম, "আমি তোমাদের উপর এমন ভারী বিপদ-বিপর্যয় পতিত করবো যে, এর ভর পাহাড়-পর্বতও বহন করতে পারবে না।" তারা জবাব দিলো, "হে প্রভু! যদি তা একমাত্র তোমার পক্ষ থেকে আসে তাহলে আমরা তা মাথাপেতে বরণ করবো!" [এ দলটিই হচ্ছেন মহাত্ম আউলিয়ায়ে কিরাম- গ্রন্থকার।]

মৃত্যুকালীন অবস্থা

হযরত সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর প্রধান খলিফা ও ভাগিনা যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, "হযরত সিররি সাক্বাতী যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমি তাঁকে দেখতে যাই। তাঁর নিকটেই একটি পাখা ছিলো। আমি সেটি হাতে নিয়ে তাঁকে বাতাস দিতে থাকি। তিনি তখন বললেন, "হে জুনাইদ! পাখাটি রেখে দাও। আগুন বাতাস থেকেও শক্তিশালী।" আমি তাঁর অবস্থা জানতে চাইলাম। এরপর বললাম, 'আমাকে নসিহত করুন।' তিনি বললেন, "মানুষের সংসর্গ হেতু আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দেবে না।" এর পরই তিনি এ মায়াবী পৃথিবী থেকে চলে গেলেন তাঁর প্রভুর দরবারে।" ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হিজরি ২৫৩ সনে তিনি

ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ মহান ওলির মাক্বামাতকে উন্নত করুন। সংরক্ষণ করুন তাঁর গোপন রহস্যাবলী।

ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকানুযায়ী হযরত সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন আমরা এ মহাত্মন ওলিআল্লাহর জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো। হে প্রভু! আমরা আপনার পক্ষ থেকে তাওফিক কামনা করছি। আপনার ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া একটি অক্ষরও লেখার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হযরত শায়খ আবুল ক্বসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু - ২৯৮ হিজরি, সমাধি - বাগদাদ, ইরাক)

মহাত্মন এই যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহর পূর্ণ নাম হলো আবুল ক্বাসিম জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ খাজ্জাজ নাহাওয়ান্দী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর পিতা হযরত মুহাম্মদ খাজ্জাজ ছিলেন কাচ ব্যবসায়ী। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর ভাগিনা ছিলেন। তিনি হযরত হারিস মুহাসিবী রাহিমাহুল্লাহর সাথী এবং অন্যান্য সমসাময়িক ওলিদের শায়খ ছিলেন। হযরত বিশরে হাফি, হযরত আবু বকর শিবলী, হযরত মনসুর হাল্লাজ প্রমুখ বিখ্যাত ওলিগণ তাঁরই যুগে বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সুফিকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর উপাধি ছিলো, “সাঈদুত তায়িফা” [সুফি-দরবেশ দলের নেতা]। তিনি বাগদাদে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন এবং এখানেই ইন্তিকাল করেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম সন নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য আছে। তিনি যে ২১০ থেকে ২১৫ হিজরি সনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে তাঁর মৃত্যুসন যে ২৯৮ হিজরি তা অনেকটা নিশ্চিত। হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক স্ব-প্রণীত ওলিদের জীবনীগ্রন্থ ‘তাজকিরাতুল আউলিয়া’য় লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর জন্ম বাগাদাদে হলেও তাঁর পূর্বপূরুষ ছিলেন পারস্য অধিবাসী। আধুনিক যুগের ইরানের নিহাওয়ান্দ ছিলো তাঁদের বাসস্থান। অল্প বয়সে পিতৃহারা ইয়াতীম জুনাইদকে স্বীয় মামা হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ লালন-পালন করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু সওর, হযরত আবু উবাইদ, হযরত হারিস মুহাসিবী এবং তাঁর মামা সিররি ইবনে মুগাল্লিস সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর ফিকাহ ও হাদিস শাস্ত্রের উস্তাদ ছিলেন হযরত হারিস মুহাসিবী রাহিমাহুল্লাহ। কথিত আছে জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ এ উস্তাদের নিকট পাঠ

গ্রহণে যাত্রার সময় স্বীয় মামা সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ উপদেশ দেন, “যাও! তাঁর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো, আল্লাহ তোমাকে একজন ফকীহ সুফিতে পরিণত করুন, সুফি ফকীহতে নয়।”

তাসাওউফের উস্তাদবৃন্দ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর তাসাওউফ শাস্ত্রের একাধিক উস্তাদ ছিলেন। অবশ্য সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন স্বীয় মামা ও মুর্শিদ হযরত সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আরো যাঁদের সুহবত থেকে তিনি উপকৃত হন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন: হযরত আবু আবদুল্লাহ হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২৪৩ হিজরি], হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ আলী কাসসাব রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২৭৫ হিজরি], আবু জাফর কারানবী বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম [মৃ. ২৬০ হিজরি], আবু হাফস আমর ইবনে সালামা হাদ্দাদ নিশাপুরী [মৃ. ২৬০ হিজরি], আবু জাফর ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ ইবনে জাফর রাজী [মৃ. ২৫৮ হিজরি] ও আবু ইয়াক্বুব ইউসুফ বিন হুসাইন ইবনে আলী রাজী [৩০৪ হিজরি]।[২২]

অল্প বয়সে প্রভুপ্রেমের আকর্ষণ

হযরত জুনাইদ যখন বালক মাত্র তখনই প্রভুপ্রেমের বিরহ-যন্ত্রণা অনুভব করেন। এরপরও তিনি খুব সহজে ও দ্রুত যে কোনো বিষয়ের মর্মার্থ অনুধাবক করতে পারতেন। এছাড়া ছোট থেকেই তিনি অত্যন্ত শাণিত ও উজ্জ্বল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর মামা হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। বালক জুনাইদের মধ্যে যে উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান তা তাঁর উচ্চ ফিরাসাতের অধিকারী মামা সহজেই অনুধাবন করেছিলেন।

বাল্যকালীন হজ্জপালন

নিজের তত্ত্বাবধানে থাকা এ মূল্যবান রত্ন জুনাইদকে নিয়ে হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ পবিত্র হজ্জ পালনে মক্কা মুকাররমায় ভ্রমণে যান। তখন জুনাইদের বয়স মাত্র ৭ বছর। হজ্জ পালন শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় যেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু

---

[২২] The Life, Personality and Writings of Al-Junayd by Ali Hassan Abdul Kadir, Islamic Book Trust 2013.

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের নিকট দাঁড়িয়ে বালক জুনাইদ ভক্তিভরে সালাম পেশ করেন। একদিন মসজিদে নববীতে প্রায় ৪ শত শায়খ জমায়েত হলেন। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে 'শুকুর' এর সংজ্ঞার ওপর বক্তারা বিভিন্ন মতামত দিতে থাকেন। সবাই নিজ নিজ অভিমত পেশ করার পর হযরত সিররি সাক্বাতী ৭ বছর বয়সের ভাগিনা জুনাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা জুনাইদ! শুকুর সম্পর্কে তোমার মতামত কী বলো?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে প্রথমে বালক জুনাইদ লজ্জাবোধ করলেন। উপস্থিত অন্যান্য এক-দু'জন শায়খ তাঁকে অভয় দান করে বললেন, "বলো, তুমি কী মনে করো? আমরা নিরবে শুনবো। ভয় করো না।"

হযরত জুনাইদ সাহস সঞ্চার করে বললেন, "সত্যিকার শুকুর হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত অসংখ্য যেসব নিয়ামত আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলোর দ্বারা আপনি তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হবেন না। না আপনি তাঁর দয়ার দানসমূহকে নাফরমানীর সূত্রে পরিণত করবেন।" এ কথাটি শ্রবণ করে সবাই একযোগে বললেন, "শুকুরের সংজ্ঞা এর চেয়েও উন্নতমানের হতে পারে না!" হযরত সিরসি সাক্বাতী জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভাগিনা! তুমি এসব কোত্থেকে শিখলে?" তিনি জবাব দিলেন, "আপনার সুহবতে বসে!"[২৩]

আধ্যাত্মিক ভ্রমণ

পবিত্র হারামাইন শরিফাইন ভ্রমণ শেষে বাগদাদে ফিরে এসে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ দ্বীন শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। তবে এ অল্প বয়সেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন ইবাদত-বন্দেগী করে। অন্যান্য সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধূলায় মেতে ওঠতে তিনি আনন্দবোধ করতেন না। প্রায়শই দেখা যেতো, স্বীয় অভিভাবক মামার বাড়ির একটি কক্ষে বসে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছেন। জাগতিক বিষয়-আশয় তাঁর পীড়া দিতো। তাই এসব থেকে দূরে সরে থাকতে ভালোবাসতেন।

[২৩] তাজকিরাতুল আউলিয়া, হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ।

পরিণত বয়সে তিনি কাচ বিক্রির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। এরপরও ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-ফিকির থেকে তিনি একেবারেই গাফিল হন নি। হযরত মুহাম্মদ আবদুল হক আনসারী হযরত জুনাইদ বাগদাদীর উদ্ধৃতি দিতে যেয়ে লিখেছেন, "আল্লাহর বান্দাকে বর্জন করতে হবে স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষাকে, মুছে দিতে হবে মানবিক গুণাবলীকে, পরিত্যাগ করতে হবে স্বার্থপর প্রবৃত্তিকে, আবাদ করতে হবে আধ্যাত্মিক গুণাবলী, অনুরক্ত হতে হবে হাক্বিক্বাতের জ্ঞানের প্রতি, চিরন্তন জীবনের জন্য উপকারী আমল করতে হবে, উত্তম কামনা করতে হবে সমগ্র উম্মাহর জন্য, আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ভরসা রাখতে হবে, আর শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে।"[২৪]

মহাত্মন ওলিআল্লাহ ও নিজের মামা হযরত সিররি সাক্বাতীর হাতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ অল্প বয়সেই বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ ৪০ বছর তাঁরই সুহবতে থেকে কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা-জুহদ-খিলওয়াত-জিকির ইত্যাদি আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলার সুদৃষ্টির ফলে আধ্যাত্মিক সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হন। তিনি পরবর্তীতে বলেন, "দীর্ঘদিন সাধনার পর একদা আমি ভাবলাম, এবার বুঝি কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে উপনিত হয়ে গেছি। সাথে সাথে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ইলহাম হলো: 'জুনাইদ! এখন আমার সময় হয়েছে তোমাকে তোমার কোমরবন্দ [অমুসলিমদের পরিচিতির জন্য সে যুগে ব্যবহৃত কোমরবন্ধ] উন্মোচন করে দেখানো!' একথা শ্রবণ করে আমি অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "হে প্রভু! জুনাইদ কোন্ পাপটি করলো?" শুনতে পেলাম এই কথাটি: 'নিজের অস্তিত্ব থাকার মতো কঠিন কোনো পাপ আছে বলে তুমি মনে করো কী?' তিনি আরো বলেন, "আমি সাথে সাথে মাথানত করলাম। নিজে নিজেই মৃদু স্বরে বললাম, যে কেউ আল্লাহর মধ্যে ফানার যোগ্যতা লাভ করে নি, তার সকল ভালো আমল মূল্যহীন!"

যুগের অনেক বাহ্যিক আলিম ও হিংসুক দ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দুকরা স্বয়ং খলিফার নিকট সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত অভিযোগ উত্তাপন করে।

[২৪] Ansari, Muhammad Abdul Haq. "The Doctrine of One Actor: Junaid's View of Tawhid." The Muslim World 1(1983): 33–56. Electronic. Source: en.wikipedia.org/

তবে খলিফা তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন: "কোনো প্রমাণ ছাড়া তাঁকে বলপূর্বক বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।"

তারা বললো, "তাঁর কথা ও উপদেশ দ্বারা অনেক লোক বিভ্রান্ত হচ্ছে।"

খলিফা তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন এক পরমাসুন্দরী তরুণী খাদিমাহ হিসেবে। এই মেয়েটিকে তিনি ৩ হাজার দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। খলিফা ক্রীতদাসী মেয়েকে বললেন, "খুব উত্তম ও মনোমুগদ্ধকর বস্ত্র ও অলঙ্কার পরে সাজগোজ করো। এরপর অমুক জায়াগায় চলে যাও। হযরত জুনাইদ বাগদাদীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের মুখের পর্দা উন্মোচন করবে। নিজের বাহার প্রদর্শন শেষে তাঁকে বলবে, "আমি অনেক সম্পদের মলিকা। কিন্তু আমার অন্তর দুনিয়াদারিত্বের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে। আমি আপনার দরবারে এসেছি যাতে আপনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন এবং গ্রহণ করে নেবেন। আমি বাকি জীবন আপনার খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করবো আল্লাহর ওয়াস্তে। আমার অশান্ত হৃদয় আপনি ছাড়া কারোর নিকট শান্তি খুজে পাচ্ছে না।" এরূপ বলে নিজেকে খোলামনে প্রদর্শন করতে থাকবে। যাকিছু সম্ভব তা-ই করেও তাঁকে প্ররোচিত করবে।"

তরুণী একজন পুরুষ ভৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর নিকট উপস্থিত হলো। উপরে উল্লেখিত নির্দেশনা মুতাবিক সবকিছু বললো। যে কোনো মানুষ সামনে আসলে সম্ভাবতই দৃষ্টি পড়ে। এভাবে দৃষ্টি পড়লো তরুণীর প্রতি হযরত জুনাইদের। তিনি দৃষ্টি সরে নিয়ে নিরব রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না। তরুণী তার আবদার পুনরায় ব্যক্ত করলো। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ উপরের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন। এরপর "আহ!" বলে একটি শ্বাস তরুণীর দিকে ছুড়ে দিলেন। সাথে সাথে তরুণী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণ পরই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

দাসীর সঙ্গী ভৃত্য খলিফার নিকট দ্রুত ফিরে এসে যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিলো। মনে হলো খলিফার অন্তরে আগুন লেগেছে! তিনি কতো বড়ো পাপ করেছেন তা অনুধাবন করে বার বার তাওবাহ করতে লাগলেন। নিজে নিজেই বলতে থাকেন: "যে কেউ অপরের প্রতি আচরণ করে যা করা উচিৎ নয়, দর্শন করে যা সে দেখার

কথা নয়।” আরো বললেন, “এরূপ মহাত্মন ব্যক্তিকে আমার নিকট ডেকে পাঠানো বে-আদবি হবে।” তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে চললেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বার দিকে।

খলিফা হযরত বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম জানিয়ে বললেন, “ইয়া শায়খ! আপনার অন্তর এরূপ একটি সুন্দরী নারীকে ধ্বংস করে দিতে কীভাবে রাজী হলো?”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, “হে আমীরুল মু’মিনীন! নিন্দুকদের প্রতি আপনার দয়ার মাত্রা এতোই বেশি হয়ে গেলো যে, তাঁদের কিছু অভিযোগের বদলা হিসেবে আমার চল্লিশ বছরের সাধনাকে ধূলিস্মাৎ করতে উদ্যোত হলেন! কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি কে বিচার করার? আপনিও যে অনুরূপভাবে ধরাশায়ী হতে পারেন, তার কী কোনো নিশ্চয়তা আছে?” খলিফার মাথা নিম্নমুখী হয়ে পড়লো। বার বার ক্ষমা চেয়ে হযরতের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।[২৫]

এ ঘটনার পর তাঁর সুনাম দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শরীয়ত ও তরীকতের উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জনসমক্ষে ওয়াজ-নসিহত করা থেকে বিরত থাকেন। মানুষ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবে ভেবে একদা যুগের ৩০ জন বিশিষ্ট ওলিআল্লাহ তাঁকে ওয়াজ-নসিহত করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি বললেন, “আমার শায়খ [হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ] জীবিত থাকতে ওয়াজ-নসিহত করা ভীষণ বে-আদবি হবে।”

এরপর একদিন স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন: “হে জুনাইদ: তুমি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান

---

[২৫] হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর জীবদ্দশায় [৮২৫-৯১০ ঈসায়ী] বাগদাদের মসনদে যে কজন আব্বাসী খলিফা উধিষ্ঠিত ছিলেন তারা হলেন: আল-মামুন [৮১৩-৮৩৩], আল-মু’তাসিম বিল্লাহ [৮৩৩-৮৪২], আল-ওয়াসিক্ব বিল্লাহ [৮৪২-৮৪৭], আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ [৮৪৭-৮৬১], আল-মুনতাসির বিল্লাহ [৮৬১-৮৬২], আল-মুসতা’ইন বিল্লাহ [৮৬২-৮৬৬], আল-মু’তাজ বিল্লাহ [৮৬৬-৮৬৯], আল-মুহতাদি বিল্লাহ [৮৬৯-৮৭০], আল-মু’তামিদ আলাল্লাহ [৮৭০-৮৯২], আল-মু’তাদিদ বিল্লাহ [৮৯২-৯০২], আল-মুকতাফি বিল্লাহ [৯০২-৯০৮] এবং আল-মুক্বতাদির বিল্লাহ [৯০৮-৯২৯]। উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর বয়স উল্লেখ করেন নি। তবে যদি আমরা ধরে নিই হযরতের বয়স চল্লিশ বা এর উপরে ছিলো, তাহলে যে খলিফা এ ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত তিনি মুসতা’ইন বিল্লাহ থেকে মুক্বতাদির বিল্লাহ পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তি হতে পারেন। সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ ত’আলা জ্ঞাত। - গ্রন্থকার।

জানাও।” ভোর জেগে ওঠে তিনি চলে গেলেন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর সম্মুখে। শায়খ তখন একটি দরোজার সামনে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি তাঁর খলিফাকে দেখে বললেন, “এ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষায় ছিলে কেউ তোমাকে নির্দেশ না দিলে জনসমক্ষে ওয়াজ করবে না। এবার তো নির্দেশ পেলে! সুতরাং ওয়াজ করো- কারণ তোমার বয়ান দ্বারা সমগ্র বিশ্ব বহুদিন যাবৎ উপকৃত হবে। খুঁজে পাবে পথভ্রষ্ট মানুষ সীরাতুল মুস্তাক্বিম। তবে তোমার মুরিদান যখন তোমাকে নসিহত করার অনুরোধ জানিয়েছে তখন তুমি কিছু বলো নি, বাগদাদের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম অনুরোধ করেছেন, তখনও তুমি রাজী হও নি, এমনকি আমার অনুরোধেও তুমি ওয়াজ করতে নারাজ ছিলে। এবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তোমাকে বয়ান করতেই হবে।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ অবাক হয়ে বললেন, “আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন! ইয়া শায়খী! আপনি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার স্বপ্নযোগে জিয়ারতের সংবাদ জানলেন কী করে?”

সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন, “আমি স্বপ্নযোগে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভ করেছি। তিনি আমাকে জানালেন, ‘আমি আমার রাসূলকে পাঠিয়েছি, জুনাইদকে বলো- সে যেনো মিম্বরে বসে মানুষকে নসিহত করে।”

এবার হযরত জুনাইদের অন্তরাত্মায় ইশকে ইলাহীর স্পর্শ লাগলো। রোমাঞ্চকর শিহরণে যেনো ভিজে গেলো তাঁর তনু-মন-প্রাণ প্রেমাগ্নির উষ্ণতা ও অনুরাগের শীতল সুধার মিশ্রণে। তিনি বলে ওঠলেন, “আমি কথা বলবো- বলবো, তবে একটি শর্ত আছে হযরত! তাহলো আমার শ্রোতাদের সংখ্যা চল্লিশের বেশি হবে না।”

লেখক হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ খুব বেশি গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে তাঁর রচিত নিচের কটি কিতাব সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। এগুলো হলো:

১. কিতবুল আমছালুল কুরআন।

২. কিতাবুর রাসাঈল।

৩. শরহে শাতিয়াত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী।

৪. আল-মুনাজাত।

৫. তাশিহুল ইদারা।

জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর বয়ান

১. ইশকের প্রাবল্য: শর্ত মুতাবিক এক ওয়াজ মাহফিলে ৪০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে হযরত বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর এদিনকার বয়ানে ‘ইশকে ইলাহীর’ প্রভাব এতোই বেশি ছিলো যে, বয়ানের সময় ১৮ ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং আরো ২২ জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এদেরকে মানুষ কাঁধে তুলে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছুয়ে দেয়।[২৬]

২. সাধনার উপমা: এক বয়ানে তিনি বলেন, “দীর্ঘ ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে নিজের ক্বলবের প্রতি পাহারাদার হিসেবে। এরপর আরো দশ বছর চলে যায় যখন আমার ক্বলব আমাকে পাহারা দেয়। আর এ পর্যন্ত বিশ বছর গত হয়ে গেছে, আমি নিজের ক্বলব সম্পর্কে কিছুই জানি না এবং ক্বলবও আমার সম্পর্কে কিছু জানে না।” এরপর আবার বললেন, “ত্রিশ বছরব্যাপী আল্লাহ জুনাইদের সঙ্গে কথা বলেছেন জুনাইদের জিহ্বা ব্যবহার করে। তখন জুনাইদ সেখানে ছিলোই না- না এ ব্যাপারে কোনো মানুষ অবগত ছিলো।”

৩. আল্লাহর নূরে অবলোকন: একদিন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ জামে মসজিদের মিম্বরে বসে ওয়াজ-নসিহত করছিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন যুবক এগিয়ে এসে হযরতকে বললো, “রাসূলুল্লাহর হাদিস শরীফে আছে, ‘ঈমানদারের অন্তরের ব্যাপারে শতর্ক থেকো। কারণ সে আল্লাহর নূরে দেখতে পায়।”

হযরত জুনাইদ যুবকের দিকে ক্ষণকাল তাকালেন। এরপর বললেন, “এরূপ ফিরাসাত [অন্তরর্দৃষ্টি] লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে তোমাকে মুসলমান হতে হবে। সুতরাং, হে যুবক! তুমি তোমার খ্রিস্টান কোমরবন্ধ কেটে ফেলো! এখন হচ্ছে মুসলমানদের যুগ।”

---

[২৬] Sells, Michael A.. Early Islamic Mysticism: Sufi, Koran, Mi'raj, Poetic and Theological Writings. Mahwah, New Jersey: Paulist Press, 1996. ফরিদুদ্দীন আত্তার [রা.]- তাজকিরাতুল আউলিয়া।

হযরতের এ বক্তব্যের পরই সবাই দেখলো যুবকটি আবেগপ্রবণ অবস্থায় হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পদতলে যেয়ে বসে বললো, "খ্রিস্টবাদের সকল বিশ্বাস এ মুহূর্তে আমার অন্তর থেকে মুছে গেছে। হযরত! অনুগ্রহ করে আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন।" সে তার জুব্বার নিচে পরিহিত কোমরবন্ধ খুলে ফেললো।

ওয়াজ-নসিহতের সাময়িক সমাপ্তি ও শুরু

বেশ কিছুদিন ওয়াজ-নসিহত শেষে মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুললো। এর মূল কারণ ছিলো, শরীয়ত ও তাসাউফের ওপর তাঁর সূক্ষ্ম ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এবং বিশেষকরে খোদাপ্রেমের উচ্চমার্গের কথাবার্তা অধিকাংশ মানুষের জন্য বোধ ও অনুধাবনের বাইরে ছিলো। তারা তাঁর কথার মর্মার্থ সঠিকভাবে গলদ্দকরণ করতে পারতো না। সুতরাং হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ ওয়াজ-নসিহত ছেড়ে দিলেন। তিনি স্বীয় খানক্বায় যেয়ে অবসর নেন। তবে সঙ্গী-সাথী যুগের উলামা ও সুফি-দরবেশগণ পুনরায় ওয়াজ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। তিনি জবাব দেন, "দেখুন, আমি আভ্যন্তরীণভাবে পরিতৃপ্ত আছি। আমি তো আর আমার নিজের ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট হতে পারি না!"

কিছুদিন পরই কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাপ্রোণিদিত হয়ে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং ওয়াজ-নসিহতে পুনরায় লেগে যান। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "এরূপ করার মধ্যে রহস্যটা কী?" জবাবে তিনি বললেন, "আমি একটি হাদিস পাঠ করেছি। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শেষ যুগে মানুষের ভাষ্যকার হবে ঐ ব্যক্তি যে হচ্ছে উম্মার মধ্যে সর্বাপেক্ষ নিকৃষ্ট। সে সবাইকে নসিহত করবে।' আমি জানি আমিই হচ্ছি মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্য আমি ওয়াজ-নসিহত করছি, আমি তো আর রাসূলুল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পারি না।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর দুআ

তিনি দুআ করতেন: "হে আল্লাহ! আমার যেসব আমল দ্বারা আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমি সেগুলো থেকে বাঁচতে আপনারই আশ্রয় কামনা করি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবদার জানাচ্ছি, আমাকে দান করুন বিশুদ্ধ হালাল- জরুরি খাবার ও পানীয়। হে প্রভু! আমাকে এতোই ব্যস্ত করবেন না যার ফলে আমি ওদের সাথে সামিল হয়ে যাই যারা আপনার জিকির থেকে গাফিল। হে আল্লাহ! আপনার

সন্তুষ্টি লাভের জন্য যোগ্য বান্দাহ হিসেবে আমাকে যোগ্যতা দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার বান্দাহ্ হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন একমাত্র আপনার প্রতি ভালোবাসা দ্বারা। হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়কে আপনার প্রেমের ছোঁয়া দ্বারা সিক্ত করুন। আমার জিহ্বাকে আপনার জিকির দ্বারা পবিত্র করুন। আমার হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আপনার সন্তুষ্টির অনুকুলে পরিচালনা করুন। হে আল্লাহ্ আমার থেকে সকল স্মরণশক্তি, স্মৃতি ও অনুভুতি মুছে ফেলুন যা আপনার সন্তুষ্টির কারণ নয়।”

বিভিন্ন ঘটনা

১. খ্রিস্টান ডাক্তার মুসলমান হওয়া: একদিন হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর চোখে ব্যথা পেলো। একজন ডাক্তার আসলেন। পরীক্ষা করে বললেন, “আপনার চোখের ব্যথা অব্যাহত থাকলে ভেতরে যাতে পানি ঢুকে না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।”

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ্ ইশার নামাযের জন্য ওযু সেরে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। ওযুর সময় চোখের ভেতর পানি ঢুকেছিল। কিন্তু জেগে ওঠার পর লক্ষ করলেন, চোখের ব্যথা সেরে গেছে। তাহাজ্জুদ শেষে গভীর মুরাক্বাবায় থাকাবস্থায় এক গায়েবি আওয়াজ শুনলেন, “জুনায়েদ চোখের ভেতর পানি দিয়েছে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে। সে যদি একই নিয়তে দোযখের সকল [ঈমানদার ও পাপী] মানুষের মুক্তির জন্য আমার নিকট ভিক্ষা চাইতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করে নিতাম।”

পরদিন ডাক্তার এসে দেখলেন হযরতের চোখ ভালো হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “শায়খ! আপনি কী করেছেন গতরাতে?”

হযরত জবাব দিলেন, “আমি নামাযের জন্য ওযু করেছি।” একথা শুনে খ্রিস্টান ডাক্তার “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বলে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। বললেন, “অবশ্যই, অবশ্যই এটা ছিলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিরাময় দান। কোনো মানুষের পক্ষ থেকে নয়। ইয়া শায়খী! বাস্তাবে আমার চোখ রোগাক্রান্ত ছিলো আপনার নয়। আপনি ছিলেন [আমার অন্তরচোখের] চিকিৎসক, আমি নয়।”

২. কার গুনাহের বোঝা কে নেবে: হযরতের সামনে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন, "আজকাল সত্যিকার ঈমানদার ভাইদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, "আপনি যদি কাউকে খুঁজে থাকেন, যে আপনার [গুনাহের] বোঝা বহন করবে তাহলে অবশ্যই তাকে পাওয়া কঠিন হবে। অপরদিকে আপনি যদি অপরের [গুনাহের] বোঝা বহন করতে আগ্রহী হন তাহলে, আমার সঙ্গেই এরূপ অনেককে পাবেন।"

৩. আল্লাহর উপস্থিতির মধ্যে 'আল্লাহ' বলা অশ্রদ্ধা: হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ যখনই তাওহিদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তখন প্রত্যেকবার ভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতেন। এর ফলে শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য বুঝতে বেগ পেতো। একদিন হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ "আল্লাহ!" বলে মৃদু চিৎকার দিলেন। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, "আল্লাহ যদি অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে গায়েব একককে [আল্লাহকে] উল্লেখ করা হচ্ছে অনুপস্থিতির নিদর্শন। এবং অনুপস্থিতি হচ্ছে একটি জিনিস যা নিষিদ্ধ।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ যদি উপস্থিত থাকেন, তাহলে ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁর নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে শ্রদ্ধাহীনতা!"[২৭]

৪. হাদিয়ার টাকা দানকারীকে প্রদান: একব্যক্তি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর নিকট ৫০০ দিনার নিয়ে আসলো। সে বললো, শায়খ এ দিনারগুলো হাদিয়া হিসেবে অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন, "এ দিনারগুলো ছাড়াও তোমার নিকট আরো ধন-সম্পদ আছে নাকি?"

সে বললো, "জী হুজুর! অনেক আছে।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী আরো বেশি ধন-সম্পদের প্রয়োজন আছে?"

সে বললো, "জী হা, প্রয়োজন আছে।"

---

[২৭] আমরা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত থাকি, তখন তাঁকে নাম ধরে ডাক দেই না এ কারণে যে, এতে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা হবে। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত তথা মুশাহাদার অবস্থায় তাঁর জাত নাম বলে ডাক দেওয়াটা অশ্রদ্ধা বলেছেন। তাঁর উক্তির ব্যাখ্যা এটিই। -গ্রন্থকার

তিনি বললেন, "তাহলে তোমাকে আমার এই ৫০০ দিরহামও হাদিয়া দিলাম। নিয়ে যাও। তোমার প্রয়োজন বেশি। আমার যা আছে তা-ই যথেষ্ট। বেশির দরকার নেই।"[২৮]

৫. ভাবনার মাধ্যমে গীবত: একদিন হযরত বয়ান করছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করা শুরু করলো। হযরত জুনাইদ লোকটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, "এ লোকটি তো স্বাস্থ্যবান। সে তার গতর খাঁটিয়ে জীবিকা নির্বাহ্ করতে পারতো। সে কেনো ভিক্ষা করবে ও নিজের ওপর অবমাননা ডেকে আনবে?"

এ রাতে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ একটি স্বপ্ন দেখেন: তাঁর সম্মুখে ঢাকনাসহ একটি থালা দেওয়া হয়েছে। কেউ বললো, "ভক্ষণ করুন!"

তিনি ঢাকনা তুলে দেখেন থালার মধ্যে ঐ ভিক্ষুক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে! বললেন, "আমি মানুষের মাংস ভক্ষণ করি না।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "তাহলে আজ মসজিদে থাকাকালে কেনো তুমি তা ভক্ষণ করেছিলে?" স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ আস্তাগ্বফিরুল্লাহ! আস্তাগ্বফিরুল্লাহ! বলতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারলেন, নিজের অজান্তে অন্তরের মাধ্যমে গীবত করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, "আমি ভীষণভাবে ভয় পেলাম। সাথে সাথে ওযু সেরে দুরাকাআত নামায আদায় করলাম। এরপর ঐ ভিক্ষুকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে দজলা নদীর তীরে যেয়ে পেলাম। নদীর তীরে মানুষের ফেলে-যাওয়া শাক-সবজি তুলে তিনি ভক্ষণ করছিলেন। মাথা তুলে আমার দিকে

---

[২৮] লক্ষণীয় যে, 'আমার এই ৫০০ দিরহাম' কথাটির অর্থ হলো হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করার পর এ অর্থের মালিক হয়ে যান হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। এ অধম লেখক একবার আল্লাহর এক ওলিকে লজ্জা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অনুরূপ একটি কাজ করি। বেশ কিছু টাকা তিনি আমার নিকট থেকে কর্জ নিয়েছিলেন। অভাব-অনটন থাকায় তিনি তা ফেরৎ দিতে পারছিলেন না। লজ্জাবোধে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতও অল্প করতেন। আমি ভাবলাম, এই কর্জের টাকা তাঁর থেকে গ্রহণ করবো না। কিন্তু 'মাফ করে দিয়েছি' বা 'আপনাকে হাদিয়া দিলাম' বললে তিনি মনের মধ্যে আঘাত পাবেন। আমি সমপরিমাণ টাকাসহ তাঁর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলাম। পকেট থেকে টাকা বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'হযরত! এই টাকাগুলো আপনাকে হাদিয়া দিলাম'। তিনি এতো টাকা হাদিয়া দিয়েছি দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন। আমি বললাম, আপনার নিকট আমি এ পরিমাণ টাকা পাবো- দয়াকরে আমাকে তা ফেরৎ দিন! তিনি হাতের টাকা আমার হাতে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্যস, তাঁর ঋণ মুক্ত হয়ে গেলো সসম্মানে।

তাকিয়ে বললেন, ‘জুনাইদ! আমার ব্যাপারে আপনি যে ধারণা করেছিলেন, সেজন্য কী তাওবাহ করেছেন?’ জবাব দিলাম, ‘করেছি।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে চলে যান! ইনি হচ্ছেন তিনি যিনি তাঁর গেলামদের তাওবাহ্ কবুল করেন। তবে এখন থেকে আপনি কী ভাবেন সে ব্যাপারে সকর্ত থাকুন।’”

৬. নাপিতের কাছ থেকে ইখলাস শিক্ষা: তিনি বলেন, “আমি একজন নাপিতের কাছ থেকে ‘ইখলাস’ শিখেছি।” এরপর একটি ঘটনার কথা স্মরণ করলেন। বললেন, “মক্কা মুকাররমায় আমি একবার ভ্রমণে যাই। সেখানে একটি দোকানে একজন নাপিত এক ভদ্রলোকের চুল কাটছিলো। আমি তাকে বললাম, ‘আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি আমার মাথা মুণ্ডন করে দেবে?”

সে জবাব দিলো, “আমি পারবো।” তার চোখে পানি এসে গেলো। ভদ্রলোকের চুল কাটার কাজ শেষ না করেই তাকে বললো, ‘উঠে যান। যখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ হয়েছে তখন সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে।’

সে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে মাথার মধ্যে চুমো খেলো। মাথা মুণ্ডন শেষে আমাকে এক টুকরো কাগজে মুড়ে কয়েকটি ছোট্ট মুদ্রা দিল। বললো, ‘এগুলো আপনি প্রয়োজন মেটাতে খরচ করবেন।’

এরপর আমি বেরিয়ে আসলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, পরবর্তীতে যে হাদিয়া আমার হাতে আসবে তা সবই সাদক্বা করবো। বেশিক্ষণ যায় নি, বসরা থেকে এক ব্যক্তি হাদিয়া হিসেবে এক থলে স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। আমি সাথে সাথে এটি নিয়ে নাপিতের নিকটে উপস্থিত হলাম। আমি থলেটি তার হাতে তুলে দিলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, ‘এটা কী?’

বললাম, ‘আমি আমার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। প্রথম হাদিয়া যা-ই আসবে তা তোমাকে দেবো। এটা কিছুক্ষণ পূর্বে এসছে।’

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, “হে পুরুষ! আপনি কী আল্লাহর সম্মুখে লজ্জাবোধ করেন না? আপনি আমাকে বলেছিলেন, ‘আল্লাহর ওয়াস্তে আমার মাথা মুণ্ডন করে দাও’। এখন আপনি আমাকে হাদিয়া এনে দিচ্ছেন। আপনি কী

কখনও কাউকে দেখেছেন, যে আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো কাজ করার পর বিনিময় গ্রহণ করেছে?"

৭. চোরের মরদেহে চুমো: এক চোরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বাগদাদেরে একটি চত্তরে রাখা হয়েছিল। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ চোরের ঝুলন্ত মরদেহে চুমো খেলেন। লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, "ইয়া শায়খুল মাশাইখ! আপনি এ কাজ কেনো করলেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "তার ওপর বর্ষিত হোক হাজার সমবেদনা! তার পেশায় সে নিজের পুরুষত্বের প্রমাণ করেছে। সে এমন দক্ষতার সাথে তার কাজটি করেছে যে, এজন্য তাকে জীবন দিতে হলো।"

৮. চোরের জন্য সাক্ষ্যদান: কোনো এক রাতে হযরতের থাকার কক্ষে এক চোর প্রবেশ করলো। মূল্যবান কিছু না পেয়ে একটি জুব্বা নিয়ে সে পালিয়ে গেলো। পরদিন হযরত বাজারে গেলেন। দেখলেন এক দালাল তার ঐ চুরি যাওয়া জুব্বাটি একজন খদ্দেরের নিকট বিক্রি করছে। তবে খদ্দের ব্যক্তিটি জুব্বার সত্যিকার মালিক সম্পর্কে জানতে চাইলো, "আমি একজন সাক্ষী দেখতে চাই যে সাক্ষ্য দেবে যে, এ জুব্বাটি তোমার সম্পদ। প্রমাণ না করতে পারলে আমি এটি ক্রয় করবো না।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ এগিয়ে যেয়ে লোকটিকে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। এটির মালিক দালাল লোকটিই!" এরপর খদ্দের জুব্বাটি ক্রয় করে নিয়ে গেলো। এদিকে দালাল [চোর] হতবাক হয়ে হযরতের দিকে তাকিয়ে রইলো।

৯. বাধ্য হয়ে আল্লাহকে ডাকলে সুফল আসে: এক বৃদ্ধা হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় এসে আবদার জানালেন, "আমার পুত্র হারিয়ে গেছে। দুআ করুন যাতে সে ফিরে আসে।"
তিনি বললেন, "সবর করো।"

মহিলা কিছুদিন সবর করলেন। এরপর পুনরায় এসে আবদার জানালেন, "হযরত! আমার পুত্র আসে নি। দুআ করুন।"
তিনি এবারও বললেন, "সবর করো।"

আরো কদিন পর মহিলা এসে বললেন, “আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। দয়া করে আল্লাহর দরবারে আমার ছেলেটি ফিরে আসার জন্য দুআ করুন।”

এবার হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “তুমি যদি সত্যি কথা বলে থাকো তাহলে তোমার পুত্রটি ফিরে এসে গেছে। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, বাধ্য হয়ে যে কেউ তাঁকে ডাক দেয়, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।” এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন। বৃদ্ধা বাড়িতে যেয়ে দেখলেন তার সন্তান ফিরে এসেছে।

১০. সুহবত ছেড়ে দেওয়ার কুফল: তাঁর একজন মুরিদ ভাবলেন, “আমি তো সুলুকের শেষ মাক্বামে পৌঁছুয়ে গেছি। তাহলে হযরতের সুহবতে থাকার আর প্রয়োজন কিসের!” সুতরাং তিনি একটি গৃহে একা একা বসে মুরাক্বাবা করতে লাগলেন। দেখা গেলো প্রত্যহ রাতে কেউ একজন একটি উট নিয়ে এসে বলে, “আপনি আসুন, আপনাকে বেহেশতে নিয়ে যাবো।” সুতরাং তিনি উটে বসে একটি মনোরম স্থানে যেতে থাকেন। সেখানে হুর-পরি ও সুদর্শন বালকদের সাথে তিনি ফূর্তি আমোদে লিপ্ত হন। তার সম্মুখে পরিবেশিত হয় উত্তম মজাদার খাবার ও পানীয়। প্রত্যহ ভোর পর্যন্ত এই ‘বেহেশতে’ অবস্থান করেন। এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ও জেগে ওঠে দেখতে পান নিজের গৃহে ফিরে এসে গেছেন। বেশ কিছুদিন এভাবে চলে যাওয়ার পর তিনি গৌরববোধ করতে থাকেন। মনে মনে ভাবেন, “আমি তো বেশ বড়ো ওলি হয়ে গেছি!”

তার এ ‘প্রত্যহ বেহেশতে গমনের’ সংবাদ ধীরে ধীরে লোকজনের নিকট জানাজানি হয়ে গেলো। তিনি নিজেই প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন, “আমি দৈনিক একবার বেহেশতে যাই”। অবশেষে এ খবরটি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌঁছুলো। তিনি সাথে সাথে চলে আসলেন মুরিদের গৃহে। দেখতে পেলেন, মুরিদ সবেমাত্র বেহেশত থেকে ফিরে এসেছেন। তাকে প্রশ্ন করলে, তিনি হযরতকে পুরো ব্যাপারটি অবগত করলেন।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “আগামীকাল রাতে যখন তুমি বেহেশতে যাবে তখন তিনবার বলবে: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ [আল্লাহ ছাড়া কারোর ক্ষমতা ও শক্তি নেই, যিনি মহিমান্বিত, সর্বশক্তিমান।]

ঐ রাতে মুরিদকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হলো যথারীতি। শায়খ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে যা বলতে বলেছিলেন, তিনি এতে খুব একটা আস্থাশীল ছিলেন না। যাক, ঐ 'বেহেশতে' পৌঁছুয়ে তিনি তার শায়খের কথামতো তিনবার উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করলেন।

ইয়া আল্লাহ! এ কী? সব সুদর্শন বালক-বালিকা ও সাথীরা যে ছুটে পালাচ্ছে! ছি! ছি! তিনি যে গোবরের স্তুপের ওপর পড়ে আছেন। চুতুর্দিকে মানুষ ও জানোয়ারের কঙ্কাল। মুরিদের ভুল ভেঙ্গে গেলো। 'বেহেশত' থেকে ছুটে সোজা চলে আসলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায়। তওবাহ করে পুনরায় আত্মনিয়োগ করলেন ইবাদত-বন্দেগীতে। তিনি এবার বুঝতে সক্ষম হলেন যে, মুরিদের জন্য সুহবত ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে "বিষপানের" সমান।

১১. মুরিদের প্রতি খেয়াল: হযরতের একজন মুরিদ বসরা শহরে নির্জনে বসবাস করতেন। এক রাতে একটি কুধারণা তার মনের মধ্যে উঁকি দিলো। তিনি আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেছে! আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তিনি সব ধরনের চেষ্টা চালালেন পরিত্রাণ পেতে। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তিনি লজ্জায় কারো সম্মুখে গেলেন না। এভাবে তিনদিন চলে গেলো। এরপর ধীরে ধীরে কালো রং চলে যেতে লাগলো। হঠাৎ কে এসে তার কক্ষের দরোজায় কড়া নাড়লেন।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

জবাব আসলো, "আমি একজন বার্তাবাহক। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেক প্রেতির একটি পত্র আপনার হাতে পৌঁছুয়ে দিতে এসেছি।"

মুরিদ পত্রটি পাঠ করলেন। হযরত লিখেছেন, "নূরোজ্জ্বলের উপস্থিতির মাঝে তুমি কেনো নিজেকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করছো না? তোমার মুখমণ্ডল থেকে কালো রং মুছতে যেয়ে তিনদিন ও তিন রাতব্যাপী আমাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হলো!"

১২. মুরিদের প্রতি মুর্শিদের দরদ: হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় অবস্থানকারী এক মুরীদ কোনো এক অন্যায় কাজের জন্য ভীষণভাবে লজ্জিত

হলেন। নিজেকে আর কারোর সামনে মুখ দেখাতে পারলেন না। তিনি চুপি চুপি খানক্বাহ থেকে পালিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পর শায়খ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ শাগরিদদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। বাগদাদের একটি বাজার অতিক্রমকালে তাঁর চোখে পড়লো ঐ পালিয়ে যাওয়া মুরিদকে। তিনি তার দিকে অগ্রসর হলেন। মুরিদ টের পেয়ে আগে পা বাড়ালেন। হযরত তাঁর সাথীদেরসহ দ্রুত তার দিকে হাটতে লাগলেন। ধরে ফেলবেন ভেবে মুরিদ একরূপ দৌড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার- একটি সরু রাস্তা ধরে হেটে অপরপ্রান্তে যেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তার সম্মুখে একটি উঁচু দেওয়াল। রাস্তার সমাপ্তি এখানেই। আর কোথাও পালাবার পথ নেই। হযরত জুনাইদ তার দিকে ধেয়ে আসছেন। তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চোখ দুটো নিজের পায়ের দিকে পতিত হলো।

হযরত অন্যান্যদের থেমে যেতে বললেন। মন্তব্য করলেন, “আমাদের একটি পাখি পিঞ্জিরা থেকে উড়ে চলে গেছে।” তিনি একাকী মুরিদের নিকট আসলেন। মুরিদ মাথা নতো করে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কোথায় যাচ্ছেন, ইয়া শাইখী!”

হযরত বললেন, “যখন কোনো মুরিদের পিঠ দেওয়ালে লেগে যায় তখন তার পীর উপকারে আসতে পারেন।” এরপর তিনি ভীষণভাবে লজ্জিত এ মুরিদকে আদর করে খানক্বায় নিয়ে আসলেন। মুরিদ হযরতের পায়ে জড়িয়ে ধরলেন। নিজের কৃতকর্মের কারণে ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে মহান দয়ালু আল্লাহ তা’আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উপস্থিত অন্যান্য মুরিদান এ ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখে সত্যিই গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হন এবং বার বার তাওবাহ করতে থাকেন প্রেমময় মহাপ্রভু আল্লাহ তা’আলার নিকট।

১৩. পীর চিনেন তাঁর মুরিদের মূল্য: শায়খুল মাশাইখ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন বিশিষ্ট মুরিদ ছিলেন। তিনি সকলের তুলনায় তাকে বেশি ভালোবাসতেন। এতে মুরিদদের মধ্যে কিছুটা হিংসার উদ্রেক হয়। ব্যাপারটি হযরতের নিকট উন্মোচন হলো। একদিন সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, “দ্যাখো, আচার-আচরণ ও প্রজ্ঞায় সে হচ্ছে তোমাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” মুরিদরা এ ব্যাখ্যায় বেশি প্রভাবিত হলো না। তিনি আবার বললেন, “তাহলে এক কাজ করা

যায়। সবাই মিলে একটি পরীক্ষা হয়ে যাক- কেমন? তোমরা তখনই আমার ধারণাটি অনুধাবন করবে।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর খাদিমকে নির্দেশ দিলেন, ২০টি কবুতর নিয়ে আসো। খাদিম কবুতরগুলো নিয়ে আসলো। হযরত ঐ বিশেষ মুরিদসহ সকলের হাতে একটি করে কবুতর দিলেন। বললেন, “যাও! যেখানে কেউ দেখাতে পায় না, এরূপ জায়গায় যেয়ে কবুতর জবাই করে আমার নিকট নিয়ে আসো।”

নির্দেশ পেয়ে সবাই চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে একজন ব্যতিত সকলেই ফিরে আসলেন যারতার হাতের কবুতর জবাই করে। এরপর দেখা গেলো হযরতের ঐ প্রিয় মুরিদ ফিরে আসলেন- কিন্তু তার হাতের কবুতরটি জীবিত! অন্যান্য মুরিদরা ভাবলো, এবার বেঠা আটকা পড়েছে! হযরতের নির্দেশ অমান্য করে বসেছে! তারা অপেক্ষা করতে লাগলো কীভাবে তাকে শায়খ ধিক্কার দেন, সেটা দেখবে।

শায়খ ঐ মুরিদকে বললেন, “কী হে? সবাই নির্দেশ মুতাবিক কবুতর জবাই করে নিয়ে আসলো, আর তোমার হাতেরটি এখনো জীবিত! ব্যাপার কী?”
মুরিদ ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, “আপনার নির্দেশ আমার শিরোধার্য ইয়া শায়খী! কিন্তু তা পূরণ করতে আমি অপারগ। এ জন্য কবুতরটি জবাই না করেই ফিরে এসেছি।”
শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, “কেনো তুমি নির্দেশ পালনে অপারগ হলে?”
মুরিদ বললেন, “হযরত! আপনি বলেছিলেন, এমন জায়গায় যেয়ে কবুতর জবাই করবে যেখানে কেউ তা দেখতে পাবে না। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এরূপ কোনো জায়গার সন্ধান পাই নি। কারণ আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি দেখেন না- এমন কোনো স্থান বিশ্বজগতের কোথাও নেই। আমি যেখানেই গিয়ে কবুতর জবাই করতে চেয়েছি, সেখানেই আল্লাহকে উপস্থিত দেখেছি।”

হযরত জুনাইদ বললেন, “কী সুন্দর বললে! হে আমার প্রিয় শাগরিদগণ! তোমরা এবার বুঝলে তো কোন্ কারণে আমি তাকে অধিক ভালোবাসি? তার প্রজ্ঞা ও আচার-আচরণের সঙ্গে এবার তোমাদেরটি যাচাই করে দেখো।” সকল মুরিদ হযরতের নিকট এবার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, “আমরাও আপনার এই বিশিষ্ট মুরিদকে এখন থেকে আরো বেশি ভালোবাসবো।”

১৪. জিহাদের ময়দানে কাফির বীর যোদ্ধার ইসলামগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ: হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর ৮ জন বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন যাঁরা তাঁর প্রতিটি নির্দেশ বিনাবাক্যে পালন করতেন। একদিন হযরত নির্দেশ দিলেন, “তোমাদেরকে আমার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে।” তাঁরা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সম্মুখে মুজাহিদ বাহিনী সারিবদ্ধভাবে তাদের মুকাবিলা করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন শত্রুসেনা এগিয়ে এসে হাঁক ছাড়লো, “হে মুসলমানরা! কার সাহস আছে আমার সঙ্গে লড়বে?” হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গী ৮ জনের সকলেই একে একে ঐ কাফির সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হেয়ে গেলেন। হযরত জুনাইদ সঙ্গীদের শাহাদাতের এই ঘটনাপ্রবাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, “এরা শহীদ হওয়ার সময় আমি উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম ৯টি রূহবাহী খাট আকাশে ঝুলন্ত আছে। আমার সাথীরা একে একে শহীদ হলেন। সাথে সাথে তাদের রূহকে একেকটি খাটে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো। খালি থাকলো একটি খাট। ভাবলাম, নিশ্চয় এটি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং আমিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম। যে বীর যোদ্ধা আমার সাথীদেরকে শহীদ করেছিলো সে আমাকেও ডাক দিলো, ‘হে আবুল ক্বাসিম! ঐ নবম রূহ বহনকারী খাটটি আমার জন্য! আপনি বাগদাদে ফিরে যান। ইসলামের খিদমত করতে থাকুন। তবে যাওয়ার পূর্বে আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন!’”

তিনি আরো বলেন, “সুতরাং ঐ বীর যোদ্ধা আমার হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর হাতের যে তরবারী দ্বারা আমার প্রিয় ৮ জন শাগরিদকে শহীদ করেছিলেন, সে-ই তরবারি দ্বারাই ৮ জন কাফিরকে হত্যা করলেন। এরপর তিনি নিজেই শহীদ গয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, সত্যিই তাঁর রূহটি ঐ অপেক্ষারত রূহবাহী খাটে তুলে নেওয়া হলো। এরপর উর্ধ্বাকাশের দিকে সবগুলো খাট এ নয়জন শহীদের লাশ নিয়ে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো।”

১৫. বক্ষদেশ হচ্ছে আল্লাহর অবস্থানস্থল: একদা শায়খ নাসিরী নামক সাইয়্যিদ বংশের এক ব্যক্তি হজ্জের ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাফেলা যখন বাগদাদে পৌঁছুলো তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

হযরত জুনাইদ সাইয়্যিদ নাসিরীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া সাইয়্যিদী! আপনি কোত্থেকে ভ্রমণ শুরু করেছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "জিলান থেকে।"

হযরত আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনি কার বংশধর?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি আমিরুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর।"

শায়খ জুনায়েদ বললেন, "আপনার মহাত্মন পূর্বপুরুষ দুটি তরবারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। একটি দ্বারা তিনি কাফির-বেইমানদেরকে শায়েস্তা করেছেন আর অপরটি দ্বারা তিনি শাহাদতের সুধা পান করেছেন। এবার বলুন, হে সাইয়্যিদী! আপনি তাঁরই সম্মানিত বংশধরদের একজন। আপনি এ দুটো তরবারির কোনটি ধারণ করেন?"

এ প্রশ্নে সাইয়্যিদ নাসিরীর অন্তরে এক অপূর্ব ভাবাবেগের সঞ্চার হলো। তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, "হে মহাত্মন শায়খ! আমার হজ্জপালনে যাত্রা এখানেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে আল্লাহপ্রাপ্তির রাস্তা বাতলে দিন।"

হযরত জুনাইদ বললেন, "আপনার বক্ষদেশ হচ্ছে আল্লাহর একান্ত অবস্থানস্থল। যেটুকু সম্ভব আপনাকে এ অবস্থানস্থলে অন্য কোনো বস্তুকে প্রবেশাধিকার দেবেন না।"

সাইয়্যিদ নাসিরী বললেন, "ওহ শাইখী! আমি এটুকুই জানতে চেয়েছিলাম।"

কুস্তিগীর জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ও এক বৃদ্ধ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী কুস্তিগীর হিসেবেও বাগদাদে পরিচিত ছিলেন। একদিন কুস্তি খেলার প্রতিযোগিতায় নিয়মমাফিক বাগদাদের শাসক ঘোষণা দিলেন, "আজ

কুস্তিগীর হিসেবে হযরত জুনাইদ বাগদাদী সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছেন। কেউ আছে কী তাঁর এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার?"

প্রথমে কেউ সাড়া দিলো না। এরপর এক বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালেন। তাঁর সরু দীর্ঘ গলা হেতু মস্তকটি এদিক-সেদিক দোল খাচ্ছিলো। তিনি বললেন, "আমি তাঁর সঙ্গে কুস্তি করবো।" উপস্থিত দর্শকরা উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো। সাথে সাথে সবাই হাততালিও দিলো।

আইন মুতাবিক শাসক এ বৃদ্ধকে কুস্তি করতে নিষেধ করতেও পারেন না। নিজের ইচ্ছে কেউ যদি রিংয়ের ভেতর ঢুকে কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষিত। সুতরাং বৃদ্ধকে রিংয়ে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হলো। তার বয়স ছিলো প্রায় ৬৫ বছর। এরপর 'পহেলওয়ান' নামে খ্যাত হযরত জুনাইদ বাগদাদী রিংয়ে প্রবেশ করলেন। প্রতিযোগী হিসেবে ক্ষীণকায়, দুর্বল বৃদ্ধকে দেখে তিনি তো একেবারে অবাক! তিনি ভাবলেন, "ইয়া আল্লাহ! এ বৃদ্ধ লোকটি কোন সাহসে রিংয়ে প্রবেশ করলেন? কেনো?" অনুরূপ শাসকসহ সকল দর্শকের মনেও প্রশ্ন ও কৌতুহল, "এ বৃদ্ধ লোকটি কীভাবে কুস্তি করতে সক্ষম হবেন?"

কুস্তি লড়াই শুরুর পূর্বে বৃদ্ধ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "আপনার কানটি আমার মুখের কাছে আনুন।" তিনি তা-ই করলেন। বৃদ্ধ কানকথায় তাঁকে বললেন, "হযরত! আমি জানি আপনার বিরুদ্ধে কুস্তি করে কখনো জয়লাভ করতে পারবো না। তবে আমি একজন সাইয়্যিদ [হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর]। আমার সন্তানরা বাড়িতে উপোস আছে। আপনি জানেন, সাইয়্যিদ বংশের কাউকে ভিক্ষা করা কিংবা সাদক্বা গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং আমি আশা করছি আপনি কুস্তিগীর হিসেবে নিজের সুনাম, মর্যাদা ও উচ্চাবস্থানকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসায় একটি সাইয়্যিদ বংশের পরিবারকে সসম্মানে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবেন। আমি জিতলে যে টাকা উপহার পাবো তার দ্বারা আমার পরিবারকে ক্ষুদা থেকে অন্তত এক বছরের জন্য রক্ষা করতে পারি এবং আরো এক বছরের কর্জ পরিশোধও করার সুযোগ পাবো। সর্বোপরি দুজাহানের সর্দার আপনার প্রতি খুব সন্তুষ্টও হবেন। হে মহাত্মন জুনাইদ! আপনি কী রাসূলের বংশধরদের জন্য এটুকু কুরবানী করতে প্রস্তুত?"

জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ভাবলেন, "আজ আমার সম্মুখে একটি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে!" কুস্তি শুরু হলো।

দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য কয়েকবার তিনি বৃদ্ধকে ধরাশায়ী করলেন। আবার তাকে উঠে দাঁড়ানোরও সুযোগ দিলেন। তাঁর নিজের শক্তিপ্রর্দশনে যাতে কেউ সন্দেহ করে না- সেটা নিশ্চিত করার পর, দেখা গেলো এক পর্যায়ে বৃদ্ধ তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। হযরত জুনাইদ আর উঠতে পারলেন না। বৃদ্ধ বিজয়ী হলেন! তিনি বুক টুকে বিজয়ীর বেশে পেশী দেখাতে লাগলেন। দর্শকরা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে হাততালি দিতে থাকে। বৃদ্ধ শাসকের কাছ থেকে পুরস্কারের টাকা সংগ্রহ করলেন। এদিকে জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ নতমাথায় রিং থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এ রাতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নযোগে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে জুনাইদ! তুমি তোমার মর্যাদা, সুনাম, অবস্থান বিসর্জন দিয়েছো আমার ক্ষুদার্ত বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা হেতু। আজ থেকে তোমার নাম আউলিয়াদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হলো।" হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর কাঁদতে থাকেন। অঝোর ধারায় চোখের পানি পড়ে তার দাড়ি পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেলো।[২৯]

মহামূল্যবান বাণী

১. সুফিদের হৃদয়ের প্রশস্ততা: তিনি বলেন, একজন সুফি হচ্ছেন উর্বর জমির মত; এর ওপর যদি নির্জীব বীজও বপন করা হয়- তা থেকেও গজে ওঠে সবুজ বৃক্ষরাজি।

২. সুফিদের আখলাক্ব: সুফিদের হৃদয় হচ্ছে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের মতো: যা দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত, সর্বদা আল্লাহর যে কেনো নির্দেশ মানতে প্রস্তুত। সুফিদের ঈমানী শক্তি হচ্ছে হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালামের মতো। তাঁদের ক্রন্দন হচ্ছে হযরত দাউদ আলাহিসসালামের মতো। তাঁদের সবর হযরত আইউব আলাইহিস সালামের মতো। তাঁদের প্রভুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হযরত

[২৯] হযরত শায়খ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রাহিমাহুল্লাহ - 'তাজাল্লিয়াতে জযব'; সূত্র: islamcan.com

মূসা আলাহিসসালামের মতো। তাঁদের দুআর মধ্যে থাকে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ইখলাস।

৩. তাসাওউফ কী: তাসাওউফ হচ্ছে সেটি যা তোমাকে হত্যা করে নিজে নিজেই বেঁচে থাকে। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বান্দার সর্বাধিক শক্তিশালী সম্পর্ক হচ্ছে, যখন সে তাওহিদের রহস্য উন্মোচনে অগ্রসর হয় তখন দেখতে পায় সৃষ্টি থেকে সৃষ্টিকর্তার সকল রাস্তা বন্ধ- শুধুমাত্র একটি ছাড়া। সেটি হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত রাস্তা।[৩০]

৪. মা’রিফাতের স্তর: একদা হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ দজলা নদীর তীরে আসলেন। ‘ইয়া আল্লাহ!’ বলে জিকির শুরু করলেন। এরপর তিনি পানির উপর দিয়ে হেটে নদী পার হয়ে গেলেন। নদী পার হওয়ার পূর্ব থেকে এক ব্যক্তি খেয়া নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শায়খ জুনাইদ ‘ইয়া আল্লাহ!’ জিকির করে করে পায়ে হেটে নদী পার হয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনিও অগ্রসর হলেন, বললেন, “ইয়া শায়খ! আমিও নদী পার হবো।”

শায়খ জুনাইদ তাকে বললেন, “ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ! বলতে বলতে আমাকে অনুসরণ করো।”

ঐ ব্যক্তি তা-ই করলেন ও পানির ওপর দিয়ে হাটতে থাকেন। নদীর মাঝখানে পৌঁছুনোর পর শয়তান এসে তাকে ওয়াসওয়াসা দিলো। বললো, “কে বড়ো, আল্লাহ না শায়খ জুনাইদ? শায়খ নিজেই বলছেন, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! কিন্তু তোমাকে নির্দেশ দিলেন ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ! বলতে। এটা তো শিরক! এটা বলা বন্ধ করো। বলো, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!”

শয়তানের এ ওয়াসওয়াসায় তিনি বিভ্রান্ত হলেন। তাকে অনুসরণ করে বলতে লাগলেন, “ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!” সাথে সাথে তিনি পানিতে নিমজ্জিত হলেন। চিৎকার দিলেন, ‘বাচাঁও! বাঁচাও!’

---

[৩০] অর্থাৎ সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ পেছন ফিরে বললেন, "আমার নির্দেশ মতো বলো, ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ!" লোকটি তাই করলেন। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি ভেসে ওঠেছেন ও পানির উপর দিয়ে পুনরায় হাটতে পারছেন। এরপর উভয়ে নিরাপদে নদীর ওপর পারে উপনীত হলেন।

লোকটি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে ঘটনার রহস্য কী জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "হে শায়খ! আমি এর রহস্য বুঝতে পারলাম না। আপনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! এবং নিরাপদে নদী পার হলেন। আর আমি যখন তাঁর [সুবহানাহু তাআলা] নাম উচ্চারণ করলাম, তখন তলিয়ে যেতে থাকি নদীর পানিতে। এর কারণ কী?"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "হে বোকা! তুমি এখনও জুনাইদকেই চিনতে পারো নি, অথচ স্বয়ং আল্লাহকে চেনার [মা'রিফাতুল্লাহর] স্বপ্ন দেখছো!"[৩১]

৫. আল্লাহপ্রেমের উচ্চমার্গের ব্যাখ্যা: পবিত্র হজ্জের মওসুমে মসজিদুল হারামে একদা যুগের আউলিয়ায়ে কিরামের একটি জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মন এসব ওলির মধ্যে সর্বাধিক কম বয়সের ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

উক্ত জমায়েতে 'আল্লাহপ্রেম' এবং 'আল্লাহর প্রেমিক কারা' এ দুটো সম্পর্কিত [relatated] বিষয়ের ওপর আলোচনা শুরু হলো। প্রায় সব ওলি এ ব্যাপারে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করলেন। অবশেষে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, "হে জুনাইদ! আপনি তো বেশ নিরব আছেন। আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।"

---

[৩১] এখানে ভুলবুঝাবুঝির অবকাশ নেই। মা'রিফাতের উচ্চস্তরে আরোহণকৃত হযরত শায়খ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ যখন ইসমে যাতের জিকির করছিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মুশাহাদার [আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতির] স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর এ জিকির ও অপর ব্যক্তির জিকিরের মধ্যে আধ্যাত্মিক দিক থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। বাস্তবে কারামতটি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিলো আর এর প্রভাব পড়ছিলো অনুসরণকারী ব্যক্তির ওপর হযরতের ওয়াসিলায়। তাই তাকে 'ইয়া জুনাইদ!' বলার অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ তোমার ওলি জুনাইদের ওয়াসিলায় আমাকেও পায়ে হেটে নদী পার হওয়ার ক্ষমতা দান করুন। এরূপ করা মোটেই শিরকের অন্তর্ভুক্ত আমল নয়, যা মরদূদ শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছিলো। -গ্রন্থকার।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ মাথা নতো করলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। বললেন, "আল্লাহর প্রেমিক তিনি, যিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। শুধুমাত্র জিকরুল্লাহর মধ্যে ঢুবে থাকেন। জিকিরের সকল অবস্থা তার মধ্যে বিরাজ করে; হৃদয়নেত্রে আল্লাহর দর্শন করেন, ঐ হৃদয় [ক্বলব] আল্লাহভীতির তাজাল্লি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে; আল্লাহর জিকির তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যেরূপ এক কাপ সুরা করে থাকে, তিনি আল্লাহর কথা উচ্চারণ করেন, যেমন স্বয়ং আল্লাহই তার মাধ্যমে কথা বলছেন; তিনি যদি নড়েন তাহলে তা হয় আল্লাহর নির্দেশে; তিনি মানসিক সান্ত্বনা লাভ করেন শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে; এবং যখন এরূপ স্তর লাভ হয় তখন, তার খাওয়া, পান করা, নিদ্রা, সজাগ হওয়া- এবং মোদ্দাকথা তার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ হয়ে যায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত; তিনি না কোনো জাগতিক কৃষ্টির প্রতি কর্ণপাত করেন, না তিনি মানুষ কর্তৃক তার প্রতি কোনো তিরস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।"

৬. আল্লাহর জিকিরই মূখ্য: তিনি বলেন, "যে চক্ষু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সৌন্দর্যের স্বরূপ দেখতে অপারগ সে চক্ষু অন্ধ হয়ে যাওয়াই উত্তম; যে জিহ্বা তাঁর [আল্লাহর] জিকির থেকে গাফিল সেটি বোবা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়; যে কর্ণ তাঁর [আল্লাহর] মাহাত্মের গুণগান শুনে নি, সেটি বধির হয়ে যাওয়াই ভালো; এবং যে শরীর আল্লাহর ইবাতদ করে না, সেটি মরে যাওয়াই উচিৎ।"

৭. দৃষ্টিপাতের গভীরত্ব: একব্যক্তি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে বললো, "আমার দিকে তাকান।" তিনি জবাব দিলেন, "গত ২০ বছর যাবৎ আমার হৃদয় দিয়ে আল্লাহর দিকে তাকাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তাহলে তোমার দিকে সফলভাবে তাকাবো কী করে?"

৮. পবিত্র হজ্জের হাক্বিক্বাত: একব্যক্তি পবিত্র হজ্জ পালন করে বাগদাদে এসে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন: "যে মুহূর্তে আপনি বাইতুল্লাহর হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে যান, সে সময় আপনি কী সকলপ্রকার পাপকর্ম থেকেও দূরে সরার নিয়ত করেছিলেন?"
হাজী সাহেব জবাব দিলেন, "না-তো, এমন কোনো নিয়ত করি নি।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি কোনো ভ্রমণই করেন নি। আচ্ছা বলুন, যাত্রার সময় প্রতিটি স্থানে যেখানে আপনি রাত্রিযাপনের জন্য থেকেছিলেন, আপনি কী আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার একেকটি স্তর অতিক্রম করছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না হযরত! এরূপ কিছু তো বুঝি নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি [সুলুকের] রাস্তায় পদার্পণই করেন নি। আরো বলুন, মিক্বাতে পৌঁছুয়ে যখন ইহরাম পরেছিলেন, তখন কী আপনি মানবিক সকল স্বভাব-চরিত্রকে বিসর্জন দিয়েছিলেন ঐ দুটুকরো কাপড় পরার সময়?”
হাজী সাহেব: “না হযরত! এটাও করি নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি হজ্জের জন্য ইহরামও পরেন নি। আচ্ছা বলুল তো, আপনি যখন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেছিলেন, তখন কী এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তা’আলার মুশাহাদার মধ্যে ছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি উকুফে আরাফাহ করেন নি। যখন আপনি মুজদালিফায় যেয়ে নিজের ইচ্ছে পূরণ করেছিলেন, তখন কী যাবতীয় দৈহিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না হযরত! এরূপ কিছু হয় নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি উকুফে মুজদালিফা পালন করেন নি। আরো বলুন, আপনি যখন তাওয়াফে জিয়ারত করেন তখন আপনি কী নিরাকার আল্লাহ তা’আলার সৌন্দর্য পবিত্রতার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে দর্শন করেছেন?”
হাজী সাহেব: “না, এরূপ কিছু দেখি নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি তাওয়াফে জিয়ারতও করেন নি। এবার বলুন, আপনি যখন সাঈ করেন, সে সময় আপনি কী পবিত্রতা [সাফা] ও সদগুণ [মারওয়াহ] অর্জন করেছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না, তা-ও হয় নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: "তাহলে তো আপনি সাঈ করেন নি। আরো বলুন, আপনি যখন মীনায় ফিরে আসলেন তখন কী আপনার যাবতীয় ইচ্ছার সমাপ্তি [মুনা] ঘটেছিল?
হাজী সাহেব: "জী না। ঘটেনি।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: "তাহলে আপনি মীনায়ও অবস্থান করেন নি। বলুন, আপনি যখন কুরবানীর স্থানে যেয়ে পশু জাবই করেছিলেন, তখন কী আপনি যাবতীয় দুনিয়াবী খাহিশাতকেও কুরবানী দিয়েছিলেন?"
হাজী সাহেব: "জী না, দেই নি।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: "তাহলে তো আপনি কুরবানীও করেন নি। আপনি যখন জামারাতে যেয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন কী ক্বলবের যাবতীয় ঐচ্ছিক কু-ধারণাকে বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়েছিলেন?"
হাজী সাহেব: "না-তো, এমনটি করি নি।"
হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: "তাহলে আপনি কঙ্করও নিক্ষেপ করেন নি। বাস্তবে আপনি হজ্জও করেন নি। আবার হজ্জে চলে যান।"

৯. আত্মপরিচিতি থেকে বিস্মৃত হওয়া: হযরত জুনাইদ বাগাদাদী রাহিমাহুল্লাহ স্বরচিত 'কিতাবুল ফানা' [আত্মবিলুপ্তির গ্রন্থ] নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন: "নির্বাচিত এবং নির্বাচিতের নির্বাচিতদের ব্যাপার হচ্ছে, তারা নিজেদের অবস্থার বিস্ময়করতা হেতু আত্মপরিচিতি হারিয়ে ফেলেন। তাদের জন্য 'উপস্থিতি' অবশিষ্ট থাকে না। হাক্বিক্বাত তাদেরকে করায়ত্ব করেছে, মুছে দিয়েছে, আত্মবিলুপ্ত করেছে তাদের নিজস্ব সকল গুণাবলী থেকে। সুতরাং হাক্বিক্বাত তাদের মধ্য দিয়ে ও উপর দিয়ে কাজ করে। হাক্বিক্বাত তাদের মধ্যে সকল অভিজ্ঞতায়ও উপস্থিত থাকে।"

১০. আল্লাহর পথে সাধনায় আত্মনিয়োগের সুফল: পবিত্র কিতাবুল্লাহর আয়াতে করীম:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا * وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

-"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [আনকাবুত: ৬৯]

-এর ব্যাখ্যায় হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা স্বীয় খাহিশাতের বিরুদ্ধে কঠোর সাধনা করে এবং আল্লাহ রাহে তাওবাহ করে, তাদেরকে আমি [আল্লাহ] ইখলাস অর্জনের রাস্তায় নিয়ে যাবো। কেউ কারো দুশমনের বিরুদ্ধে বাহ্যিক জিহাদ করতে পারবে না, যদি না সে এ দুশমনের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ জিহাদে লিপ্ত হয়। আর যাকে এ দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করা হবে, সে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। আর যাকে এ দুশমনদের বিরুদ্ধে পরাজিত করা হবে, সে তাদের বিরুদ্ধে পরাজয়বরণ করবে।"

১১. সাধনার কাঠিন্যতা: তিনি বলেছেন, "ঈমানদারদের জন্য ইহলোক থেকে পরলোকে ভ্রমণ [জাগতিক সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আধ্যাত্মিক অবস্থায় পরিবর্তন] সহজ। সৃষ্ট প্রাণী থেকে সৃষ্টিকর্তার নিকট ভ্রমণ কঠিন। নফস থেকে আল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণ খুব কঠিন। আর আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান কঠিন থেকেও কঠিন।"

১২. আল্লাহ থেকে মুখ ফেরানোর খেসারত: তিনি বলেন, "যদি কেউ হাজার বছরব্যাপী আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে, এরপর সে একটি মুহূর্তের জন্য তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে ঐ মুহূর্তে যেটুকু সে হারাবে তার পরিমাণ [হাজার বছরের ইবাদতে] যাকিছু সে অর্জন করেছিলো তার থেকেও বেশি হবে।"[৩২]

১৩. জুহদের অর্থ: জুহদের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "জুহদ হচ্ছে, হৃদয়কে সার্বক্ষণিক চাওয়া থেকে মুক্ত করা।"[৩৩]

১৪. সবর কী: তিনি বলেন, "সবর হলো, তিক্ততাকে ভ্রূকুঞ্চন [বা অভিযোগ] ছাড়া গিলে ফেলা।"[৩৪]

---

[৩২] হিলায়াতুল আউলিয়া- হযরত আবু নুয়াইম ইসফাহানী রাহিমাহুল্লাহ, খ. ১০, পৃ. ২৭৮।

[৩৩] মাদারিজুস সালিকীন।

[৩৪] প্রাগুক্ত।

১৫. সালিক হওয়ার যোগ্যতা: “যে কেউ কুরআন শরীফ [কিছুটাও] মুখস্ত করে নি, কিংবা হাদিস শরীফ [একটুও] জনে না- সে এ আমাদের রাস্তার লোক নয়। কারণ তাসাওউফ মূলত কুরআন ও সুন্নাহর অভ্যন্তরে- বাইরে নয়।”[৩৫]

১৬. আন্তরিকতা একটি সূক্ষ্ম বিষয়: তিনি বলেন, “আন্তরিকতা [ইখলাস] হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর গোলামের মধ্যকার একটি সূক্ষ্ম বিষয় [সির]। এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না- এমনকি কিরামান কাতিবীন ফিরিশতারাও তা অজ্ঞাত। সুতরাং এটি কখনো লিপিবদ্ধ হয় না বান্দার আমলনামায়। অপরদিকে মরদূদ শয়তানও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং সে এর বিরুদ্ধে ওয়াসয়াসা দিতেও অপারগ। এছাড়া মানবাকাঙ্ক্ষা [হাওয়া] এ থেকে মুক্ত। সুতরাং এটা একে প্রভাবান্বিত করতে পারে না।”[৩৬]

১৭. আত্মশুদ্ধির জিহাদ: “একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য যে কেউ তাওবাসহ কঠিন মুজাহাদা করবে, তাকেই ইখলাসের রাস্তার দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।”

১৮. ওলি না শয়তান: “যদি কেউ পানির ওপর দিয়ে হেটে যেতে সক্ষম হয়, কিংবা বাতাসে ভাসমান জায়নামাযে সিজদা দেয় আর সে রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ না করে, তাহলে সে ওলিআল্লাহ নয়- বরং সে হচ্ছে শয়তান।”

১৯. শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে পাপকামনা আরো মারাত্মক: “শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম’ পাঠ করে বিতাড়িত করা যায়। কিন্তু মনের মধ্যে নিজ থেকে উদ্বুদ্ধ কুমন্ত্রণাকে বিতাড়ন খুব কঠিন। এজন্য প্রয়োজন হয় মুর্শিদের সুহবত ও কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা।”

২০. বহিরাঙ্গ থেকে ব্যক্তিত্বের পরিচয় মিলে না: “ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র কখনো মানুষের বাহ্যিক রূপ দ্বারা বুঝা যায় না। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে উন্নত স্তরে পৌঁছুয় উত্তম চরিত্র দ্বারা।”

---

[৩৫] প্রাগুক্ত।

[৩৬] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০।

২১. দুর্নীতির মূল: "নফসের প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে সকল দুর্নীতির মূল।"

২২. আল্লাহর গোলাম কারা: "যে কেউ নিজের নফসকে দুশমন মনে করে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা দেয়, সে-ই হচ্ছে আল্লাহর গোলাম।"

২৩. দ্বীনের পাহারাদার কারা: "যে ব্যক্তি তার হৃদয়ের পাহারাদার সে দ্বীনেরও পাহারাদার।"

২৪. ফিরিশতার মাধ্যমে রূহানী শক্তি অর্জন: তিনি বলেন, "একদিন নিয়মিত ওয়াজিফা পাঠ করছিলাম। কিছুটা তন্দ্রা এসে গেলো। অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেলাম একজন ফিরিশতা আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি নিজের রূহানী তাজাল্লি দ্বারা আমার হৃদয়কে আলোকিত করে বললেন, 'দাঁড়াও আবুল ক্বাসিম! কথা বলো। তোমার অন্তরে রূহ প্রবেশ করেছে', একথা শুনার পর আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলো। আমি কাঁদতে থাকি।"

২৫. সুফিদের কথাবলা: কেউ একজন তাঁকে সুফিদের কথাবলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি জবাব দিলেন, "সুফিদের কথন নেই।" অন্য আরেক ব্যক্তি এ জবাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, "আবুল ক্বাসিম [তিনি নিজে] যা বলেছে সত্য বলেছে। একজন সুফির বিচরণ ক্ষেত্র শুধুমাত্র অদৃশ্য জগতে। তাঁর জিহ্বা যখন শিথিল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কথা বলতে অনুমতি দেন, তখনই তিনি কথা বলেন। অন্যথায় তিনি নিরব থাকেন।" তিনি আরো বলেন, "আপনারা আমাকে পূর্বে কথিত বাক্য পুনরাবৃত্তি করতে বলবেন না- কারণ আমি তা পারবো না। আল্লাহ তাআলা ঐ কথাগুলো বলতে আমার মুখে রেখেছিলেন এবং জিহ্বাকে নাড়িয়েছেন। এগুলো কোনো কিতাব বা দারস থেকে প্রাপ্ত হই নি- বরং আল্লাহর অনুগ্রহ বৈ নয়।"

২৬. তাসাওউফের সংজ্ঞা: (১) তাসাওউফ এমন একটি চেষ্টা যেখানে মানব বাস করে। (২) তাসাওউফ বাস্তবে আল্লাহর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে দৃশ্যত এটি হচ্ছে মানবের গুণ।[৩৭]

---

[৩৭] প্রথম সংজ্ঞা দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্যে যে, দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করতে গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে প্রভুর নৈকট্য অর্জন। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, যখন দূরত্ব মিটিয়ে নৈকট্যের স্তরে উপনীত হবে, তখন সালিকের নিকট উন্মোচন হবে যে, যাবতীয় গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর। তার নিজস্ব গুণাবলী মূলত হাক্বিক্বাতের

২৭. ফানা [বিলুপ্তি] ও বাকা [স্থিতি] সম্পর্কে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর একটি (বঙ্গানূদিত) কবিতা:

আমার মাঝে আছে যা উপলব্ধি করেছি তা,
আমার জিহ্বা তব সাথে গোপনে বলেছে কথা।
আমরা একীভূত হয়েছি একদিকে,
অপরদিকে পড়ে আছি দূরত্ব রেখে।
সম্ভ্রম হেতু যদিও তুমি আমার চোখের দৃষ্টির আড়ালে,
পরমানন্দে দেখিয়েছে তব রূপলাবণ্য মমো অন্তরতম স্থলে।

২৮. ফানার অবস্থা: তিনি বলেন, "কিছুদিনের জন্য আমার হতভম্বতা হেতু ইহ-পরলোকের সবাই ক্রন্দন করেছে। এরপর তাদের অনুপস্থিতি হেতু আমিও ক্রন্দনে রত হই। এখন আমার অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, আমার না আছে তাদের সম্পর্কে জ্ঞান, না আছে নিজের সম্পর্কে জ্ঞান।"

২৯. দেখা দুধরনের: "কেনো বস্তু দেখার স্বরূপ দুটি: (১) প্রথমটি হচ্ছে অস্তিত্বের [বাকী] চোখে দেখা। (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিলুপ্তির [ফানী] চোখে দেখা। প্রথম ধরনের চোখে দেখা হলে, দর্শক প্রত্যক্ষ করবে- সমগ্র মহাবিশ্ব নিজের অস্তিত্বের [আল্লাহতে বাকীর অবস্থা] অবস্থাভেদে অসম্পূর্ণ আছে। কারণ সে ইন্দ্রিয়লব্ধ ঘটনাকে স্ব-অস্তিত্বশীল মনে করে না। অপরদিকে যখন বিলুপ্তির [আল্লাহতে ফানী অবস্থার] চোখে দেখা হয় তখন, সে উপলব্ধি করবে সমগ্র সৃষ্ট বস্তু অ-বিদ্যমান। শুধু আল্লাহ তা'আলা চির-অস্থিত্বশীল। উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু, দর্শক সৃষ্ট বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ কারণেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন: 'হে আল্লাহ! বস্তু যেরূপ আছে সেরূপই আমাদেরকে দেখান। কারণ যে কেউ এরূপ দেখেবে সে সান্ত্বনা পাবে।'"[৩৮]

প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এ স্তরে সে নিজের সকল গুণাবলী থেকে বিলীন হয়ে যায়। হযরত হাজবেরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাওহিদের হাক্বিক্বাতে বাস্তবে কেনো মানবিক গুণাবলী নেই। এর কারণ হলো মানবিক গুণাবলী স্থায়ী নয়- এগুলো ছবি ও ছাপের মতো। এতে স্থায়িত্ব নেই, কারণ এগুলোর আসল সূত্র স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং বাস্তবে সব গুণাবলীর একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা।" -গ্রন্থকার

[৩৮] জানা থাকা প্রয়োজন যে, বাকা ও ফানা এ উভয় অবস্থা সাধারণ মানুষের স্তর নয়। উভয়টিই ওলিদের স্তরের [বা হালের] অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটিকে 'ওয়াদাতুশ শুহূদ' ও দ্বিতীয়টিকে 'ওয়াদাতুল উজূদ' তত্ত্ব ধারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। -গ্রন্থকার।

৩০. আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান [মা'রিফাত]: তিনি বলেন, "মা'রিফাত বা আল্লাহপরিচিতি যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করে। যখন তোমার হৃদয় এ জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তুমি তাঁর আনুগত্যে শান্তি অনুভব করো। তোমার মন-মানসিকতা তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের কারণে স্পষ্ট হয় এবং তোমার বুঝ তাঁর ওপর নির্ভর করে। তখন তোমার মানবিক অস্তিত্ব আর থাকবে না। তোমার স্ব-ইচ্ছে বিলুপ্ত হবে। তোমার জ্ঞান আলোকিত হবে- কারণ এটি আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর হাক্বিক্বাতের ভাণ্ডার তোমার মাঝে উন্মোচন হবে।"

৩১. সিদক্ব [সত্যবাদিতা] ও ইখলাসের [আন্তরিকতা] মধ্যে পার্থক্য: তিনি বলেন, "ইখলাস সিদক্বকে ছাড়িয়ে গেছে। সিদক্বের স্তর ইখলাস থেকে উন্নত।"

৩২. সালিক তিন প্রকারের: "জেনে রাখো, সালিক তিন ধরনের: (ক) প্রথম সালিক অন্বেষাকাঙ্ক্ষী ও অনুসন্ধানী। সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় শরীয়তের জ্ঞান আহরণ ও অনুসরণ করে। সে সকল আইন-কানুন মানে, সকল প্রকার উপাসনায় লিপ্ত থাকে ও হালাল-হারাম বুঝে চলে। (খ) দ্বিতীয় সালিক [প্রথমজনের সকল আমল করেও] আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাসহ অগ্রসর হয়। দরোজায় পৌঁছুয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। (গ) তৃতীয় সালিক কাঙ্ক্ষিত কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে সেখানেই থাকে।"

৩৩. আল্লাহর ওপর ভরসার ব্যাখ্যা: "যদি কেউ দাবি করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তার আশ্রয়স্থল ও ভরসাস্থল, এবং একইসময় সে অপরদের কাছেও আশ্রয় ও সান্ত্বনা কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবেন। তার অন্তর থেকে জিকরুল্লাহ বিলুপ্ত করবেন। তাকে শুধুমাত্র জিহ্বার জিকিরে লিপ্ত রাখবেন। সে যদি তার এ নির্বুদ্ধিতা অনুধাবন করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তাহলে তিনি তার ওপর থেকে বিপর্যয় ও বিপদাপদ আবার তুলে নেবেন। কিন্তু সে যদি গাইরুল্লাহর প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে কট্টরভাবে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর স্বীয় রহমত নাজিল করা থেকে বিরত হবেন। সে বঞ্চিত হবে তাঁর সৃষ্টির উপকার থেকে। এর বদলে তার মধ্যে পয়দা হবে অতিলোভ। ফলাফলস্বরূপ, মানুষ তার ওপর নিজেদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য চাপ দেবে। একই সময় এদের অন্তরে তার প্রতি কোনো দয়ার উদ্রেক হবে না। এর ফলে, তার জীবনটি বরবাদ

হয়ে যাবে। তার মৃত্যুতে দুঃখ-বেদনা ছাড়া আর কোনো মূল্য থাকবে না। তার আখিরাতের জীবন হবে অনুতাপ-পরিতাপ ও অনুশোচনার।”

আল্লামা শাহ’রানী রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরার পর বলেন:
نحن نعوذ بالله من الرُّكون إلى غير الله تعالى
[নাহনু নাউ’যুবিল্লাহি মিনার-রুকূনি ইলা গ্বাইরিল্লাহি তা’আলা]
-“আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তাঁকে ছাড়া অন্য কারোর প্রতি ভরসা করা থেকে।”[৩৯]

৩৪. উত্তম নিয়তের উপকারিতা ও পাপের নিয়তের অপকারিতা: “যখন কেউ তার উত্তম নিয়তের একটিমাত্র দরোজা খুলে, তার জন্য আল্লাহ তা’আলা তাওফিকের ৭০টি দরোজা উন্মুক্ত করেন। অপরদিকে কেউ যখন পাপের নিয়তের একটি দরোজা খুলে, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য ৭০টি লজ্জা ও অসম্মানের দরোজা উন্মুক্ত করেন। সে এ ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারে না।”[৪০]

৩৫. জ্ঞানের মূল্য: তিনি বলেন, “জ্ঞানের মূল্য আছে। এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ না করে একে কাউকে দেবে না।” কেউ একজন প্রশ্ন করলো, “হযরত! এর মূল্যটা কী?” জবাব দিলেন, “যে কেউ একে ভালো ও উত্তম আচরণের দ্বারা অনুধাবন করে এবং তা নষ্ট করে না- তাকে দেওয়াই এর মূল্য।”[৪১]

৩৬. সুন্নাতের অনুসরণই একমাত্র উন্মুক্ত পথ: “সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সব রাস্তা বন্ধ হয়েছে একটিমাত্র পথ ছাড়া। এ পথটি হলো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন [সুন্নাতের] অনুসরণ।”

৩৭. যারা জাহান্নামে চলে গেছে: হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, “হযরত! একদল লোক বলে থাকে শরীয়তের অনুসরণ তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, তারা মনে করে শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুনোর মাধ্যম মাত্র।

---

[৩৯] ‘আক্বাওয়ালে সালাফ’ [ইংরেজি অনুবাদ] - শায়খ কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী, খ. ২, পৃ. ৬৮১-৬৮২।
[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪।
[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৫। লক্ষ করুন, এ কারণেই ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অপরিপক্ক ব্যক্তির নিকট জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাও এখানে একই কথা বলেছেন।

ইতোমধ্যে শরীয়তের অনুসরণ করে আমরা কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছুয়ে গেছি, সুতরাং শরীয়ত অনুসরণ আমাদের জন্য আর জরুরী নয়। এদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

তিনি জবাব দিলেন, "তারা পৌঁছুনোর ব্যাপারে যে দাবি করছে তা সত্য- কিন্তু তারা পৌঁছুয়েছে জাহান্নামে! যে ব্যক্তি চুরি কিংবা জিনা করে, তারাও এরূপ দাবীদারদের চেয়ে উত্তম। আমি যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকি তথাপি শরীয়তের অনুসরণ তো বটেই, এমনকি [নফল] ইবাদত থেকেও গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ত ছাড়া কখনো গাফিল হবো না।"

৩৮. সত্যিকার সাদিক্বের [আল্লাহ তা'আলার বান্দা] পরিচয়: তিনি সত্যিকার সাদিক্ব কারা তার পরিচয় দিতে যেয়ে বলেন, "একজন সাদিক্ব দৈনিক চল্লিশবার অস্থিরতা বোধ করেন। তিনি সর্বদা অনুসন্ধানে থাকেন উত্তম আমলের জন্য এবং কোথায় তিনি সর্বোচ্চ প্রতিদান পেতে পারেন। যেখানেই উত্তম প্রতিদান মিলবে সেখানেই তার বিচরণস্থল। অপরদিকে মুনাফিক ব্যক্তি একই অবস্থায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত অতিবাহিত করবে। সে কখনো নিজেকে পরিবর্তন করে না। এ লোকদেখানো আমলের নাম 'প্রশংসা কুড়ানোর জন্য দর্শন'। আহলুল্লাহগণ এ ব্যাপারে সতর্ক।"

৩৯. মুক্তির কারণ: কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "উত্তম আমল ছাড়া মুক্তি লাভ কী সম্ভব?" তিনি জবাব দিলেন, "বাস্তবে উত্তম আমলগুলোই হচ্ছে মুক্তিলাভের প্রকাশ বা নিদর্শন।"[৪২]

৪০. অন্তঃসারশূন্য সুফি: তিনি বলেছেন, "তুমি যদি দেখো, একজন সুফি বাহ্যিক দিকে খুব সুবেশ [স্মার্ট], তবে নিশ্চিত জেনে রেখো, তার অভ্যন্তর ফাঁকা।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর খুলাফাবৃন্দ

তাঁর খলিফাদের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে বিখ্যাত কজন হলেন: হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩৩৪ হি.], হযরত ইবনে হুসাইন জুরাইরী

---

[৪২] 'নাফাহাতুল উন্স', পৃ. ২৪৫, আক্বওয়ালে সালাফ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৮৮। লক্ষ করুন: উক্ত বক্তব্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে যখন উত্তম আমল করার তাওফিত দেন, তখন ধরে নিতে হবে তাকে মুক্তি দেওয়াই প্রভুর উদ্দেশ্য। -গ্রন্থকার।

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩১১ হি.], হযরত আবুল মুগিত হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, ৩০৯ হি.], আবু আলী আহমদ রুজবারী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২২ হি.], আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে কিত্তানী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২২ হি.], আবু হাসান ইবনে মুহাম্মদ মুজাইয়্যিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২৮ হি.], আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২৮ হি.] ও আবু ইয়াক্বুব ইসহাক্ব ইবনে মুহাম্মদ নাহরাজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩৩০ হি.]।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

মহাত্মন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবনের ইতি হতে যাচ্ছে, তখন তিনি উপস্থিত খাদিমকে বললেন, 'আমাকে উযু সারতে সাহায্য করো।' উযু করানের সময় খাদিম তাঁর দাড়ি খিলাল করতে ভুলে গেলেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে অবগত করেন। এরপর তিনি সিজদাবনত হয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকেন। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, "হে শায়খ! সারা জীবনভর এতো ইবাদত-বন্দেগী করার পরও আজ আপনি এতো বেশি কাঁদছেন কেনো?"

তিনি জবাব দিলেন, "এখন থেকে কী কোনো উত্তম সময় আর বাকি আছে? আমার আমলনামার হিসাব-নিকাশ তো শীঘ্রই বন্ধ হবে।"

এরপর তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকেন। হযরত জুরাইরী রিাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমি হযরতকে বললাম, হে শায়খী! নিজেকে কিছুটা স্বস্থি দিন।" তিনি বললেন, "ওহে আবু মুহাম্মদ! এ মুহূর্তে আপনি কী কাউকে জানেন, যার কুরআনের প্রয়োজন আরো বেশি আছে? আমার আমলনামা তো ভাঁজ করা হচ্ছে। আমি আমার আমলমানা দেখতে পাচ্ছি আকাশে ঝুলন্তাবস্থায়। খুব সরু একটি সূতা দ্বারা বেধে রাখ হয়েছে। বাতাসে এটি দুলছে। আমি জানিনা, এ বাতাস মিলনের না পাপমুক্তির ঘোষণা। একদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি জান কবজের ফিরিশতা আর অপদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি পুলসিরাত। ঐ তো রাজাধিরাজ বিচারক! রাস্তাটি সেদিকে, আমি জানি না কোন রাস্তা দিয়ে আমাকে গমন করতে হবে।"

এরপর তিনি এক খতম কুরআন তিলাওয়াত শেষ করেন। আবার শুরু করে সূরা বাক্বারার ৭০ নাম্বার আয়াতে পৌঁছেন। তাঁর জবান বন্ধ হয়ে যায়। আঙ্গুলে গুণে তাসবীহ্ জপতে লাগলেন নিরবে। তারপর শাহাদাত অঙ্গুলি খাঁড়া করলেন। জবান থেকে বেরিয়ে আসলো: "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" কালামটি। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো। তাঁর রূহ মাটির কায়া থেকে বের হয়ে ইল্লিয়্যিনে আরোহণ করলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

যুগের শ্রেষ্ঠ এই ওলি রজব মাসের ২৭ তারিখ, ২৯৮ হিজরি সনের শুক্রবার দিন ইন্তিকাল করেন। তাঁর মরদেহ গোসল দেওয়ার সময় চোখের মধ্যে পানি ঢালতে উদ্যোত হতেই এক গায়েবী আওয়াজ শোনা গেলো: "আমার প্রিয় বান্দার চোখে হাত দেবে না। আমার স্মরণের মাঝে এ দুটো চোখ বন্ধ হয়েছে। আর এগুলো পুনরায় খুলবে আমাকে দর্শনের মাধ্যমে।" গোসল দেনেওয়ালা ব্যক্তিগণ তাঁর অঙ্গুলিগুলো [খিলাল করার জন্য] খুলতে হাত দিতেই আবার আওয়াজ উঠলো: "থামো! ঐ অঙ্গুলিগুলো বন্ধ হয়েছে আমার নামের মাধ্যমে, আর এগুলো পুরনায় খুলবে আমার নির্দেশে।"[৪৩]

হযরতের ইন্তিকালে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে হযরত ইমাম হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা যদি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গুণাগুণ বর্ণনা করতে যাই তাহলে অনেক খণ্ড কিতাব রচনা করেও পারবো না।"

হযরতের দাফন শেষে এক ওলিআল্লাহ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া শায়খ! মুনকার ও নকীর ফিরিশতাদের জবাবদিহি কিরূপ ছিলো?" তিনি জবাব দিলেন, "ফিরিশতারা আমার সম্মুখে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রভু কে? [من رَّبك] আমি মুসকি হেসে জবাব দিলাম, আমার প্রভু তিনি যাঁর প্রশ্নের [أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ] জবাবে আমি বলেছিলাম, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। [قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا] এখন তাঁর বান্দাহ ফিরিশতাকে জবাব দেওয়ার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? আমি তো বাদশাহদের বাদশাহর সম্মুখে জবাব দিয়ে ফেলেছি! ফিরিশতাদ্বয় আর কিছু না বলে, একে অন্যের সঙ্গে একথা বলাবলি করে চলে গেলেন: 'তিনি তো দেখছি এখনও গভীর প্রভুপ্রেমে ডুবন্ত আছেন!'" আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

[৪৩] মাসালিকুস সালিকীন, খ. ১।

ওলির মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন এবং সংরক্ষণ করুণ তাঁর সকল গোপন রহস্যাবলী।

ক্বাদিরীয়া তরিকা মুতাবিক শাইখুল মাশাইখ হযরত আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন পরবর্তী শায়খ। সুতরাং, আমরা এখন তাঁর মহামূল্যবান জীবন ও সাধনার ওপর যেটুকু সম্ভব আলোচনা করবো। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এমনভাবে আলোচনার তাওফিক দিন যা আপনার সন্তুষ্টির অনুকূলে। কারণ আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন।

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত- ৩৩৪ হিজরি, সমাধি- খাইরাজান কবরস্থান, বাগদাদ, ইরাক)

তিনি ছিলেন ইলমে মারিফাতের সাগর, যুগের শায়খ, মাজযুব ইলাল্লাহ, শায়খুল মাশাইখ। ইলমে শরীয়তের ওপরও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। হিজরি তৃতীয়-চতুর্থ শতকের তাসাওউফচর্চার নেতা, হযরত শায়খ আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর চিত্তাকর্ষক জীবনের বিভিন্ন আকর্ষণীয় দিক তুলে ধরবো মাত্র।

জন্ম ও নামকরণ

হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহর পরিবার বাগদাদে আসেন বর্তমান ইরানের খুরাশান প্রদেশের শিবলা নামক একটি গ্রাম থেকে।[৪৪] তাঁর জন্ম সামারা কিংবা বাগদাদে হয়েছিলো বলে উল্লেখিত হয়েছে। তবে তিনি পরবর্তীতে বাগদাদে জীবন কাটিয়েছেন। শিবলা গ্রামে তাঁর পূর্বপুরুষদের স্থায়ী বাসস্থান ছিলো বলেই তিনি ‘শিবলী’ নামে পরিচিত হন। অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর জন্মের সন ২৪৭ হিজরি উল্লেখ করেছেন। পিতা-মাতা হযরতের নাম কী রেখেছিলেন এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা আছে। কেউ কেউ বলেছেন, ‘জুলাফ ইবনে জাহদার’, অন্যরা বলেছেন, ‘জাফর ইবনে ইউনুস’। সুতরাং তাঁর পিতার নাম ছিলো জাহদার কিংবা ইউনুস। তবে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর কুনিয়াত হচ্ছে আবু বকর। তিনি আবু বকর শিবলী নামেই সুপরিচিত। বাগদাদে অবস্থিত তাঁর সমাধিস্থলে লিখা আছে, ‘জাফর ইবনে ইউনুস’।

কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ ‘তারতিবুল মাদারিক’ গ্রন্থে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহর পিতা বাগদাদের বাইতুল মালের কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত আবু আবদুর রহমান বলেন: “হযরত শিবলী ছিলেন জ্ঞানবান ব্যক্তি। তিনি ফকীহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে বাগদাদে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক হাদিসে রাসূল

[৪৪] এ তথ্যটি এসেছে কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহর ‘তারতিবুল মাদারিক’ কিতাব থেকে। তবে হযরত কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী তাঁর ‘আক্বওয়ালে সালাফ’ কিতাবে বলেন, “তিনি মিশর থেকে এসে বাগাদাদে বসবাস করেন।”, খ. ২, পৃ. ৭৯৪।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিপিবদ্ধ করেন। শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমার তাওবাহর শুরু হয় প্রথমত হযরত খাইরুন নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে।” তিনি অবশ্য যুগের প্রসিদ্ধ শায়খুত তরিকত হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদও ছিলেন। হযরত তাঁকে খিলাফত প্রধান করেন।

প্রাথমিক জীবনে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের রাবী ছিলেন। তিনি রিওয়ায়েত করেছেন, হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাহদী বসরী, আলী ইবনে মুহাম্মদ হাম্মাল, হুসাইন ইবনে আহমদ সাফফার, ইসমাঈল ইবনে হুসাইন ইবনে বান্দার, আবুল হাসান আলী ইবনে মুছান্নাহ আম্বারী, আবু সাহল সালুকী, আবু বকর রাজী প্রমুখ হাদিসের রাবী থেকে। তাঁর থেকে রিওয়ায়েত করেছেন হযরত আবু বকর আম্বুরী রাহিমাহুল্লাহ।[৪৫]

হারত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ মালিকী মাজহাবপন্থী ফকিহ ছিলেন। একজন উচ্চপর্যায়ের আলিম ও মুফতি হিসেবেও তাঁর সুপরিচিতি ছিলো। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত হাদিসের কিতাব ‘মুআত্তা’ তাঁর মুখস্ত ছিলো।[46]

হযরত সুলামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আল-মুয়াফফিক বাগদাদের খলিফা থাকাকালে হযরত শিবলী একদিন খাইরুন নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহর ওয়াজ-মাহফিলে যোগ দেন। তিনি নিহাওয়ান্দে ফিরে এসে লোকজনদের বললেন, ‘আমাকে তোমাদের শহরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তোমরা আমাকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করো।’ তারা আনুগত্য প্রকাশের পর তাঁকে কিছু হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ রাজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “ইরাকের তরিকতের শায়খগণ বলেছেন, সফিতত্ত্বে বাগদাদের বিস্ময় তিনটি: শিবলী রাহিমাহুল্লাহর ইশারাত [ইঙ্গিত], মুরতাইশ রাহিমাহুল্লাহর সূক্ষ্ম বর্ণনা এবং জাফর খুলদী রাহিমাহুল্লাহর গল্পসমূহ।”[৪৭]

---

[৪৫] কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ- ‘তারতিবুল মাদারিক’ গ্রন্থ দ্র.।

[৪৬] আক্বওয়ালে সালাফ [ইংরেজি অনুবাদ], খ. ২, পৃ. ৭৯৪।

[৪৭] কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ - ‘তারতিবুল মাদারিক’, ইংরেজি অনুবাদ- আয়শা বিউলি, সূত্র: sunna.org

আমির থেকে ভিক্ষুক

হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ নিহাওয়ান্দের শাসক [গভর্ণর] থাকাকলে খলিফা আল-মুয়াফফিক বাগদাদ থেকে দূত মারফর জানালেন, তিনি যেনো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আসেন। সুতরাং রায় নগরীর শাসককে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাগদাদে আসেন ও খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খলিফা উভয়কে বিশেষ মূলবান পোশাক (গাউন) পরিয়ে সম্মানিত করলেন।

শিবলি রাহিমাহুল্লাহ ও রায় শহরের শাসক নিহাওয়ান্দের পথে ফের যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হঠাৎ রায়ের শাসক হাঁচি তুললেন। তিনি পরনের গাউনের হাতা দ্বারা নাক মুছে নিলেন। পরে কাফেলার কেউ একজন ব্যাপারটি খলিফাকে অবগত করেন। খলিফা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নির্দেশ দিলেন, “তার পরনের গাউনটি খুলে হাতকড়া লাগিয়ে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো!” সৈন্যরা নির্দেশ পালন করলো। খলিফা রাগান্বিত হয়ে বললেন, “তুমি বাগদাদের খলিফার দেওয়া সম্মানের হানি করেছো! তোমার এই সম্মানকে ফিরে নেওয়া হলো এবং রায়ের শাসকের দায়িত্ব থেকেও বহিষ্কার করলাম।”

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর হৃদয় এ সংবাদ শ্রবণে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন, “একটি গাউনকে রুমাল বানানোর অপরাধে যদি কেউ মর্যাদাশীল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব হারায় ও অসম্মানিত হয় জাগতিক এক বাদশাহ দ্বারা, তাহলে বাদশাহদের বাদশাহ কাউকে যদি মর্যাদার গাউন [সুফিদের জুব্বা] পরিয়ে দেন ও সে এটিকে রুমাল বানায়, তার কী উপায় হবে?” তিনি গাউন খুলে সুফিদের জুব্বা পরে নিলেন। ছুটে গেলেন খলিফার দরবারে।

বললেন, “হে মহামতি খলিফা! একজন মরণশীল ব্যক্তি হয়ে আপনার দানকৃত একটি গাউনের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকে সহ্য করতে পারলেন না। আমাকে জগতসমূহের বাদশাহ একটি সম্মানের গাউন পরিয়ে দিয়েছেন। আমি একে কীভাবে আর আপনার মতো ব্যক্তির চাকুরি রক্ষার্থে খুলে ফেলতে পারি?”

তিনি এরপর আর কখনও বাগদাদের খলিফার দরবারে যান নি। হযরত খাইরুন নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে যেয়ে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন। কিছুদিন

পর একটি কারামত প্রকাশ পেলো। ফলে হযরত খাইরুন নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহ শিবলী রাহিমাহুল্লাহকে হযরত জুনাইদ বাগদাদীর সুহবতে পাঠিয়ে দিলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, বাগদাদে এসে তিনি প্রথমে সাক্ষাৎ পান হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর একজন সাথী ও পীরভাই হযরত আবুল হাসান নূরী রাহিমাহুল্লাহর সাথে। হযরত নূরী তখন ইলমে তাসাওউফের ওপর বয়ান করছিলেন। তিনি বয়ান শুনে আধ্যাত্মিকভাবে প্রভাবান্বিত হন। বয়ান শেষ হওয়ার পর নূরী রাহিমাহুল্লাহ নিকট যেয়ে বললেন, "হযরত! আমি আপনার শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হতে চাই।"

আবুল হাসান নূরী রাহিমাহুল্লাহ আগন্তুকের দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, "হে আগন্তুক! আপনার তরিকতের মুর্শিদ হবেন আমার পীরসাহেব হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ।"

সুতরাং তিনি তখন হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লার খানক্বায় এসে উপস্থিত হন। পরনের রেশমী কাপড় খুলে ফেলেন। তিনি আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিকে পাড়ি জমালেন।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে মুরিদ হিসেবে গ্রহণ করলেও কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিলেন। বললেন, এ মুহূর্তেই তোমাকে মোটা সুতার ত্যানা পরতে হবে। ঘুরো বেড়াতে হবে বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে! এক বছর এভাবে ভিক্ষা করার পর আমার নিকট ফিরে আসবে। হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ মুর্শিদের নির্দেশ মাথাপেতে মেনে নিলেন। সুতরাং আমির আবু বকর শিবলী হয়ে গেলেন সুলুকের রাস্তার দরবেশ ও সাধারণ ভিক্ষুক।

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা

১. উজিরের নিকট নালিশ ও ব্যর্থতা: একদিন কোনো এক কাজে বাগদাদের উজির আলী ইবনে মুসা ইবনে জাররা এর নিকট শিবলী রাহিমাহুল্লাহ ও ইবনে মুজাহিদ মুক্বরী আসলেন। ইবনে মুজাহিদ নালিশের সুরে উজিরকে বললেন, "আজ আমি শিবলীকে আপনার সম্মুখে উন্মোচন করবো।" হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ কোনো কোনো সময় নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেলতেন। ইবনে মুজাহিদ শিবলী রাহিমাল্লাহর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "হে আবু বকর! ভালো ব্যবহারযোগ্য

পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট করার বৈধতা শরীয়তে কোথায় আছে?” শিবলী রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, “শরীয়তে এ কথাটির ব্যাখ্যা কোথায়:

رُدُّوهَا عَلَيَّ * فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

-“এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল।”? [ছোয়াদ: ৩৩]

হযরত ইবনে মুজাহিদ সাথে সাথে নিরব হয়ে গেলেন। উজির ইবনে জাররা ইবনে মুজাহিদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, “আমি চেয়েছিলাম আপনি তাকে চুপ করে দেবেন- এখন দেখছি তিনি আপনাকেই চুপ করে দিলেন!” এরপর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ ইবনে মুজাহিদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “মানুষ মনে করে আপনি হচ্ছেন এ যুগের কুরআনের ব্যাখ্যাতা। বলুন তাহলে, কুরআনের কোথায় উল্লেখিত আছে যে, প্রেমাস্পদ তাঁর প্রেমিককে শাস্তি দেবেন না?” ইবনে মুজাহিদ এবারও নিরব রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, “আপনিই বলুন- হে আবু বকর!” শিবলী রাহিমাহুল্লাহ কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ * قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

-“ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে: ‘আমরা হলাম আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।’ বলুন: ‘তাহলে কেনো তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের দরুণ শাস্তি দেন?’” [সূরা মাইদাহ: ১২০]

এবার ইবনে মুজাহিদ মন্তব্য করলেন, “মনে হচ্ছে আমি এইমাত্র আয়াতটি শুনলাম প্রথমবারের মাতো।”

২. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত: হযরত ইবনে মুজাহিদ একদিন হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আসলেন। বললেন, “আপনার হাল-হাক্বিক্বাত কী? হে শায়খ! আমরা প্রত্যেকদিন উত্তম জিনিসের জন্য আশা রাখি। দৈনিক দুই বা তিন খতম কুরআন তিলাওয়াত করি।” শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “শায়খ! এ কোণে বসে ১৩ হাজার বার কুরআনের খতম করেছি! যদি এর কিছুটাও আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হয়ে থাকে, তাহলে আমি তার সওয়াব আপনাকে দিয়ে দিতাম। গত তিন-চার বছর

যাবৎ আমি কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছি। এ পর্যন্ত চার ভাগের একভাগ মাত্র খতম করেছি!”[৪৮]

২. তাঁর অন্তর্দৃষ্টি: হযরত আবদুর রহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আবু বকরের দিকে যেভাবে তোমরা একে অন্যের দিকে চোখ দিয়ে তাকাও- সেভাবে তাকাবে না। শিবলী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলার একটি চোখ।”[৪৯]

৩. সুফিদের মুকুট: হযরতের পীরসাহেব হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ বিশিষ্ট শাগরিদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন: “প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠির একেকজন মুকুট আছে। শিবলী হচ্ছেন সুফি সম্প্রদায়ের মুকুট।”

৪. ওয়াক্তের মূল্য: হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ ওয়াক্ত [সময়] এর মূল্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন: “ওয়াক্ত হচ্ছে একটি মূলধন। এ মূলধনকে বশ্যতা ও আত্মসমর্পণের মধ্যে খরচ করো। মনে রোখো, এটাই হচ্ছে একমাত্র মূলধন যা তোমার সাথে থাকবে।”[৫০]

৫. আশ্চর্য জিনিস কী?: কিছু লোক তাঁকে প্রশ্ন করলো, “হযরত! আশ্চর্য জিনিস কী?” তিবি বললেন, “ঐ কলব যে আল্লাহর মা’রিফাত [পরিচিতি] লাভ করেও পাপকার্যে লিপ্ত হয়।”[৫১]

৬. ডুমুর ভক্ষণ না করার কারণ: হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেন, “আমি নিজে নিজে প্রতিজ্ঞা করলাম- কখনও কিছু ভক্ষণ করবো না, যদি না তা হালাল হয়। অর্থাৎ, হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হয়ে খাবো না। এরপর একদিন একটি ডুমুর বৃক্ষের নিচে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করি। আগ্রহ জন্মালো ডুমুর খাবো।

---

[৪৮] আল-কুরআনের গভীর মর্মার্থ ও রহস্যাবলী উদঘাটনের জন্যই তিনি এভাবে তিলাওয়াত করেছিলেন। -গ্রন্থকার।

[৪৯] অর্থাৎ, তাঁর অন্তর চক্ষু খোলা। হাদিসে কুদসীতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। [দেখুন: মিশকাত, পৃ. ১৯৭] -গ্রন্থকার।

[৫০] ঈমানের মূল হচ্ছে, ‘আল্লাহর নিকট নিজের নফসকে সোপর্দ করা’। এ আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ‘উবুদিয়্যাত’ [দাসত্ব] অর্জন। আর আমাদের প্রিয় নবী রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ গুণ ছিলো এই ‘উবুদিয়াত’। হাদিসে বর্ণিত আছে, العجز فخري -“আল্লাহর নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে আমার জন্যে একটি গৌরবের সূত্র।” [মাজমুউল বাহার, খ. ৩, পৃ. ৫২৫।], সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ, খ. ২, পৃ. ৭৯৬।

[৫১] নাফাহাতুল উনস, পৃ. ৩৮৬।

গাছ থেকে একটি ডুমুর পেড়ে আনলাম। যে মুহূর্তে এটি মুখে দেবো তখনই এক আওয়াজ শ্রুতিগোচর হলো: "হে আবু বকর! আমাকে ভক্ষণ করো না। তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে যাবে। আমার গাছের মালিক একজন ইয়াহুদী!"

৭. সিদ্দীকের মু'জিযা কী?: তিনি একদা বিমারিস্তানে সফরে যান। সেখানকার শাসক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এক পর্যায়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "শুনেছি একজন সিদ্দীকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মু'জিযা। মু'জিযা না থাকলে তিনি কাজ্জাব [মিথ্যাবাদী]। আপনার মু'জিযা কী?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার মু'জিযা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ মানা ও তাঁর নিষেধসমূহ থেকে পরহেজ থাকা।"[৫২]

৮. কালবে সালিম এর ব্যাখ্যা: তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

-"সে ব্যতীত, যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।" [সূরা শু'আরা: ৮৯]

একটি সুস্থ অন্তর বা কলব দ্বারা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের কলবের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কারণ, তাঁকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখা হয়েছিল। আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন।"

৯. মুরিদের উচ্চ স্তর: "ঠিক কোন সময় কেউ সত্যিকার মুরিদে পরিণত হয়?" এ প্রশ্নের জবাবে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন তার বিভিন্ন অবস্থা- যেমন ভ্রমণে থাকাবস্থা, বাড়িতে অবস্থান, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সবই তার নিকট সমান হয়ে যায়।"

১০. আহলে বালা কারা: তাঁকে নিম্নোক্ত হাদিসে উল্লেখিত 'আহলে বালা' কারা, এ প্রশ্ন করা হলো:

إذا رأيتم الهلال البلاء فاسألوا ربكم العافية

---

[৫২] লক্ষণীয় যে, এ প্রসঙ্গে 'মু'জিযা' শব্দের অর্থ, 'কারামত' বুঝতে হবে। কারণ হলো, মু'জিযা শুধুমাত্র নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে ওলিদের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশ পেতে পারে কারামত। উভয়টিই কিন্তু অতিস্বাভাবিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। -গ্রন্থকার।

-"তোমরা যখন আহলুল বালা কাউকে দেখো, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণের জন্য সওয়াল করো।"

বললেন, "'আহলে বালা' হচ্ছে তারা যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পের্কে গাফিল।"[৫৩]

১১. এ ব্যক্তিকে দজলা নদীতে নিক্ষেপ করো: কথিত আছে, একব্যক্তি হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর ওয়াজ-মাহফিলে চিৎকার দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, "এ ব্যক্তিকে দজলা নদীতে নিক্ষেপ করো! সে যদি সত্যিকার সালিক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে উদ্ধার করবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিসসালামকে নীলনদে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন। সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে ফিরাউনকে আল্লাহ তা'আলা সাগরে নিমজ্জিত করে দিয়েছিলেন।"[৫৪]

১২. রাত্রি জাগরণ: কথিত আছে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর একজন খাদিম বলেছেন, "হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ এক নাগাড়ে দীর্ঘ ৬ মাস নিদ্রা যান নি।"

১৩. প্রভুপ্রেম: হযরত আবু সাহল সুলুকী বলেন, "আমি আবু বকর শিবলীকে বলতে শুনেছি, 'সৃষ্টি আপনাকে [অর্থাৎ আল্লাহকে] ভালোবাসে আপনার দয়া হেতু। আবু বকর আপনাকে ভালোবাসে আপনার পক্ষ থেকে পরীক্ষা হেতু!'"[৫৫]

১৪. ইসমে যাতের গভীরার্থ: তিনি বলেছেন, "আমি কখনো 'আল্লাহ' বলি না! তবে 'আল্লাহ' শব্দব্যহার হেতু আমাকে ক্ষমা করবেন, এ আশায় আমি তাঁকে আবদার জানাই।[৫৬]

---

[৫৩] 'আক্বওয়ালে সালাফ', খ. ২, পৃ. ৭৯৮। হযরত খতিবে বাগদাদী প্রণীত 'তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে' [খ. ১২, পৃ. ১৬৯] বর্ণনাটি এভাবে এসেছে:

أخبرني الحسن بن غالب قال: سمعت عباسا الآجري يقول: سئل الشبلي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم " :إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية " قال: من هم أهل البلاء؟ قال :أهل الغفلة عن الله

[৫৪] তাবাক্বাত, পৃ. ৯০; আক্বওয়ালে সালাফ কিতাব থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৯৮-৭৯৯। লোকটিকে সত্যিকার অর্থে দজলা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো কী না, তার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় নি।

[৫৫] আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা-নীরিক্ষাকে ওলিরা তাদের প্রতি তাঁর রহমতের নিদর্শন মনে করেন। -গ্রন্থকার।

[৫৬] কাজী ইয়াদ- 'তারতিবুল মাদারিক' -আয়শা বিউলি অনূদিত; সূত্র: sunnah.org

১৫. নিদ্রা থেকে মুক্ত থাকতে কঠোর ব্যবস্থা: কথিত আছে, হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ চোখের সুরমা হিসেবে লবণ ব্যবহার করতেন। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, "এটি ব্যবহার করি নিদ্রা থেকে মুক্ত থাকতে!"

১৬. শরীয়তের জ্ঞান: একদিন হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ আবু ইমরান আশইয়াব এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে যোগদান করেন। কক্ষে প্রবেশ করতেই আবু ইমরান দাঁড়ালেন। শিবলী রাহিমাহুল্লাহকে নিজের পাশে বসতে দিলেন। উপস্থিত একজন আলিম ভাবলেন, শিবলী রাহিমাহুল্লাহ যে ইলমে শরীয়তের ক্ষেত্রে অজ্ঞ তা সবাইকে অবগত করার এখই উত্তম সময়! তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, শায়খ শিবলী- বলুন তো, যখন কোনো মহিলার হায়েজের রক্ত দেখতে অন্যরকম লাগে তখন সে কী করবে?" হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ ১৮টি ভিন্ন জবাব দিলেন। আবু ইমরান উঠে যেয়ে হযরত শিবলীর হাতে চুমো খেলেন। বললেন, "ইয়া শায়খ! আমি মাত্র ১২টির খবর রাখি, বাকি ৬টি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।"

১৭. কীভাবে মুক্তার সন্ধান পাওয় যায়: হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর নিকট এসে বললেন, "হযরত! আপনাকে লোকে 'মুক্তা ব্যবসায়ী' বলে। সুতরাং হয় আমার নিকট একটি মুক্তা বিক্রি করবেন, না হয় আমাকে এমনিতেই একটি দান করবেন।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি যদি তোমার নিকট একটি মুক্তা বিক্রি করতে চাই- তুমি এটির মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। আর যদি তা তোমাকে এমনিতেই দান করি, তুমি এর মূল্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হবে! বরং তুমি আমার মতো এক কাজ করো; মাথা নিচের দিকে রেখে সাগরে ডুব দাও! যদি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হও, তাহলে তুমি তোমার মুক্তা পাবেই।"

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ প্রশ্ন করলেন, "এখন তাহলে কী করবো? ইয়া শায়খী!"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ নির্দেশ দিলেন, "যাও! এক বছর যাবৎ গন্ধক বিক্রি করো যেয়ে।" এক বছরব্যাপী তিনি তা-ই করলেন। ফিরে আসার পর পীর সাহেব

এবার আরো নির্দেশ দিলেন, "এ কাজ দ্বারা তোমার মধ্যে খ্যাতি ও বাণিজ্যিক ফায়দা এনে দিয়েছে। এবার পুনরায় রাস্তায় রাস্তায় যেয়ে ভিক্ষা করো- আরো এক বছরের জন্য! সুতরাং, তুমি অল্পমূল্যের ব্যাপার নিয়ে আর ব্যস্ত থাকবে না।"

দীর্ঘ এক বছরব্যাপী হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ সমগ্র বাগদাদের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ালেন। মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে ভিক্ষা দিলো না। তিনি ফিরে এসে কথাটি তাঁর পীর সাহেব হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে অবগত করেন।

হযরত জুনাইদ তাঁকে বললেন, "দ্যাখো, তোমার মূল্য মানুষের নিকট ঝাররা পরিমাণও নেই! তোমার হৃদয় তাদের সঙ্গে যুক্ত করো না- না তাদের জন্য কোনো চিন্তা করবে। কিছুদিন তুমি ছিলে 'প্রাসাদ-সরকার', আরো কিছুদিনের জন্য 'গভর্ণর'। এবার তুমি সেখানে ফিরে যাও এবং সবার নিকট অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো।"

তিনি চলে গেলেন নিহাওয়ান্দে। ঘরে ঘরে যেয়ে ক্ষমা চাইলেন। নির্যাতনের বিনিময়ে টাকা প্রদান করলেন। সবাই ক্ষমা করলেও একজন ভুক্তভোগীর নিকট ক্ষমা চাইতে পারলেন না। তিনি তাঁকে খুঁজে পেলেন না। শিবলী রাহিমাহুল্লাহ এ লোকটি সম্পর্কে বলেন, "আমি সবে মিলে এক লক্ষ দিরহাম দান করলাম। কিন্তু আমার হৃদয় তখনও অস্থির ছিলো। কারণ আমি ঐ একটি লোককে পেলাম না।"

দীর্ঘ চার বছর পর তিনি তাঁর মুর্শিদের দরবারে ফিরে আসলেন। হযরত জুনাইদ তাঁকে বললেন, "তোমার মধ্যে এখনও কিছুটা আড়ম্বরতা ও গৌরব রয়ে গেছে! আরো এক বছর ভিক্ষা করো যেয়ে!"

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন, "আমি এ নির্দেশ পেয়ে পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে লেগে গেলাম। প্রত্যহ আমি ভিক্ষা করতে যাই, যাকিছু লোকে দেয়, তা নিয়ে ফিরে আসি হযরত শায়খীর নিকট। তিনি এগুলো আবার গবিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। রাতের বেলা তিনি আমাকে ক্ষুদার্ত রাখেন। এক বছর এভাবে পার হওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "এখন আমি তোমাকে আমার খানক্বায় অবস্থানের অনুমতি দিলাম। তবে একটি শর্ত আছে! তুমি অন্যান্য মুরিদ ও শায়খদের খিদমাত করবে।"

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, "এরপর আমি এক বছর খানক্বার সবার খিদমত করি। হযরত শায়খ এবার বললেন, "হে আবু বকর! নিজের ব্যাপারে এখন তোমার ধারণা কী?" জবাব দিলাম, "ইয়া শায়খী! আমি দেখছি, প্রভুর সৃষ্ট সকল প্রাণীর চেয়ে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি আমি।" হযরত মন্তব্য করলেন, "এখন, তোমার ঈমান পূর্ণ হলো।"

এ পর্যায়ে এসে হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ কামালতের এমন উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করলেন যে, ইচ্ছে হলে তিনি জুব্বার হাতা চিনি দ্বারা পরিপূর্ণ করতে পারেন। তিনি রাস্তায় চোখে পড়া সকল বাচ্চাদের মুখে একেকটি চিনির টুকরো তুলে দিতে থাকেন। তাদের মুখে চিনির টুকরো দেওয়ার পূর্বে বলতেন, "বলো- আল্লাহ!"

এরপর তিনি তাঁর জুব্বার হাতা ভরে দিতেন দিরহাম ও দিনার দ্বারা। তিনি বলতেন, "যে কেউ একবার 'আল্লাহ' বলবে, আমি তার মুখ স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ করবো।"

এভাবেই হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ সুলুকের রাস্তায় কঠোর সাধনার মাধ্যমে মা'রিফাতের মুক্তার সন্ধান পেলেন।[৫৭]

১৮. সবার কল্লা কাটবো: একদিন তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাস্তায় ছুটতে লাগলেন। চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, "যে কেউ 'আল্লাহ' নাম উচ্চারণ করবে, আমি এই তরবারি দ্বারা তার কল্লা কেটে ফেলবো!

লোকজন জিজ্ঞেস করলো, "কী হে আবু বকর! ইতোমধ্যে তুমি সবাইকে চিনি ও স্বর্ণের টুকরো দিলে 'আল্লাহ' বলার জন্য। এখন কেউ 'আল্লাহ' বললে তুমি মাথা কেটে দিতে চাও?"

তিনি জবাব দিলেন, "তখন আমি মনে করেছিলাম, সবাই তাঁর নাম উচ্চারণ করে সত্যিকার অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে। এখন আমি বুঝলাম, তারা তাঁর পবিত্র নাম

[৫৭] হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ, "তাজকিরাতুল আউলিয়া"- হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহর জীবনী অধ্যায়।

উচ্চারণ করে বে-খেয়ালে ও অভ্যাস হেতু। আমি কীভাবে একটি অপবিত্র জিহ্বা দ্বারা তাঁর নাম উচ্চারণ করতে অনুমতি দিই?"

১৯. কবিতা আবৃত্তি: এক ব্যক্তি হযরত শিবলীর নিকট আসলেন। তিনি শুনতে পেলেন হযরত নিম্নোক্ত কবিতাটি সজোরে আবৃত্তি করছেন।

"যার অভ্যেস হয়ে গেছে নিকটবর্তী থাকা
সে-কী কখনো দূরত্ব সইতে পারে?
তব প্রেম হেতু যে মুগ্ধ হয়েছে
সে-কী তব পর্দাকে সইতে পারে?
এবং যদিও চর্মচোখ তোমায় না দেখে
তবুও হৃদয়নেত্র তোমাকে তো দেখে।"

২০. মজযুব বেশে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ: একদিন তিনি সব স্থানে 'আল্লাহ' নাম লিখতে লাগলেন। হঠাৎ একটি গায়েবি আওয়াজ শুনলেন: "তুমি কতোক্ষণ নাম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? তুমি যদি সত্যিকার অন্বেষী হয়ে থাকো, তাহলে ঐ নামের মালিককে আপন করে নিতে অগ্রসর হও!"

এ কথাগুলো তাঁকে গভীরভাবে ভাবান্বিত করে তুললো। প্রচণ্ড আঘাত হানলো তাঁর অন্তরাত্মায়। সান্ত্বনা ও স্থিতি তাঁর মধ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। তাঁর মধ্যে আল্লাহপ্রেমের ছোঁয়া এতোই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেলো যে, তিনি আধ্যাত্মিক সংক্ষোভে একেবারে কাঁপতে থাকেন। তাঁর তনু-মন-দেহ থেকে স্বভাবিকতা বিলুপ্ত হয়ে গেলো। লেগে গেছে অন্তরে অসীমের প্রেমাগ্নি। রোমাঞ্চকর অনুভূতি হেতু তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে ছুটে চললেন। নিজেকে শেষ করতে হবে! চিরতরে ধ্বংস করে দিতে হবে!

অন্তর্জ্বালা সইতে না পেরে ছুটে চললেন দজলা নদীর দিকে। লাফ মেরে পড়ে গেলেন নদীর পানিতে। কিন্তু বিধি বাম, নদীর পানিও তাঁকে গ্রহণ করলো না। একটি ঢেউ এসে তাঁকে তীরে তুলে দিলো। তিনি ছুটতে থাকেন। জ্বলন্ত অগ্নিতে নিজের দেহকে পুড়িয়ে ফেলতে নিমজ্জিত হলেন। কিন্তু হায়! অগ্নিও তাঁকে দগ্ধ করলো না। তিনি ছুটতে থাকেন, চলে গেলেন জঙ্গলে, যেখানে হিংস্র সিংহরা বাস করে। তিনি এদের সম্মুখে যেয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, এরা এখন আমাকে শেষ কবরে। কিন্তু

একী! সকল সিংহ তাঁকে দেখে পালিয়ে গেলো! কেথায় যাবেন একটুকু সান্ত্বনা পেতে? ছুটে গেলেন এক পাহাড়ের পাদদেশে। দ্রুত আরোহণ করলেন একেবারে শৃঙ্গে। লোফ মেরে পড়ে গেলেন নিচের দিকে! কিন্তু কোত্থেকে প্রচণ্ড বাতাসের এক কুণ্ডলী এসে তাঁকে আকাশে তুলে ভাসাতে থাকে। এরপর ধীর ধীরে জমিনে রেখে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁর উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেলো হাজার গুণ।

চিৎকার দিলেন, "হে আবু বকর! তোমার প্রতি চরম ধিক্কার! তোমাকে না গ্রহণ করে পানি, অগ্নি, হিংস্র জন্তু কিংবা পাহাড়!"

কর্ণগোচর হলো এক অপূর্ব গায়েবী আওয়াজ, "যাকে আল্লাহ গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাকে আর কেউ গ্রহণ করতে পারে না!"

কিছু লোকজন ছুটে আসলো। তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো পাগলাগারদে! চিৎকার দিলো সকলে, "এ ব্যক্তি পাগল!"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের চোখে আমি অবশ্যই পাগল আর তোমরা সবাই প্রকৃতিস্থ। আমার প্রভু আমার পাগলামী আরো বৃদ্ধি করুন এবং তোমাদের প্রকৃতিস্থকে বাড়িয়ে দিন। এ পাগলামী হেতু আমি যেনো আরো কাছে থেকে কাছে চলে যাই তাঁর। আর তোমরা সবাই প্রকৃতিস্থ হেতু চলে যাও তাঁর দূর থেকে দূরে!"

এরপর খলিফা তাঁর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করেন। লোকজন এসে বলপূর্বক তাঁর মুখের ভেতর ঔষধ ঢুকিয়ে গলদ্ধকরণ করায়। তিনি চিৎকার দিলেন: "তোমরা কেনো এমনভাবে এতো কষ্ট করছো? এ রোগ তো এমন নয় যে, কোনো ঔষধ দ্বারা নিরাময় হবে!"[৫৮]

২১. জুহদের অর্থ: হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহকে জুহদ সম্পর্তে প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন, "এটা হচ্ছে গাইরুল্লাহ থেকে কলবকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া।"

---

৫৮ প্রাগুক্ত, ইংরেজি অনুবাদ থেকে, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

২২. হাক্বিক্বাতকে সংরক্ষণ করতে হবে: হযরত আবু বকর আবহুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'কেউ যদি হাক্বিক্বাতের গোপন রহস্যাবলী সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ঐ হাক্বিক্বাতের চোখ তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।'"

২৩. পাথর ছুড়লে বন্ধুরা কী পালায়: হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ তখন কারাগারে। তাঁকে লোহার চেইন দ্বারা পায়ে বেড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। একদল লোক তাঁকে দেখতে গেলেন।

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা কারা?"
তারা বললেন, "আমরা আপনার বন্ধুজন।"

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ তাদের দিকে ছোট ছোট পাথর ছুড়ে মারলেন। তারা সবাই দ্রুত পালিয়ে গেলো। হযরত শিবলী চিৎকার দিলেন, "কোথাকার মিথ্যুকের দল! কটি পাথরের আঘাত লাগার ভয়ে বন্ধুরা কী বন্ধুর কাছ থেকে কখনো পালিয়ে যায়? তোরা তো তোমাদের নিজেদের বন্ধু, আমার নয়!"

২৪. আল্লাহর সুদৃষ্টির কামনায়: একদিন হযরতের মুর্শিদ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে দেখতে গেলেন। লক্ষ করলেন, তাঁর মুরিদ নিজের ভ্রূযুগলের লোম ছিড়ে ফেলছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে আবু বকর! তুমি কী করছো?"

তিনি জবাব দিলেন, "হযরত! হাক্বিক্বাত উন্মোচন হয়েছে। আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি নিজেকে দংশন করছি যাতেকরে, ভুলে হলেও তিনি আমার প্রতি অন্তত একনজর দৃষ্টিপাত করেন।"

২৫. তাসাওউফের উচ্চমার্গের ব্যাখ্যা: তিনি বলেন, "তাসাওউফ হচ্ছে একটি কলব [হৃদয়] যা বিশুদ্ধতার অনুরাগীদের মধ্যে বিশ্রাম নেয় [পবিত্র সত্তার আশ্রয়ে থাকে]; তার চিন্তা-চেতনা আনুগত্যের পর্দায় [আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনে ব্রত থাকে] ঢেকে থাকে; এবং বিপদক্ষণে উদারতা ও আনন্দের চরিত্রকে উন্মুক্ত করে [বিপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ভাবে ও খুশি হয় যে, তিনি তাঁকে স্মরণ করছেন]।"

২৬. সুফি ও ফক্বিরের ব্যাখ্যা: তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, সুফি কে? জবাব দিলেন, "যে কিছুই জিজ্ঞেস করে না [নিরব থাকেন], প্রতিরোধ করে না [আল্লাহর সকল ফায়সালা গ্রহণ করেন] এবং জমাও করে না [টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেন না]- সে-ই হচ্ছে সুফি।" আবার প্রশ্ন করা হলো, ফক্বির কে? জবাব দিলেন, "যে অস্তিত্বহীন [ফানার স্তরে] অবস্থায় বাড়িতে আছে, যেমনটি সে অস্তিত্বহীন অবস্থায় এককত্বের [ওয়াহ্‌দানিয়াতের] মাঝে থাকে।"

২৭. কাবার মালিকের উপাসনা করতে হবে: একদিন দেখা গেলো শিবলী রাহিমাহুল্লাহ একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন। লোকজন প্রশ্ন করলেন, "কোথায় যাচ্ছো, হে আবু বকর?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমি কাবা শরীফ জ্বালিয়ে দিতে ছুটে চলছি! এর ফলে মানুষ শুধুমাত্র কাবার মালিকের উপসনা করবে- কাবার নয়।"

২৮. ঘুঘুর সাথে জিকির: একদা হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ একনাগাড়ে ৭দিন যাবৎ একটি বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে 'হু! হু!' করে জিকির করেন। তাঁর বন্ধুরা প্রশ্ন করলেন, "এ তুমি কী করছো আবু বকর?"

তিনি জবাবে বললেন, "ঐখানে দেখো ঘুঘুটি কী সুন্দর বলছে, কূ! কূ! আর আমি তার সাথে তাল মিলিয়ে বলছি, হু! হু!" সবাই লক্ষ্য করলো, ঘুঘুটি তখন পর্যন্ত ডাক থামায় নি যতক্ষণ না শিবলী রাহিমাহুল্লাহ জিকির থামালেন।

২৯. শ্বাস-নিঃশ্বাস ও চেতনার নিয়ন্ত্রণ: তিনি বলেন, "তরিকতের সালিককে চেতনার মধ্যে লাগাম লাগাতে হবে [চেতনাকে শরীয়তবিরোধী কাজে লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে] এবং শ্বাস-নিঃশ্বাসকে পাহারায় রাখতে হবে [দমে দমে জিকির করতে হবে]।"

৩০. হিম্মাত কেথায় থাকবে: "তোমার হিম্মতকে সাথে রাখো- আগেও নয়, পিছেও নয়।"

৩১. ওয়াইজ শিবলী রাহিমাহুল্লাহ: মা'রিফাতের প্রভাবে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ শুরু করেন ওয়াজ-নসিহত। তিনি মানুষের সম্মুখে ইলমে মা'রিফাতের অনেক গোপন রহস্য উন্মোচন করতে থাকেন। এ খবর হযরত জুনাইদ বাগদাদীর নিকট পৌঁছুলে তিনি চলে গেলেন তাঁর এ মজযুব মুরিদের নিকট। তিনি বললেন, "ওহে আবু বকর! আমাদের নিয়ম হচ্ছে- যা তুমি জনসমক্ষে উচ্চারণ করছো তা দূর পাহাড়ের গুহায় যেয়ে ব্যক্ত করা। তুমি কেনো এ বাজারে এসে এরূপ বকবক করছো?"

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "মাফ করুন, ইয়া শায়খী! আমি ওয়াইজ এবং আমিই শ্রোতা! উভয় জগতে আর কে আছে, শুধু আমি ছাড়া? আরো সূক্ষ্ম করে বলি- এ শব্দগুলো আসছে আল্লাহ থেকে আল্লাহয়- শিবলী তো এখানে কোথাও নেই!"[৫৯]

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, "এটাই যদি হয়, তাহলে তুমি অব্যাহতি পেলে।"

৩২. প্রেমাণুরাগ কিসে নিয়ন্ত্রণ করে: তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "প্রেমাণুরাগকে কোন জিনিস নিয়ন্ত্রণে রাখে?" জবাব দিলেন, "স্বভাবের নিয়ম-নীতি ও পর্দার উন্মোচন।"[৬০]

৩৩. শিবলির তরবারি থেকে রক্ত ঝরে: একদিন শায়খ জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "তুমি যদি নিজের কর্মকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফেরৎ পাঠাতে চাও তাহলে তুমি বিশ্রাম নেবে।" শিবলী রাহিমহুল্লাহ বললেন, "ইয়া শায়খী! যদি আল্লাহর কর্ম আপনার নিকট ফিরে দিতে চান, তবেই আপনি বিশ্রাম নেবেন।" হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, "শিবলীর তরবারি থেকে রক্ত ঝরে পড়ে।"

---

[৫৯] এখানে কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। শিবলী রাহিমাহুল্লাহ সম্পূর্ণ মজযুব অবস্থায় এ কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি তখন এমন এক উচ্চতর স্তরে অবস্থান করছিলেন, যাকে সুফি-দরবেশগণ 'ফানা ফীল ফানা' [বিলুপ্তির মধ্যে বিলুপ্তি] বলেছেন। এ স্তরে শুধু আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই, এমনকি নিজের অস্তিত্বও হারিয়ে যায়। -গ্রন্থকার।

[৬০] প্রেমমত্ত মানুষ মজনু হয়ে যেতো যদি একদিকে স্বাভাবিকতা হারিয়ে যায় আর অপরদিকে হাক্বিক্বাতের পর্দা উন্মোচন না হয়। হযরতের উক্তির ব্যাখ্যা এটাই। -গ্রন্থকার

৩৪. জিকির-মুরাক্বাবার সময় ধ্যান ঠিক রাখার পদ্ধতি: হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই একটি গুহায় যেতেন। সাথে নিয়ে যেতেন এক আঁটি লাঠি। তিনি সেখানে বসে গভীর জিকির-মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হতেন। তাঁর খেয়াল স্থির থাকতো আল্লাহর দিকে। সময় সময় খেয়ালের মধ্যে কিছুটা ব্যত্যয় ঘটলেই একটি লাঠি নিয়ে নিজের শরীরে জোরে আঘাত করতেন। আঘাতের প্রচণ্ডতায় লাঠি ভেঙ্গে যেতো। একদা সবগুলো লাঠি ভেঙ্গে যায়। তিনি তখন গুহার দেওয়ালে নিজের হাত ও পা দ্বারা আঘাত করতে থাকেন।

৩৫. আল্লাহর মা’রিফাত সকল দুঃখ বিদূরণের সূত্র: তিনি বলেন, “যে কেউ আল্লাহর মা’রিফাত লাভ করেছে, তার মধ্য থেকে সকল দুঃখ দূর হয়েছে।”

৩৬. হাক্বিক্বাতের দৃষ্টি অক্ষত: একব্যক্তি এসে তাঁকে বললো, “হে আবু বকর! আপনি আপনার চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন।” তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, যে দৃষ্টিতে আপনাকে দেখেছি সেটি হারিয়েছে। আর যে দৃষ্টিতে আমি হাক্বিক্বাত অবলোক করছি সেটি অক্ষত আছ।”

৩৭. খ্রিস্টান যুবকের কাবাগৃহে প্রবেশ: হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ একদিন বাগদাদের ব্যস্ততম রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, “আমার এক হাজার দিরহামের প্রয়োজন। আমি গরীবদের জন্য জুতো কিনবো ও তাদেরকে নিয়ে হজ্জে যাত্রা করবো। কে আছে এক হাজার দিরহাম সাদ্বকা করার?”

এক খ্রিস্টান যুবক লাফ মেরে দাঁড়ালেন। বললেন, “আমি দিতে রাজী- তবে একটি শর্ত আছে। আপনি আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন।”
তিনি বললেন, “হে যুবক! তুমি তো হজ্জে যাওয়ার জন্য যোগ্য নও।”
যুবক বললেন, “আপনার কাফেলায় কোনো খচ্চর নেই। আমাকে আপনার খচ্চর হিসেবে নিয়ে যান!”

সুতরাং, কাফেলা যাত্রা করলো। খ্রিস্টান যুবকটিও সঙ্গী হলো। তাকে পরানো হলো নেংটি। এতে লাগানো হলো দীর্ঘ একটি কাপড়ে মোড়ানো কৃত্রিম লেজ!

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ যাত্রাকালে খ্রিস্টান যুবককে প্রশ্ন করলেন, "হে যুবক! তোমার কেমন লাগছে?
যুবক বললেন, "হে শায়খ! আমি খুব খুশি। আপনার সাথী হওয়ার ভাবনা আমাকে এতোই খুশি করেছে যে, আমি ঘুমোতে পারছি না।"

যাত্রাকালে কাফেলা বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি করে। খিস্টান যুবক হজ্জযাত্রীদের জন্য জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, কাটা সরিয়ে ফেলা, বিছানা করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে থাকেন। মিক্বাতে পৌঁছুয়ে যখন ইহরাম পরার সময় আসলো, তখন খ্রিস্টান যুবকও হজ্জযাত্রীদের মতো ইহরাম পরে নিলেন। এরপর নিরাপদে কাফেলা মক্কা মুকাররমায় উপনীত হলো।

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ খ্রিস্টান যুবকবে বললেন, "হে যুবক! তোমার কোমরবন্ধ থাকায় আমি তোমাকে বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতে দিতে পারি না।"

একথা শুনে যুবক কাঁদতে লাগলেন। সিজদায় পড়ে বললেন, "হে প্রভু! হযরত শিবলী আমাকে তোমার ঘরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না।"

একটি গায়েবী আওয়াজ শুনা গেলো, "হে শিবলী! আমি তাকে বাগদাদ থেকে এখানে নিয়ে এসেছি। জ্বালিয়ে দিয়েছি তার অন্তরে প্রেমের আগুন। আমি নিয়ে এসেছি তাকে আমার ঘরের নিকট স্নেহ-মমতা দিয়ে। শিবলী! তুমি দূরে সরে যাও। হে আমার প্রিয়জন! তুমি প্রবেশ করো আমার গৃহে!"

খ্রিস্টার যুবক বাইতুল্লাহর ভেতর প্রবেশ করলো। কাফেলার যাত্রীরাও একে একে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসলেন। কিন্তু ঐ যুবক বের হচ্ছিলেন না। শিবলী রাহিমাহুল্লাহ ডাক দিলেন, "হে যুবক! বেরিয়ে এসো।"

ভেতর থেকে জবাব আসলো, "তিনি আমাকে বের হতে দিচ্ছেন না। প্রত্যেকবার আমি কাবাগৃহের দরোজার দিকে যেয়ে দেখি, এটি বন্ধ। আমার কী হবে আমি জানি না।"

কাফেলা ফের যাত্রা করলো। খ্রিস্টান যুবক মক্কা শহরেই রয়ে গেলেন। আগেই তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

৩৮. যুবক মুরিদের মৃত্যুর ঘটনা: একদিন হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ! আল্লাহ! বলে সরবে জিকির করছিলেন। তাঁর একজন যুবক মুরিদ প্রশ্ন করলেন, "হযরত! আপনি কেনো বলছেন না, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।"

হযরত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এরপর বললেন, "আমি অত্যন্ত ভীত-শঙ্কিত আছি। যদি 'লা-ইলাহা' [ইলাহ নেই] পর্যন্ত বলে আমার দম চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, আর আমি বলতে অপারগ হই 'ইল্লাল্লাহ' [শুধু আল্লাহ ছাড়া], তাহলে উপায় কী হবে? আমি তো ধ্বংস হয়ে যাবো।"

এ কথাগুলো যুবকের অন্তরে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। তিনি কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো। আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত এ মৃত্যুতে হযরত শিবলীও বিচলিত হলেন। তবে তিনি তখনো গভীর হালের অবস্থায় ছিলেন। লোকজন ছুটে এসে বললো, "আবু বকর এ খুনের জন্য দায়ী!" তারা তাঁকে ধরে খলিফার দরবারে হাজির করলো। শিবলী রাহিমাহুল্লাহ একজন মদ্যপের মতো মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খলিফার সম্মুখে দাঁড়ালেন।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, "হে শিবলী! তোমার কী বক্তব্য আছে?"

তিনি বললেন, "হে খলিফা! এটা একটি আত্মা ছিলো যাকে প্রেমাগ্নি ভষ্মিভূত করেছে। মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ফিরে যেতে এটি এতোই বিভোর ছিলো যে, সে সফল হলো। এটি এমন একটি আত্মা যে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলো। গ্বইরুল্লাহর সকল সম্পৃক্ততা থেকে চিরমুক্ত। এটা ছিলো একটি আত্মা, যে তার দেহপিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়েছে সঠিক ক্ষণে। থাকতে পারে নি সেথায় ক্ষণকালও অতিরিক্ত। এটি মুহূর্তের জন্য হাক্বিক্বাতের উপস্থিতি হেতু বজ্রপাতে আক্রান্ত হয়েছে। এতে তার অভ্যন্তর থেকে অভন্তরে নূরের ঝলক লেগেছে। তার পাখি-সদৃশ রূহ আটকাপড়া দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গেছে। এতে শিবলীর অপরাধ বা পাপ কী হতে পারে? হে খলিফা!"

খলিফা বললেন, "এক্ষুণি শিবলীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাও। তাঁর কথাগুলো আমার আত্মাকে নাড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি সিংহাসন থেকে পড়ে যাবো। তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও!"

৩৮. মুর্শিদ ও শাগরিদের অসুস্থতা: একদা হযরত জুনাইদ ও হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা উভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একজন খ্রিস্টান চিকিৎসক শিবলী রাহিমাহুল্লাহতে দেখতে আসেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী বেদনা অনুভব করছেন?"
শিবলী রাহিমাহুল্লাহ: "কিছুই নয়!"
ডাক্তার: "আপনি কী বলছেন?"
শিবলী রাহিমাহুল্লাহ: "বললাম তো, আমার কেনো বেদনা নেই।"

ডাক্তার চলে গেলেন হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর শয্যাপাশে। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী বেদনা অনুভব করছেন?"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ ডাক্তরকে তাঁর রোগ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত করলেন। খ্রিস্টান ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করে চলে গেলেন। এরপর উভয় বুজুর্গ একটি জায়গায় বসলেন। হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ প্রশ্ন করলেন, "ইয়া শায়খী! একজন খ্রিস্টানের নিকট আপনি সকল বেদনার কথা বললেন কেনো?"
তিনি জবাব দিলেন, "এর ফলে সে হয়তো অনুধাবন করবে যে, যদি তাঁর [আল্লাহর] বন্ধুকে এভাবে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি [আল্লাহ!] তাঁর শত্রুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবেন!" এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেনো নিজের ব্যথার বর্ণনা তাকে দিলে না?"

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। কীভাবে বন্ধুর শত্রুর নিকট নিজের অভিযোগ তুলে ধরবো!"

৩৯. বীচিহীন আখরোট নিয়ে ঝগড়া: একদিন হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলো দুটি বালকের সঙ্গে। তারা একটি খোলসযুক্ত আখরোট নিয়ে ঝগড়া করছিলো। উভয়ে ছিলো এটির দাবিদার। তিনি

আখরোটটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, “থামো! ধৈর্য ধরো। তোমাদের উভয়কে এটি ভাগ করে দিচ্ছি। এর ভেতর দুটি বীচি আছে।”

তিনি শক্ত আখরোটটির খোলস ভেঙ্গে ফেললেন। হায়! এ কী? ভেতরে কিছুই নেই যে! সাথে সাথে একটি গায়েবী আওয়াজ শুনা গেলো, “ভাগ করো, যদি তুমি ভাজক হয়ে থাকো!”

লজ্জিতমুখে শিবলি রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, “একটি শূন্য আখরোটের জন্য এতো ঝগড়া! শূন্যকে ভাগ করে ভাজক হওয়ার এতো ভঙ্গিমা!”

৪০. তাওহিদের ব্যাখ্যা কী: তাঁকে তাওহিদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি জবাব দিলে, “যে কেউ তাওহিদকে কোনো সংজ্ঞা দ্বারা ব্যাখ্যা দেয়, সে সঠিক রাস্তা হারিয়েছে। যে কেউ একে ইশারার মাধ্যমে বুঝাতে চায়, সে একজন কানকথাদাতা। যে কেউ এটা সম্পর্কে আলোচনা করে সে বুদ্ধিমান। যে কেউ এ ব্যাপারে নিরব সে অজ্ঞ। যে কেউ ভাবে সে তাওহিদে উপনিত হয়েছে সে ফল পায় নি। যে কেউ ভাবে সে এর কাছে গিয়েছে, সে আসলে দূরে। আর তুমি যদি একে মুখে ব্যাখ্যা করো ও ধীশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করো, তহলে এটি তোমার মতো একটি কৃত্রিম বস্তু!”

৪১. আমার দেহ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করে দাও: বর্ণিত আছে, হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “পরোপকারিতা কী?” তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “আমি আল্লাহকে বলেছি, জাহান্নামের উপর আমার দেহকে একটি সেতুর মতো বানিয়ে দাও। এর ওপর দিয়ে পাপিরা বেহেশতে চলে যাবে। কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।”

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহকে উক্ত কথাটি কেউ একজন জানালো। তিনি বললেন, “কিন্তু আমি আল্লাহকে বলেছি, হে প্রভু! আমার দেহ দ্বারা সমগ্র জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করে দিন, যাতেকরে তোমার আর কোনো বান্দাহ এতে প্রবেশের সুযোগই পায় না!”

৪২. হযরত মনসুর হাল্লাজ ও হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা: শায়খ আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট বন্ধু ও

পীরভাই ছিলেন। উভয় ওলির পীরসাহেব ছিলেন হযরত আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ।

হযরত হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহ যখন 'আনাল হাক্ব' [আমিই সত্য] বলে চিৎকার দিলেন তখন যুগের প্রায় সকল উলামা ও ওলিআল্লাহগণ বললেন, এটা অতিবাড়াবাড়ি। এমনকি তাঁর পীরসাহেব জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহও বললেন, 'তিনি মাতাল হয়ে গেছেন।' শিবলী রাহিমাহুল্লাহকেও জেলে প্রেরণ করা হয় একজন 'পাগল' ব্যক্তি হিসেবে। তিনি প্রথমে হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর উক্ত চিৎকারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "শিবলীও 'মাতাল হয়ে' সমর্থন করেছেন। এরপর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি [শিবলী] হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন।"

মোটকথা, উভয় ওলি 'প্রেমমত্ত' অবস্থায় উক্ত কথাটি সমর্থন করেছিলেন। শিবলী রাহিমাহুল্লাহ সময়মতো এ মগ্নতা থেকে বেরিয়ে আসেন কিন্তু হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় ছিলেন। তিনি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরে আসেন নি।

যাক, যেদিন হযরত মনসুর রাহিমাহুল্লাহকে ফাঁসির মঞ্চে নেওয়া হয়েছিল, এর আগেরদিন জেলে থাকাবস্থায় তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। উচ্চ হালের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। পরের দিন চেইনে বাঁধা থাকাবস্থায়ই নৃত্য করতে থকেন। তাঁকে এ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হলো।

তখন অনেক লোক তামাশা দেখতে হাজির হয়েছে। হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ এগিয়ে যেয়ে হযরত মনসুর রাহিমাহুল্লাহর সম্মুখে কিবলামুখী করে একখানা জায়নামায বিছিয়ে দিলেন। তিনি দুরাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর দল্লাজের নির্দেশে হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর ওপর মেঘের মতো পাথর নিক্ষেপ শুরু হয়। শিবলী রাহিমাহুল্লাহ এ দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। এদিকে হযরত হাল্লাজ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞান হারান নি। তাঁকে হাজারবার বেত্রাঘাত করা হলো।

শিবলী রাহিমাহুল্লাহর জ্ঞান ফেরার পর দাঁড়ালেন। সবাই তখনও অসংখ্য ছোটবড়ো পাথর প্রচণ্ড বেগে মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর গায়ে নিক্ষেপ করছিলো। তাঁর শরীর

ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ঝরতে থাকে রক্ত অঝোর ধারায়। কিন্তু হযরত মনসুর রাহিমাহুল্লাহ এ করুণ অবস্থার মধ্যেও অট্টহাসি দিচ্ছিলেন।

এরপর মুহাব্বাতের নিদর্শন স্বরূপ হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বন্ধুর দিকে একটি গোলাপ ফুল ছুড়ে মারলেন। হযরত মনসুর এটি লক্ষ করলেন। তিনি কেঁদে ফেললেন। করুণ দৃষ্টিতে শিবলী রাহিমাহুল্লাহর দিকে তাকালেন। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো, "হে মনসুর! এখন আপনি কাঁদছেন কেনো? গায়ে পাথর পড়ার সময় হাসলেন! পাগল হয়ে গেছেন? শিবলী রাহিমাহুল্লাহ তো একটি ফুল নিক্ষেপ করেছেন মাত্র!"

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "যে লোকগুলো পাথর নিক্ষেপ করছে, তারা তো জানে না কী করছে? কিন্তু আমার বন্ধু শিবলী তো সব জানেন! তিনি কীভাবে ফুল নিক্ষেপ করলেন? এ ফুল আমার দেহে হাজার পাথর থেকেও বেশি ব্যথা দিয়েছে! আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। এ ফুলটি নিক্ষেপ করার কারণে তিনি প্রভুর দরবারে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন! অন্যদেরকে প্রভু মাফ করে দেবেন, করণ তাঁদের এ আমল হচ্ছে অজ্ঞতার মধ্যে- খলিফার নির্দেশ মানতে তারা বাধ্য। তাদের অন্ধত্বের ফলে তারা এটি করতেও পরে। কিন্তু শিবলী? তিনি তো আ'রিফ! আমি তাঁরই জন্য কাঁদছি। এ বিশাল জনতার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাপকাজ করলেন!"

মত্যুকালীর অবস্থা[৬১]

তাঁর ইন্তিকালের তারিখটি ছিলো, হযরত আবদুর রহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহর মতে, ৩৩৪ হিজরির জিলহাজ্জ মাসে। অন্যরা বলেছেন, দিনটি ছিলো উক্ত মাসের শেষ দিন শুক্রবার। ইবনে নাফি' বলেন, মৃত্যুর সন ছিলো ৩৩৫ হিজরি। খতিবে বাগদাদ রাহিমাহুল্লাহ, তারিখে বাগদাদে বলেন, "প্রথমোক্ত সনটি সঠিক। এ সময় তাঁর বয়স হলেছিলো ৮৭ বছর। তাঁকে বাগদাদের খাইরাজান মাকবারায় সমাহিত করা হয়।"

[৬১] বর্ণিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন হযরত কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তারতিবুল মাদারিক' [আয়শা বিউলি কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত] নামক গ্রন্থে। সূত্র: sunnah.org

হযরত খুলদি বর্ণনা করেন, "আমি হযরতের খাদিম বাকরামকে প্রশ্ন করলাম, 'তাঁর মৃত্যুকালীন অবস্থা কী ছিলো?' তিনি জবাব দেন, 'তিনি আমাকে বললেন, "হে বাকরাম! আমার এক দিরহাম ঋণ অপরিশোধিত ছিলো, মালিককে না পেয়ে পরিশোধ করতে পারি নি। এর বদলে আমি এক হাজার দিরহাম সাদক্বা করেছি ঐ ব্যক্তির নামে। এ মুহূর্তে এ ব্যাপারটি ছাড়া আমার অন্তরে আর কোনো ভাবনা নেই।"

এরপর তিনি পুনরায় বললেন, "হে বাকরাম! আমাকে ওযু কিরিয়ে দাও। নামায আদায় করবো।" আমি ওযু করালাম, তবে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে ভুলে গেলাম। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আমার হাতে ধরে তা দাড়ির উপর রাখলেন। এরপরই তিনি এ মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর চিরকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের নিকট চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।'"

এরপর হযরত খুলদি রাহিমাহুল্লাহ কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলবেন, যিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও শরীয়তের একটি আদবের খেলাফ পর্যন্ত করেন নি?"

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর খাদিম বাকরাম আরো বলেন, "জিলহাজ্জ মাসের শেষ শ্রক্রবার শায়খী শরীরের ব্যথা হেতু কিছু পাতলা অনুভব করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কী [জুমুআ'র নামায আদায়ের জন্য] মসজিদে যাবো?" জবাব দিলাম, "হ্যাঁ।" তিনি আমার কাঁধের ওপর ভর করে মসজিদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। আমরা যখন অনুলেখদের ইমারতের নিকট আসি তখন একব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। হযরত তাকে বললেন, "আগামীকাল শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করবো। কিছু কাজ আছে।" নামায শেষে আমরা ঘরে ফিরে আসি। তিনি পরের দিন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়লেন। এদিন দিবাগত রাতই তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে বলা হলো, 'এই এই স্থানে একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলি বাস করেন। তিনি লাশের গোসল দেন।'

আমি ভোর হওয়ার পূর্বেই লাশের গোসল প্রদানকারী ওলিআল্লাহর ঘরের দরোজার সামনে যেয়ে কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে তিনি বললেন, "আবু বকর শিবলীর মৃত্যু হয়েছে, তাই না?" আমি অবাক হয়ে জবাব দিলাম, "জী ... হযরত! তিনি বিদায় হয়েছেন।" তিনি বাইরে আসলেন। আমি এবার আরো আশ্চর্য হলাম, তিনিই তো

গতকালে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিলো, সে-ই শায়খ! আমি বলে উঠলাম, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! কী বিরাট বিস্ময়!" এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "রাতের গভীরে যাঁর উপাসনা করেন তাঁর কসম! আপনি কীভাবে জানলেন, হযরত শিবলী ইন্তিকাল করেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "নির্বোধ কোথাকার! শিবলী রাহিমাহুল্লাহর আর কী কাজ থাকতে পারে আমার সাথে? তিনি কী গতকাল জুমুআ নামাযে যাওয়ার পূর্বে আমাকে বলেন নি, আগামীকাল আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন, কিছু কাজ আছে?"

হে প্রভু! আপনার প্রিয় বান্দা ও আশিক হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর রূহানী ফায়েজ দ্বারা এ অধমকে মালামাল করুন। উপকৃত করুন এ গ্রন্থের সকল পাঠককেও। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঘটনাবলী বর্ণনা করতে যেয়ে অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে অনাকাঙ্ক্ষিত এসব ভুলের জন্য আমাকে মাফ করুন। হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লার গোপন রহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দুজন মাত্র খলিফার নাম বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন:

১. হযরত শায়খ আবদুল আজিজ বিন আসআদ ইয়ামনী তামিমী রাহিমাহুল্লাহ।

২. হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

আলহামদুলিল্লাহ! বাগদাদের শায়খ, মজযুব ইলাল্লাহ, ওলিকূল শিরোমণি হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকানুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত আবদুল আজিজ বিন আসাদ ইয়ামনী তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইনশাআল্লাহ! আমরা তাঁর জীবন ও সাধনার ওপর পরবর্তীতে আলোচনা করবো। হে আল্লাহ! আমরা সর্বদাই আপনার পক্ষ থেকে তাওফিক প্রাপ্তির মুখাপেক্ষী।

শায়খ আবদুল আজিজ বিন আসাদ ইয়ামনী তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৩৩২ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

হযরত আবদুল আজিজ বিন আসাদ ইয়ামনী তামিমী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বাগদাদের বিখ্যাত ওলি হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা। ইয়ামনে জন্ম নেওয়া এই ওলিআল্লাহ উচ্চ পর্যায়ের জাহিদ ও আবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর খুব বেশি লেখালেখি হয় নি। এরপরও পাঠকদের অন্তরের খোরাক হিসেবে যেটুকু সম্ভব তথ্যাদি আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে তুলে ধরছি। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

বংশপরিচয় ও জন্ম

বনী তামিম হচ্ছে আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম হচ্ছেন এ বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষ। প্রাচীন যুগে এ বংশের একজন প্রসিদ্ধ গোত্রপতির নাম ছিলো আত-তামিম। তাঁরই নামানুসারে গোত্রের নামকরণ হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম পর্যন্ত তার নসবনামা হচ্ছে এই:
তামিম ইবনে মূর ইবনে ‘ঈদ, ইবনে আমর ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার[৬২] ইবনে নাজির ইবনে মা’আদ ইবনে আদনান, ইবনে ইসমাঈল [আ.] ইবনে ইব্রাহিম [আ.]।

ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতকের দিকে আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে বনী তামিম গোত্রের বসবাস ছিলো। হিজরতের আট বছর পর এ গোত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী তামিম গোত্রের প্রশংসা করেছেন। একটি হাদিসে আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي، عَلَى الدَّجَّالِ» ، قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا» ، وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»

---

[৬২] মুদার কুরাইশ বংশের একজন ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন।

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বনী তামিম সম্পর্কে তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনার পর তাদেরকে ভালোবেসে যাচ্ছি: "তারা আমার উম্মাহর মধ্যে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সর্বাধিক দৃঢ়।" যখন তাদের জাকাতের টাকা আসলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটা আমাদের কওমের জাকাত।" আর যখন এদের একজন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মালিকানায় বন্দীনী ছিলো। তিনি [সা.] বললেন: "এ মহিলাকে মুক্ত করো! কারণ সে হচ্ছে ইসমাঈল [আ.] এর বংশধর।"[৬৩]

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পত্রাদি, তাফসিরুল কুরআন, বর্ণনা ও বাণীর সংকলন 'নাজহাতুল বালাগাহ'[৬৪] কিতাবের পত্র নং ১৮-তে আছে, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "মনে রেখো, বনী তামিম এমন একটি বংশ যাদের তারকা এখনও অস্তমিত হয় নি। তাদের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তির মৃত্যু হলে অপর আরেকজন তার স্থলাভিষিক্ত হন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর বা এমনকি ইসলামপূর্ব যুগেও এরা কখনো নীচ, হিংসুক কিংবা পরশ্রীকাতর ছিলেন না। তাদের মর্যাদা উঁচু ছিলো। আমাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান।"[৬৫]

উক্ত বনী তামিম বংশে দুজন বিখ্যাত ওলির জন্ম হয়। এদের একজন হচ্ছেন আবদুল আজিজ হারিস বিন আসাদ ইয়ামনী তামিমী রাহিমাহুল্লাহ। আর অপরজন হচ্ছেন তাঁরই পুত্র হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ ইয়ামনী তামিমী রাহিমাহুল্লাহ। উভয়ে ছিলেন স্ব-স্ব যুগের তরিকতের শাইখুল মাশাইখ।

হযরত আবদুল আজিজ তামিমী রাহিমাহুল্লাহ কতো সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় নি। তবে তিনি যে ইয়ামনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

---

[৬৩] সহীহ বুখারি, হাদিস নং ২৫৪৩, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা।

[৬৪] এ কিতাবে ২৪১টি বয়ান, ৭৯টি পত্র ও ৪৮০টি বাণী আছে। এর সংকলক ছিলেন, হিজরি ৪র্থ শতকের লেখক শরীফ রাযী। লেখক শিয়া মতাবলম্বী হওয়ায় সবগুলো বর্ণনা সুন্নিদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। তবে এখানে বর্ণিত বর্ণনাটির ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য আছে বলে আমাদের জানা নেই।

[৬৫] তথ্যসূত্র: revolvy.com

এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা শেষে তখনকার আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে চলে যান। সেসময় ওলিকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান শাগরিদ ও খলিফা হযরত আবুবকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ উচ্চ পর্যায়ের মযজুব ওলি হিসেবে বাগদাদ শহরে সুপরিচিত ছিলেন।

বাগদাদে বসবাস শুরুর পর তিনি হযরত আবু বকর রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণের জন্য হযরতের মুরিদ হন।

বিশিষ্ট আবিদ

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় অবস্থান করে হযরত তামিমী রাহিমাহুল্লাহ কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন। অচিরেই তিনি ‘আবিদ’ হিসেবে সবার নিকট পরিচিতি অর্জন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চ মাক্বামাতের কথা সবাই জানতেন।

খলিফা

হযরত তামিমী রাহিমাহুল্লাহর একমাত্র জানা খীলফা ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ ইয়ামনী তামিমী রাহিমাহুল্লাহ।

ইন্তিকাল

হযরত আবদুল আজিজ হারিস বিন হাসান ইয়ামনী তামিমী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু সন ছিলো ৩৩২ হিজরি। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাগদাদেই তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর গোপন রহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন।

ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকানুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ ইয়ামনী তামিমী রাহিমাহুল্লাহ। আমরা তাই তাঁরই জীবনালোচার প্রয়াস পাচ্ছি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর দরবারে আমরা সাহায্য কামনা করি।

হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ ইয়ামনী তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু- ৪২৫ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শায়খ হযরত আবু সাঈদ মুবারক বিন আলী মাখদুমী রাহিমাহুল্লাহ থেকে হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত তরিকতের সিলসিলা '**জুনাইদিয়া**' নামে পরিচিত ছিলো। শায়খুল মাশাইখ হযরত আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর নামানুসারে এ নামকরণ। সুতরাং হযরত আবুল ফজল তামিমী রাহিমাহুল্লাহকে বিভিন্ন কিতাব ও লেখায় **জুনাইদিয়া** তরিকার শায়খ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জন্ম

তযরত আবুল ফজল রাহিমাহুল্লাহর পিতা ছিলেন যুগের আরেক শীর্ষস্থানীয় শাইখুল মাশাইখ হযরত আবদুল আজিজ বিন হারিস বিন আসাদ তামিমী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তাঁর তরিকতের শায়খও ছিলেন। আমরা ইতোমধ্যে তাঁর জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

হযরত আবুল ফজল রাহিমাহুল্লাহর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় নি। তবে তিনি যে ইয়ামনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চিত। এ কারণেই তাঁর নামের শেষে 'ইয়ামনী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাঁর জন্ম সন নিয়েও মতানৈক্য আছে জীনবীকারদের মধ্যে। এক বর্ণনামতে ২২৭ হিজরি সনে তাঁর জন্ম হয় এবং ৪২৫ হিজরি ইন্তিকাল করেন। এ হিসেবে তিনি ১৯৮ বছর জীবিত ছিলেন![৬৬] আমাদের মতে এ তথ্যটি সঠিক নয়। প্রায় দুশ বছর কেউ আখিরী জামানায় জীবিত থাকতে পারেন- তা সঠিক বলে মনে হয় না। তবে তাঁর মৃত্যুর হিজরি সন সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

জন্মের পর হযরতের নাম রাখা হয় আবদুল ওয়াহিদ। পরবর্তীতে তিনি আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ ইয়ামনী তামিমী নামে পরিচিত হন। তাঁর পিতার মতো তিনিও 'হানাফি' ফিকহের অনুসারী ছিলেন।

---

[৬৬] দেখুন: https://www.revolvy.com/page/Abu-Al-Fazal-Abdul-Wahid-Yemeni-Tamimi

হযরতের রূহানিয়্যাত

তাঁর তরিকতের মুর্শিদ ছিলেন স্বীয় পিতা হযরত আবদুল আজিজ তামিমী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি শায়খের পক্ষ থেকে খিলাফত লাভও করেন। তবে তিনি বাগদাদে যেয়ে সেখানকার বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহর সুহবত লাভেও ধন্য হন। শিবলী রাহিমাহুল্লাহও তাঁকে খিলাফত দান করেন। এ ব্যাপারে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "আবদুল ওয়াহিদ তামিমী রাহিমাহুল্লাহ খিলাফতের খিরক্বা পরিধান করেন তাঁর পিতা আবদুল আজিজ তামিমী ও আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে। এটি তরিকতের বিভিন্ন সিলসিলায় বিদ্যমান আছে।"[৬৭]

হযরত আবুল ফজল রাহিমাহুল্লাহ জীবনের অধিকাংশ সময় ভ্রমণের মধ্যে কাটিয়েছেন। তিনি মানুষকে হিদাআতের দিকে ডাক দেন। তাঁর হাতে অসংখ্য মানুষ বাইআত গ্রহণ করে উপকৃত হয়। মানুষ হযরতকে 'খাদিমুশ শারীয়াহ' [শরীয়তের খাদিম], 'সালিকুত তারিক্বাহ' [তরিকতের সালিক] এবং 'ওয়াক্বিফুল হাক্বিক্বাহ' [হাক্বিক্বাত উন্মোচনকারী] উপাধিতে ভূষিত করে।[৬৮]

হযরতের অনুপম চরিত্র মাধুর্য

হযরত আবুল ফজল রাহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আখলাক্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটাই খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মতো ছিলো। তাঁর যুগে তিনি ছিলেন বড়ো মাপের একজন 'আবিদ, জাহিদ এবং ইমামুত তাক্বওয়া। সারাটি জীবন তিনি সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করেছেন।[৬৯]

মানুষকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান

আগেই উল্লেখ করেছি, হযরত আবুল ফজল তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনের অধিকাংশ সময় সফর করে কাটিয়েছেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে

---

৬৭ মাসালিকুস সালিহীন।

৬৮ www.revolvy.com

৬৯ 'খাজিনাতুল আসফিয়াহ', খ. ১, পৃ. ৮৯।

শরীয়ত ও তরীকতের রাস্তায় চলার আহ্বান ও উৎসাহিত করা। মূলত এ দুটো রাস্তা সঠিকভাবে পালনের মধ্যেই নিহীত আছে হিদায়াত ও মুক্তির উপায়। শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া যেমন তরিকতের সালিক হওয়া যায় না, তেমনি শুধুমাত্র শরীয়তের অনুসরণই কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে আরোহণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তরিকতের মাশাইখে আজম বলেছেন, শরীয়ত ও তরিকত মূলত একই বৃক্ষের দুটি শাখা মাত্র। উভয়টি মিলেই পুরো বৃক্ষ।

হযরত তামিমী রাহিমাহুল্লাহ সে যুগের আব্বাসী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত বিরাট ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'জুনাইদিয়া' [পরবর্তীতে ক্বাদিরীয়া] তরিকার বিকাশ ঘটে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায়। অসংখ্য মানুষকে মুরিদ করে আল্লাহপ্রেমের ছোঁয়া দ্বারা মালামাল হতে তিনি সাহায্য করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে একদল মুবাল্লিগীনের জামাআত সৃষ্টি হয়। এরা আব্বাসী খিলাফতের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান।[৭০]

খলিফা

আমরা অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও হযরত আবুল ফজল তামিমী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদান ও খুলাফাবৃন্দের কেনো তালিকা আবিষ্কার করতে পারি নি। তবে ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকা সম্পর্কিত সকল কিতাবেই তাঁর একজন খলিফার নাম উল্লেখিত হয়েছে। তিনি হচ্ছেন শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ আবুল ফারাহ তারতুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরতের ইন্তিকাল

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[৭১] তবে কারো মৃত্য আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে আর কারোরটি হয় ভীষণ ভয়ঙ্কর। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয়প্রার্থী। আল্লাহর বন্ধুজনরা তো মায়াবী এ দুনিয়া থেকে প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে ফিরে যেতে সদাউদগ্রীব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেছেন: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ -"দুনিয়া হচ্ছে

---

৭০ প্রাগুক্ত।

৭১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫।

মু'মিনদের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরদের জন্য জান্নাত।"[৭২] হে আল্লাহ! দুনিয়ার এ কয়েদখানায় আমাদেরকে যতোদিন জীবিত রাখবেন ততোদিন মু'মিন হিসেবে রাখুন এবং মৃত্যুর সময় আমাদের দৌলতে ঈমানকে সংরক্ষণ রেখে খাতিমা বিল খাইর করে আপনি ও আপনার বন্ধুজনদের সান্নিধ্যে নিয়ে যান। আমীন।

যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ ইয়ামনী তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মাহবুবের সান্নিধ্যে চলে যান ৪২৫ হিজরি সনের ২৬শে জমাদিউল আখির মাসে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই আপনজনের মাক্বামাত আরো উন্নত করে দিন।

ক্বাদিরীয়া তরিকামতে সিলসিলার পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ আবুল ফারাহ তারতুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অতএব, পরবর্তীতে আমরা হযরত তারতুসী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনার আশারাখি। মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা: হে আল্লাহ! একমাত্র আপনার সন্তুষ্টিকল্পে উদ্বুদ্ধ আমাদের এ আকাঙ্ক্ষাটুকু পূর্ণ করুন। আমীন।

[৭২] সহীহ মুসলিম [كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ], হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ আবুল ফারাহ তারতুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত- ৪৪৭ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

সাহেবে কারামত হিসেবে পরিচিত হযরত মুহাম্মদ ইউসুফ আবুল ফারাহ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহ যুগের একজন প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহ ছিলেন। সমসাময়িক উলামায়ে কিরাম ও মাশাইখে আজম তাঁকে যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় সুফি-দরবেশ হিসেবে সম্মান করতেন।

জন্ম

মুহাম্মদ ইউসুফ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহ ৪০৭ হিজরি সনে বর্তমান সিরিয়ার তারতুস নামক একটি শহরে জন্মগ্রহণ করনে। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইউনুস তারতুস। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইউসুফ। তাঁর কুনিয়াত হলো আবুল ফারাহ। এছাড়া তিনি আলাউদ্দিন নামেও পরিচিত ছিলেন।

যুগের কুতুব

প্রত্যেক যুগেই একজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওলিআল্লাহ বিদ্যমান থাকেন। তাসাওউফের ভাষায় তিনি হচ্ছেন কুতুব। হযরত মুহাম্মদ ইউসুফ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর যুগের কুতুব[৭৩] হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

ইন্তিকাল

হযরত ইউসুফ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় নি। মাত্র ৪০ বছর বয়সে তিনি এ মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হিজরি ৪৪৭ সনের শা'বান মাসের ৪ তারিখ তিনি নিজ জন্মস্থান তারতুসে ইহলোক ত্যাগ করেন। এ সময় আব্বাসী খলিফা ক্বাইউম বি আমরিল্লাহ বাগদাদের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত ইউসুফ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহ সিরিয়ার তারতুসেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের 'আলা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন।

---

৭৩ 'কুতুব' [قطب] এর শাব্দিক অর্থ 'দণ্ড' বা 'খুঁটি'। পারিভাষিক অর্থ 'সর্বোচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত ওলিআল্লাহ'।

খলিফা

হযরত মুহাম্মদ ইউসুফ আবুল ফারাহ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহর একজন মাত্র খলিফার নাম পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন, শায়খ ইব্রাহিম আবুল হাসান আলী হাসিমী হানকারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

কাদ্বিরীয়া সিলাসিলা মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন শায়খ ইব্রাহিম আবুল হাসান আলী হাসিমী হানকারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন গাউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দাদাপীর। ইনশাআল্লাহ! এখন আমরা হযরত শায়খ হানকারী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো। তাওফিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তা’আলা।

শায়খ ইব্রাহিম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ হাসিমী হানকারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত- ৪৪৬ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

ক্বাদিরীয়া তরিকার এই মহাত্মন শায়খুল মাশাইখ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ছিলেন। ইলমে শরীয়তের ওপরও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। তাঁকে 'শাইখুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করেন সমসাময়িক মাশাইখে আজম। তাঁর হাজার হাজার মুরিদান ছিলেন। ইমামুত তরিকত গাউসুল আজম শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ হযরত আবু সাঈদ মুবারক মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহও হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে দীর্ঘ ১৮ বছর কাটিয়েছিলেন। হযরত আবুল হাসান সারা জীবন সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেছেন।

জন্ম

ইরাকের মসুল শহরের নিকটস্থ হানকার নামক একটি গ্রামে ৪০৯ হিজরি সনে হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয়। এসময় ২৫তম আব্বাসী খলিফা ছিলেন ক্বাদির বিল্লাহ। তাঁর খিলাফতকাল ছিলো ৩৮০ থেকে ৪২২ হিজরি পর্যন্ত।

হযরত আবুল হাসান হানকারী রাহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত খলিফা হযরত আবু সাঈদ মুবারক মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ উচ্চ পর্যায়ের আবিদ ছিলেন। তিনি স্বীয় পীরের জীবন ও সাধনা এবং অন্যান্য বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের জীবন ও আখলাক্বের ওপরও তিনি উন্নতমানের গ্রন্থাদি লিখেন। তিনি মুতাজিলা ফিরক্বার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।[৭৪]

বংশ পরিচয় ও নামকরণ

হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহর পূর্বপুরুষ ছিলেন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ায় জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর নসবনামা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা:- হযরত আবুল হাসান হানকারী,

---

[৭৪] মাসালিকুস সালিকীন, পৃ. ৩২৮।

পিতা শায়খ মুহাম্মদ জাফর, পিতা শায়খ ইউসুফ, পিতা শায়খ মুহাম্মদ, পিতা শায়খ শরীফ উমর, পিতা শায়খ শরীফ আবদুল ওয়াহাব, পিতা হযরত আবু সুফিয়ান জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।[৭৫]

হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহর নাম কী ছিলো এ ব্যাপারে বেশ ইখতিলাফ বিদ্যমান। বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁর নাম ‘মুহাম্মদ বিন মাহমুদ’, ‘আলী বিন মাহমুদ’, ‘আলী বিন ইউসুফ’ ও ‘আলী বিন মুহাম্মদ’ লিপিবদ্ধ আছে। তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তাঁর নাম ছিলো ‘আলী বিন মুহাম্মদ’ বলেছেন।[৭৬]

শিক্ষা

লেখক ইবনে খিলক্বান বলেন, হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ শরীয়ত ও তরিকতের ওপর উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেছিলেন। যুগের শীর্ষস্থানীয় উলামা ও মাশাইখে আজমের সুহবত লাভে তিনি ধন্য হন। ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু যেমন ফিকাহ ও হাদিসে তাঁর দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিধি ছিলো অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি হযরত আবু উলা মিসরি রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁর থেকে হাদিসও বর্ণনা করেছেন। শরীয়ত ও তাসাওউফের ওপর তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যুগের উলামা-মাশাইখ তাঁকে ‘শাইখুল ইসলাম’ নামে ভূষিত করেন।[৭৭]

সুলুকের রাস্তায়

সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমানোর পূর্বে শাইখুল ইসলাম হযরত আবুল হাসান হানকারী রাহিমাহুল্লাহ সে যুগের মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সফর করেছেন। এসব সফরে যুগের শ্রেষ্ঠ উলামা-মাশাইখের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। অবশেষে যেদিন তিনি হযরত আবুল ফারাহ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় প্রবেশ করেন, সেদিন থেকে তাঁর সফরের ইতি ঘটে।

হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ সে যুগের শাইখুত তরিকত হযরত শায়খ আবুল ফারাহ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হয়ে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমান। ইলমে ফিকাহ ও হাদীসের ওপর এতো উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি

---

৭৫ ‘তাজকিরা হামিদীয়া’, ‘তাজকিরা কুতবিয়া’ ও ‘আজকারে কলন্দরিয়া’; সূত্র, ‘জিকরে হাসান’, পৃ. ২৬২।

৭৬ জিকরে হাসান।

৭৭ ‘আদ-দারুল মুনযিম’, খ.২, পৃ. ১০৭। সূত্র: মাশাইখে ক্বাদিরীয়া (ইংরেজি অনুবাদ), পৃ ১৮২।

অনুধাবন করেছিলেন যে, হাক্বিক্বাতের জ্ঞান কখনও কিতাব অধ্যয়নে হাসিল হয় না। সুদির্নিষ্ট ও শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে আমলী চেষ্টা-সাধনা ও খাস করে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তি ছাড়া এ জ্ঞানের অধিকারী কেউ হতে পারেন নি। তিনি এটাও বুঝতে পারেন যে, চেষ্টা-সাধনা ও আমল সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়ার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে মুর্শিদে কামিলের সুহবত লাভ। সুতরাং তাঁর যুগের জুনাইদিয়া তরিকার একজন শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত আবুল ফারাহ তারতুসী রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করে সুলুকের রাস্তায় কঠোর সাধনায় নিমজ্জিত হন।

হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহর জীবনীকারগণ লিখেন, তাঁর মুজাহাদা-মুশাহাদা ও উবুদিয়াতের মাত্রা এ পরিমাণ ছিলো যে, দীর্ঘদিন তিনি দিনের বেলা রোজা রেখেছেন ও সারারাত আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে কাটিয়েছেন। কোনো কোনো সময় তিনদিনে একবার খাবার মুখে দিতেন। ইশা ও তাহাজ্জুদের মধ্যস্থ সময়ের ভেতর তিন খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ‘আনওয়ারে সুফিয়্যাহ’ নামক কিতাবে আছে, দৈনিক ১০ খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।[৭৮]

একটি ভবিষ্যদ্বাণী

একদিন হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহকে কেউ প্রশ্ন করলো, “হযরত! আপনি কী শাইখুল ইসলাম?”

তিনি জবাবে বললেন, “আমি দ্বীনের ওপর বৃদ্ধ হয়েছি। আমার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে একটি দল থাকবে, যারা রাজা-বাদশাহদের সম্মুখে উপস্থিত হবে। তাদের মর্যাদা হবে খুব উঁচু। এদের কেউ কেউ খুব ধনী হবে, অন্যরা হবে গরীব।”

হযরতের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তাঁর সাহেবজাদা শায়খ জাহির রাহিমাহুল্লাহ তরিকতের উচ্চতর শায়খ ছিলেন। তিনি হানকারের শায়খ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরতের নাতি শায়খ মূসা রাহিমাহুল্লাহ হানকার ছেড়ে সিতান নামক অঞ্চলে যেয়ে তাসাওউফের খিদমাত করেছেন।

---

[৭৮] ‘মাসালিকুস সালিহীন’, খ. ১, পৃ. ৩২৮; ‘আনওয়ারে সুফিয়্যাহ’, পৃ. ১২১।

শায়খ মূসা রাহিমাহুল্লাহর সাহেবজাদা শায়খ আবু আলী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন খুব সাহসী ব্যক্তি। তিনি সিতান ছেড়ে চলে যান কিচ মাকরান নামক শহরে। সেখানকার মানুষ তাদের স্বৈরাচারী শাসনকর্তার ওপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ছিলো। তারা তাকে শাসকের পদ থেকে সারিয়ে হযরত আবু আলী রাহিহুল্লাহকে সুলতান নির্বাচিত করে। সুলতান আবু আলী রাহিমাহুল্লাহর এক পুত্রের নাম ছিলো রাশীদুদ্দীন। তিনি যখন পরিণত বয়সে পদার্পণ করেন তখন সুলতান তাঁকে রাজ্যের শাসনভার সমজিয়ে দেন। এরপর সুলতান আবু আলী রাহিমাহুল্লাহ বাকি জীবন নির্জনে কাটান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও জিকরুল্লাহর মাঝে।

এসময়ই হযরত সাইয়্যিদ আহমদ তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ কিচ মাকরান শহরে যেয়ে স্বীয় পরিবারবর্গসহ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সুলতান রাশীদুদ্দীনের এক পুত্রসন্তান ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো শাহজাদা বাহাউদ্দীন। হযরত তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহর মেয়ে বিবি হাজ্জ ও শাহজাদা বাহাউদ্দীন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের ঔরশে মোট তিনজন পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এরা হচ্ছেন শাহজাদা জামালুদ্দীন, শাহজাদা জিয়াউদ্দীন ও শাহজাদা হামিদুদ্দীন হাকিম। শেষোক্ত ব্যক্তি তরিকতের শায়খ ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে ‘সুলতানে তারিকীন’ খেতাবে ভূষিত হন।

পরবর্তীতে সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন শাহজাদা বাহাউদ্দীন। পরে তিনি সিংহাসন ছেড়ে দেন তাঁর ভাই শায়খ শাহাবুদ্দিন আবুল বাক্বার নিকট। বাহাউদ্দীনের দুজন পুত্রসন্তানের দেখভালের দায়িত্ব নেন নতুন সুলতান শাহাবুদ্দিন। এ দুজনের নাম ছিলো শায়খ হাকিম ও শায়খ রুকনুদ্দিন হাতিম।

কিছুদিন পর শায়খ বাহাউদ্দীন বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় পুত্রদ্বয় শায়খ জামালুদ্দীন ও শায়খ জিয়াউদ্দীনকে নিয়ে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় যান। হারামাইন শিরীফাইন ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে ইয়ামন সালিহা নামক স্থানে শায়খ বাহাউদ্দীন ইন্তিকাল করেন। পিতার মৃত্যুতে শোকাহত পুত্রদ্বয়ের মন চাইলো না, সে স্থান ছেড়ে জন্মভূতিমে ফিরে আসতে। সুতরাং এ দুজন শায়খের বংশধর ইয়ামন সালিহায় এখনও বিদ্যমান আছেন।

এদিকে সুলতান শাহাবুদ্দিন সিংহাসনের ভার স্বীয় ভাতিজা হামিদুদ্দীনের হাতে ন্যস্ত করেন। কিছুদিন পরই শাহাবুদ্দিন মারা যান।

উক্ত বর্ণনা থেকে হযরত শায়খ আবুল হাসান হানকারী রাহিমাহুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো।[৭৯]

সমকালীন যুগের জগতখ্যাত শাইখবৃন্দ

হযরত আবুল হাসান হানকারী রাহিমাহুল্লাহর যুগ ছিলো শরীয়ত ও তরিকতের স্বর্ণযুগ। এ ইলমী গবেষণার যুগে অনেক ইমাম-উলামা-মাশাইখ জীবিত ছিলেন। তাঁদের জীবনভর জ্ঞানচর্চা, শরীয়ত ও তাসাওউফের ওপর গভীর তথ্যানুসন্ধান ও সাধনার সুফল আজো মুসলিম জনতা এবং অমুসলিম বিশ্বসমাজও উপকৃত হচ্ছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবেন। নিচে সমকালীন যুগের কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত উলামা-মাশাইখের নাম উল্লেখ করছি।

১. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ [৪৫০-৫০৫ হি / ১০৫৮-১১১১ ঈ.]
২. ইমাম হাফিজ দারাকুতনী রাহিমাহুল্লাহ। [৩০৬-৩৮৫ হি. / ৯১৮-৯৯৫ ঈ.]
৩. শাইখুল হানাফিয়া ইমাম কুদুরী রাহিমাহুল্লাহ। [৩৬২-৪২৮ হি. / ৯৭৩-১০৩৭ ঈ.]
৪. দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা রাহিমাহুল্লাহ। [৩৭০-৪২৯ হি. / ৯৮০-১০৩৭ ঈ.]
৫. ইমাম বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ। [৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ঈ.]
৬. হযরত শায়খ আবদুল ক্বাহির জুরযানী রাহিমাহুল্লাহ। [৪০০-৪৭১ হি. / ১০০৯-১০৭৮ ঈ.]
৭. হযরত শায়খ আবুল হাসান খিরক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। [৩৫২-৪২৪ হি. / ৯৬৩-১০৩৩ ঈ.]

[৭৯] 'জিকরে হাসান' দ্রঃ।

খুলাফাবৃন্দ ও বংশধর

হযরতের কজন খলিফা ছিলেন তার কোনো তলিকা পাওয়া যায় নি। তবে দুজন সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখিত আছে। এরা হচ্ছে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত শায়খ জাহির রাহিমাহুল্লাহ এবং হযরত শায়খ আবু সাঈদ মুবারক মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ। হযরতের বংশধর সম্পর্কে ইতোমধ্যে তথ্যাদি তুলে ধরেছি। তাঁর সন্তান হযরত জাহিদ রাহিমাহুল্লাহর বংশধররা পরবর্তীতে পাক-ভারতের বাহারপুর, শিয়ালকোট, লাইলপুর ও লাহুরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এখনও তাদের অনেকে বিভিন্ন গ্রামের মালিক আছেন।[৮০]

হযরতের ইন্তিকাল

ইব্রাহিম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ হাসিমী হানকারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মাহবুবের ডাকে সাড়া দিয়ে ৪৪৬ হিজিরি সনের ১লা মুহাররম পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বাগদাদের নিকটস্থ স্বীয় জন্মস্থান হানকারে সমাহিত আছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা হযরতের মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। তাঁর রুহানী ফায়েজ দ্বারা আমাদেরকে মালামাল করুন।

ক্বাদিরীয়া তরিকা মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত শায়খ আবু সাঈদ মুবারক মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ। ইমামুত তরিক্বত গউসুল আজম শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য খলিফা। হযরত মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় নি। এরপরও পাঠকদের খোরাক যোগাতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাবো। তাঁর সম্পর্কে যেটুকু সম্ভব তথ্যাদি পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

---

[৮০] জিকরে হাসান।

হযরত শায়খ আবু সাঈদ মুবারক মুখাররিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত- ৫১৩ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং সুফি শায়খ। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফিকহের অনুসারী এই যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ছিলেন ক্বাদিরীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর মুর্শিদ ও উস্তাদ।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী[৮১] রাহিমাহুল্লাহ মসুলের নিকটবর্তী হানকার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর পীর সাহেব হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহরও জন্ম হয়। বিভিন্ন কিতাবে হযরত আবু সাঈদের জন্মসন ৪০৩ হিজরি বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

জন্মস্থান হানকার থেকে পরিবারবর্গ বাগদাদের নিকটস্থ আল-মুখাররিম নামক ছোট্ট একটি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে আসেন। সুতরাং হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর জীবনের প্রায় সবটুকু সময়ই এই মুখাররিম শহরে অতিবাহিত হয়। এ কারণেই তিনি মুখাররিমী হিসেবে পরিচিত হন। 'নেকলেসেস অফ জেম' নামক কিতাবে আছে, ইয়াজিদ ইবনে মুখাররিম এর কয়েকজন সন্তান সর্বপ্রথম এখানে বসবাস শুরু করেছিলেন। এ কারণে এটির নামকরণ হয়েছে, আল-মুখাররিম।

প্রাথমিক শিক্ষাশেষে আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার তখনকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল বাগদাদে গিয়ে উচ্চপর্যায়ের লেখাপড়া করেন। হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন উচ্চ মেধাসম্পন্ন হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ।

---

[৮১] কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর নাম 'মাখজূমী' উল্লেখিত হয়েছে। তবে 'Necklaces of Gems' নামক গ্রন্থের লেখক শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া তাদিফী বলেন, তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে মুখাররিমী।

‘বাবুল আযাজ’ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

বাগদাদের ‘বাবুল আযাজ’ নামক স্থানে হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মাদরাসার দায়িত্ব নেন হযরতের প্রধান খলিফা হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ। এখানে বসেই তিনি সুলুকের ওপর উচ্চাঙ্গের বর্ণনা করেছেন।[৮২]

একটি বিশেষ কারামত

হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ ‘ওলি তারাশ’ [ওলি সৃষ্টিকারী] ছিলেন। তিনি যখনই আন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কারো প্রতি তাকাতেন তখনই ঐ ব্যক্তির হৃদয় থেকে গ্বাইরুল্লাহর সকল ভেজাল বের হয়ে যেতো। সৃষ্টি হয়ে যেতো অন্তরে খোদাপ্রেমের অনুরাগ। অনুরূপ তিনি যখন কাউকে জড়িয়ে [মুআনাকা] ধরতেন তখনও ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তিটি ওলিতে পরিণত হয়ে যেতেন।

খলিফার উচ্চ প্রশংসা

আগেই বলেছি, হযরতের প্রধান খলিফা ছিলেন শাইখুত তরিকত হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লা। হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ খলিফা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, “শায়খ আবদুল ক্বাদির [রাহিমাহুল্লাহ] আমার নিকট থেকে খিরক্বা প্রাপ্ত হন। আর আমিও তাঁর নিকট থেকে খিরক্বা লাভ করেছি। আমরা উভয়েই একে অন্য থেকে আধ্যাত্মিক সুফল পেয়েছি।”

সাহেবে কারামত

হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। বিলায়াতের সিলসিলায় তাঁর মর্যাদা উচ্চ পর্যায়ে ছিলো। ইমামুত তরিকত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহকে খিলাফত প্রধানকালীন ঘটনাটি আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ। এতেই হযরতের উচ্চ মাক্বমাতের স্বরূপ পাঠকরা বুঝতে সক্ষম হবেন বলে আমরা মনে করি।

---

[৮২] প্রগুক্ত।

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

হযরতের অনেক খলিফা ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান খলিফা হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ হওয়ায় কেউই অন্যদের নাম লিপিবদ্ধ করেন নি।

ইন্তিকাল

হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ ৫১৩ হিজরি সনে এ মায়াবী পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীর্ঘ হায়াতে তায়্যিবাহ দান করেছিলেন। তিনি ১১০ বছর এ পৃথিবীর বুকে জীবিত ছিলেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের বাবুল আযাজ মাদরাসা সংলগ্ন স্থানে হযরতের সমাধি অবস্থিত।

ক্বাদিরীয়া তরিকার পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন, ইমামুত তরিকত হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন বিখ্যাত এই ওলিআল্লাহর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। আমরা আল্লাহর পবিত্র দরবারে প্রার্থনা করি, হে মহান কুদ্দুস জিন্দা খোদা! আপনার এ মহান ওলির জীবনালোচনার নিয়ত করছি আপনার পবিত্র নাম স্মরণ করে। আমরা আবদার জানাই আপনার নিকট, সঠিক তথ্যনির্ভর এবং হৃদয়োন্মচনী একটি লেখা যাতে পাঠকদের উপহার দিতে পারি, আমাদেরকে সে তাওফিক দান করুন। আপনার ইচ্ছা ছাড়া কারোর ক্ষমতা নেই ভালো কিছু করার।

ইমামুত তরিকত হযরত সাইয়্যিদ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[৮৩]
(মৃত- ৫৬১ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

তিনি ছিলেন বিখ্যাত ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা, স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ হযরত শায়খ সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

বংশ পরিচয়

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর পিতা এবং মাতা উভয় দিক থেকে সাইয়্যিদ তথা হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর ছিলেন। পিতার দিক থেকে তাঁর নসবনামা হচ্ছে: মুহিউদ্দীন আবু আবদুল ক্বাদির, পিতা- আবু সালেহ জঙ্গি দোস্ত মূসা, পিতা- আবু আবদুল্লাহ, পিতা- ইয়াহইয়া জাহিদ, পিতা- মুহাম্মদ, পিতা- দাউদ, পিতা- মূসা, পিতা- আবদুল্লাহ, পিতা- মূসা জাওন, পিতা- আবদুল্লাহ মাহদি [মুজাল], পিতা- হাসানুল মুছান্না, পিতা- আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু মুহাম্মদ হাসান [রা.], পিতা- আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব [রা.]। সুতরাং তিনি হুসাইনী সাইয়্যিদ ছিলেন।

মাতার দিক থেকেও তিনি সাইয়্যিদ ছিলেন। তাঁর মাতার নাম সাইয়্যিদা বিবি উম্মুল খাইর ফাতিমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদুরে দুলালী হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার বংশধর। হযরত

---

[৮৩] হযরত গউসুল আজম জিলানী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও সাধনার ওপর অনেক গ্রন্থ রাচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনালোচায় আমরা যেসব গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কটি হলো: ১. "নাজমুয জাহিরা" - ইবনে তুযজি হারভি (রাহ.); ২. "মুনতাজাম" - ইবনে জাওযী (রাহ.); ৩. "তারিখে কাবির" - হাফিজ জাহাবী (রাহ.); ৪. "তাবাক্বাত" - ইবনে রজব হাম্বলী (রাহ.); ৫. "কিতাবুত তারিখ [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]" - ইবনে কাছির (রাহ.); ৬. "তারিখে বাগদাদ" - ইবনে নাজ্জার (রাহ.); ৭. "তাবাক্বাতুল কুবরা" - আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহ.); ৮. "ক্বাওয়াইদুল জাওয়াহির" - মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া তাদিফী (রাহ.); ৯. "বাহজাতুল আসরার"- আবুল হাসান আলী শাতুনুফী (রাহ.); ১০. "গাউছুল আযম" - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.); ১১. "নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী মানাক্বিবে শায়খ আবদিল ক্বাদির" - মুল্লা আলী ক্বারী (রাহ.); ১২. "তাফরীহুল খাতির ফী মানাক্বিবে শাইখ সৈয়্যদুনা আবদুল ক্বাদির" - সৈয়দ আবদুল ক্বাদির আরবেলী (রাহ.)।

হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর উর্ধতন পূর্বপুরুষ। সুতরাং হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ হাসানী সাইয়্যিদও ছিলেন।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর জন্মের পূর্ব থেকেই তাঁর আগমনের বেশ কিছু ইশারা-ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়েছিল। সমসাময়িক ও পূর্ব যুগের একাধিক তরিকতের শাইখুল মাশাইখ হযরতের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। নিচে এ সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি।[৮৪]

১. শাইখুল মাশাইখ আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর যুগের প্রায় দুশ বছর পূর্বে তিনি জিবীত ছিলেন। বাগদাদের বিখ্যাত এই ওলিআল্লাহ একদা উচ্চ পর্যায়ের হালের অবস্থায় বলেন: "আমাকে জানানো হলো যে, হিজরি ৫ম শতকের শেষের দিকে একজন ওলির জন্ম হবে। তাঁর নাম হবে আবদুল ক্বাদির এবং উপাধি হবে মুহিউদ্দীন। তিনি জিলান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। তবে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন।"

২. ইমাম হাসান আসকারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: শায়খ আবু মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইন্তিকালের পূর্বে শায়খ আসকারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জুব্বা হযরত শায়খ মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এটি শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানীকে দেবেন।' হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ এ জুব্বাটি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি হস্তান্তর করেন হযরত শায়খ দানূরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট। এরপর অন্যান্য শায়খের হাত হয়ে এটি শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আসে ৪৯৭ হিজরি সনে।[৮৫]

৩. শায়খ আবু বকর বিন হাও'আর রাহিমাহুল্লাহ: তিনি গউসুল আজম শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর পূর্বের যুগে জীবিত ছিলেন। বাগদাদের একজন বিশিষ্ট ওলিআল্লাহ হিসেবে পরিচিতি এই শায়খ একদিন এক মজলিসে উপস্থিত থাকাকালে বলেন: "ইরাক্বে ৭ জন আক্বতাব [উচ্চপদস্থ ওলি] আছেন। তাঁরা হচ্ছেন:
১. শায়খ মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ।

---

[৮৪] এ বর্ণনাগুলোর সূত্র হচ্ছে এই ইন্টারনেট সাইট: sufiwiki.com/Abdul_Qadir_Jilani
[৮৫] 'মাখযানুল ক্বাদিরীয়া', সূত্র: sufiwiki.com

২. শায়খ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ।
৩. শায়খ বিশরে হাফী রাহিমাহুল্লাহ।
৪. শায়খ মানসুর বিন আম'আর রাহিমাহুল্লাহ।
৫. শায়খ আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ।
৬. শায়খ সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতারী রাহিমাহুল্লাহ।
৭. শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ।"

শায়খ আবু বকর রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ সাইয়্যিদ আবু মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ এ তালিকাভুক্ত শায়খদের কথা শুনে স্বীয় মুর্শিদকে প্রশ্ন করলেন: "ইয়া শাইখী! আমরা এ তালিকার ৬ জন ওলির নাম শুনেছি ও তাঁদেরকে জানি। কিন্তু সপ্তম ব্যক্তির নাম শুনি নি- কে এই আবদুল ক্বাদির জিলানী?" শায়খ আবু বকর রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ একজন অনারব এবং উচ্চ পর্যায়ের ওলি। তিনি ৫ম হিজরি শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করবেন।"[৮৬]

৪. ইমাম মুহাম্মদ বিন সাঈদ ঝানজানী রাহিমাহুল্লাহ: তাঁর স্বরচিত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে তিনি বলেন, "হযরত শায়খ আবি আলী হাসান ইয়াসারাজুঈ রাহিমাহুল্লাহর যুগ থেকে হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর যুগ পর্যন্ত যতো ওলির জন্ম হয়েছে, সবাই হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।"

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম তরিখ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা বিদ্যমান। প্রথমটি হলো ১ম রমজান ৪৭০ হিজরি। দ্বিতীয়টি হলো তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২য় রমজান ৪৭০ হিজরি। অধিকাংশ জীবনীকার দ্বিতীয় তারিখটিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি পারস্যের জিলান অঞ্চলের নাইফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

---

[৮৬] 'বাহজাতুল আসরার', সূত্র প্রাগুক্ত।

জন্মকালীন ঘটনা

১. তাঁর জন্মের সময় মাতা ফাতিমার বয়স ছিলো প্রায় ৬০ বছর। সাধারণত এতো বেশি বয়সে মহিলারা গর্ভবতী হাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

২. তাঁর জন্মের আগের দিন জিলান অঞ্চলে প্রায় এগারো শত সন্তানের জন্ম হয়। এদের সবাই আল্লাহর খাস বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

৩. হযরত আবু সাঈদ মূসা রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: "শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর পিতা স্বপ্নে দেখলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "হে আমার পুত্র আবু সালেহ! আল্লাহ তোমাকে একটি পুত্রসন্তান দান করেছেন, যে আমার আপনজন এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ। তাঁর বেলায়েতের স্তর খুব উপরে।"[৮৭]

প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা

শিশুকাল থেকেই শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ অন্যান্য সমবয়সীদের তুলনায় ভিন্ন ছিলেন। তাঁর মধ্যে গাম্ভীর্য ও অন্যমনস্কতা বিরাজ করতো। তিনি আল্লাহর জিকিরও করতেন। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর দাদা আবদুল্লাহ সামাঈ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। তাঁর এ ওলিআল্লাহ দাদার নিকট থেকে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন। প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা দাদার হাতেই সম্পাদিত হয়।

যখন তাঁর বয়স ৪ কিংবা ৫ বছর, তখন মাতা ফাতিমা তাঁকে জিলানের স্থানীয় একটি মাদরাসায় পাঠান। তিনি ১০ বছর বয়স পর্যন্ত এ মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। এ সময়কার একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ঘটনাটিকে পূর্ণাঙ্গ সত্যায়িত করার কোনো উপায় নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। নিচে এটি বর্ণিত হলো।

ফিরিশতাদের দ্বারা স্বাগত: শিশু হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ যখনই মাদরাসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন, তখনই তাঁর চোখে পড়তো উজ্জ্বল নূরারী চেহারাসম্পন্ন কিছু লোক তাঁর সম্মুখে হাঁটছেন। তিনি এদের কাউকে চিনতেন না। এ ব্যাপারটি তাঁর পুত্র সাইয়্যিদ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "একদিন কেউ একজন হযরতকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কখন জানলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ওলায়াতের মাক্বামে উন্নীত করেছেন?

---

[৮৭] প্রাগুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ওলায়াতের মাক্বামে উন্নীত করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'আমি যখন ১০ বছরের বালক, তখন দেখতাম ফিরিশতারা আমার সাথে হাঁটতেন। মাদরাসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর এরা বলতেন, 'আল্লাহর বন্ধুকে অগ্রসর হতে দাও! আল্লাহর বন্ধুকে অগ্রসর হতে দাও!' আমি তখনই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনুগ্রহ করে তাঁর ওলায়েত দান করেছেন।'"[৮৮]

দাদার ইন্তিকাল

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর দাদা হযরত আবদুল্লাহ সামাঈ রাহিমাহুল্লাহ উক্ত মাদরাসায় হযরতের পড়াশোনার সময়ই ইন্তিকাল করেন। ফলে তাঁর লেখাপড়ার দায়িত্ব পড়ে স্বীয় মহিয়সী মাতা ফাতিমার ওপর। তিনি এ দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করেন। হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর বয়স যখন ১৮ বছর তখন নিম্নোক্ত অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

ষাঁড়ের জবানে কথা শ্রবণ

একদিন হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ জিলানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছুয়ে তিনি একটি রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন। দেখতে পেলেন, সামনেই একটি ষাঁড়, ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তিনি এটির পেছনে পেছনে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। হঠাৎ ষাঁড়টি ঘুরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিল! বললো, "ওহে! তোমাকে এসব কাজের জন্য বানানো হয় নি, কিংবা এগুলো করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি!" এরপর ষাঁড়টি দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলো। হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। মাতার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তাঁকে আবদার জানালেন, "মা, আমি উচ্চতর লেখাপড়া ও আধ্যাত্মিক ইলম অর্জনের লক্ষ্যে বাগদাদে যেতে চাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।" তখন ৭৭ বছয় বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা আন্তরিকভাবে এ আবদার গ্রহণ করে নিলেন। হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহকে বাগদাদে প্রেরণের সকল আয়োজন করলেন।

---

[৮৮] বাহজাতুল আসরার - আবুল হাসান আলী শাতুনুফী (রাহ.)।

বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে মায়ের উপদেশ

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত মা-বাবা নিজের সন্তানাদির খিদমতের মুখাপেক্ষী থাকেন। জীবন সায়াহ্নে সন্তানাদির দায়িত্ব হয় মা-বাবাকে দেখভাল করা। ঠিক যেমনটি মা-বাবা ছোটকালে তাদেরকে লালন-পালন করেছিলেন। হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর বয়স যখন ১৮ বছর তখন তাঁর মন উচ্চশিক্ষা অর্জনে আকুল হয়ে ওঠে। মাতা ফাতিমা জানতেন তাঁর এ সন্তান সাধারণ নয়। তিনি যে একদিন ওলিকূল শিরোমণির মর্যাদায় ভূষিত হবেন সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বাগদাদে যেতে তাঁকে অনুমতি দিলেন ও ভ্রমণের সকল আয়োজন শেষ করলেন।

আগেকার যুগে দীর্ঘ ভ্রমণে কেউই একা যেতো না। বড় বড় দল বা কাফেলা এক সঙ্গে ভ্রমণ করতেন। সাথে থাকতো সফরের রসদপত্র, মালামাল, খাবার-পানীয় ও বাহন হিসেবে উট, ঘোড়া ও খচ্চর। আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলতো কাফেলা। পাড়ি দিতে হতো ছোট-বড় জঙ্গল ও জনশূন্য মরুভূমি। সুতরাং ভ্রমণকালে কাফেলা কখনো নিরাপদ ছিলো না। বনদস্যুরা আক্রমণ করে লুটিয়ে নিতো কাফেলার সর্বস্ব। এমনকি অনেককে নির্মমভাবে হত্যাও করতো।

বিদায়ক্ষণে সায়্যিদা উম্মুল খাইর ফাতিমা পুত্র আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর জন্য খাস দিলে দু'আ করলেন। এরপর বললেন, "বাবা আবদুল ক্বাদির! আমি খুব বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করেছি। মনে হয়, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তোমার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকবো। মহাবিশ্বের পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সফল করুন। দান করুণ উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞান।" ফাতিমার চোখ বেয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ মাকে জড়িয়ে ধরলেন। ফাতিমা আবার বললেন, "তোমার মরহুম পিতা আমার নিকট ৮০ দিনার রেখে গেছেন। এ থেকে ৪০ দিনার তোমাকে দিচ্ছি। বাকি ৪০ দিনার তোমার ভাই সাইয়্যিদ আবু আহমদ আবদুল্লাহর জন্য আমার নিকট রেখে দিলাম"। এরপর তিনি ৪০ দিনার আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহর জামার হাতার ভেতর সেলাই করে লুকিয়ে রাখলেন। আবার দু'আ করে ফাতিমা বললেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমাকে আমি ভ্রমণে যাত্রার প্রাক্কালে একটি উপদেশ দিচ্ছি। কখনও মিথ্যা বলবে না। সর্বদা সত্য কথা বলবে। মিথ্যা বলার ধারণাও মনের ভেতর স্থান দেবে না।"

যুবক হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "মাগো আমার! আমি আমার হৃদয় থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি সর্বদা তোমার এ উপদেশকে মান্য করে চলবো।" এরপর সাইয়্যিদা ফাতিমা পুত্রকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। মায়ের মায়া-মুহাব্বতের চোখে প্রিয় পুত্রের চেহারা পানে শেষ বারের মতো গভীর দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, "যাও বাবা আবদুল ক্বাদির! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো। তিনি তোমার সাথে আছেন। তিনিই তো তোমার সাহায্যকারী ও অভিভাবক।" মা ও পুত্রের চোখ দুটো বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। শুরু হলো আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ পানে দীর্ঘ ভ্রমণ।

ভ্রমণকালীন সেই বিখ্যাত ঘটনা

প্রিয় মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাফেলার সঙ্গে হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ চলতে থাকেন। কয়েকবার বৃদ্ধ মায়ের দিকে ফিরে ফিরে তাকান। তিনি জানতেন হয়তো, হয়তো মা-জননীর চেহারা তিনি আর কোনোদিন দেখবেন না। এরপর কয়েকদিনের পথ পাড়ি দিয়ে কাফেলা হামাদান শহরে নিরাপদে পৌঁছুলো। এখানে যাত্রাবিরতি শেষে কাফেলা পুনরায় ভ্রমণ শুরু করে।

পথিমধ্যে কাফেলা একটি গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন ৬০ জনের একটি বড়ো দস্যু দল উন্মুক্ত তরবারি হাতে কাফেলার ওপর হামলা চালায়। এ ডাকাত দলের নেতার নাম ছিলো আহমদ বাদাওয়ী। খুব দুর্দান্ত ও নির্মম অত্যাচারী এ ডাকাতের কথা শুনলেই মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকতো। কাফেলার ক্ষমতা ছিলো না বাদাওয়ীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। সবাই আত্মসমর্পণ করলো ও মূল্যবান মালামাল ডাকাত সর্দারের হাতে তুলে দিল। বাদাওয়ী সব মালামাল একত্রিত করে সকল দস্যুদের মধ্যে বণ্টন করা শুরু করলো। কাফেলার সদস্যরা বন্দী অবস্থায় অদূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলো। হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহও নিরবে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলেন। ডাকাতদের কয়েকজন অস্ত্র হাতে বন্দীদের দেহে পুনরায় তল্লাশি শুরু করে। তারা দেখছিলো কারোর নিকট আরো কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র লুকানো আছে কী না। তবে বালক আবদুল কাদির রাহিমাহুল্লাহর দেহ কেউই তালাশ করলো না। সবাই ভাবলো, এ বালকের নিকট আর কী-ই বা থাকতে পারে। তবে একজন ডাকাত হঠাৎ তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। কড়া গলায় প্রশ্ন করলো,

"হে বালক! তোমার নিকট কোনো মূল্যবান জিনিস আছে কী?"

তিনি জবাব দিলেন, “আছে! আমার নিকট ৪০ দিনার আছে।”
ডাকাত একথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। সে যুবক আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে সরে গেলো। ভাবলো, এ যুবক মশকরা করছে!

আরো কিছুক্ষণ পর, আরেক ডাকাত এসে যুবক আবদুল কাদিরকে একই প্রশ্ন করলো। তিনি এবারও একই উত্তর দিলেন, “আমার নিকট ৪০ দিনার আছে।” এ ডাকাতও ভাবলো, বালকটি মশকরা করছে।

এরপর সকল ডাকাত একত্রিত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে বালক আবদুল কাদির রাহিমাহুল্লাহর ‘মশকরা’ নিয়ে হাসাহাসি শুরু করলো, “তার নিকট ৪০ দিনার আছে! হা! হা! হা!”[৮৯]

ডাকাতদের হাসি-তামাশা সর্দার আহমদ বাদাওয়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে একজনকে নির্দেশ দিলো, “যাও! ঐ বালককে আমার নিকট নিয়ে এসো।”

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ সামনে আসার পর সর্দার প্রশ্ন করলো, “কী হে বালক? তোমার নিকট ৪০ দিরহাম আছে শুনলাম। কথাটি কী সত্যি?”
তিনি আগের মতোই জবাব দিলেন, “জী হাঁ! আমার কাছে ৪০ দিনার আছে।”
বাদাওয়ী বললো, “দেখি কোথায় আছে! বের করো।”

হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ জামার হাতা দেখিয়ে বললেন, “এখানেই আছে। আমার মাতা দিনারগুলো সেলাই করে লুকিয়ে রেখেছেন!” ডাকাত উঠে এসে জামার হাতা ছিড়ে ফেললো। এ্যা! সত্যিই তো? ৪০টি দিনার বেরিয়ে আসলো। আহমদ বাদাওয়ী ও তার ডাকাতদল অবাক হয়ে গেলো। সর্দার জিজ্ঞেস করলো, “হে যুবক! আমরা তো কেউই জানতাম না- বা বিশ্বাস করি নি, তোমার নিকট এতো বেশি দিনার লুকানো আছে। তাহলে কেনো তুমি আমাদেরকে বলে দিলে?”

---

[৮৯] জানা থাকা দরকার যে, সে যুগে ৪০ দিনার বিরাট অঙ্কের টাকা ছিলো। এতো টাকা একজন বালকের নিকট থাকবে তা বিশ্বাসযোগ্য না থাকায়, ডাকাতরা ভেবেছিলো তিনি মশকরা করছেন। তাছাড়া টাকা থাকলেও তো ডাকাতদেরকে বলে দেওয়ার কথা ছিলো না।

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "এ সফর শুরুর সময় আমার বৃদ্ধা আম্মাজানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, জীবনে কখনও মিথ্যা বলবো না। তাহলে বলুন, হে সর্দার! আমি কীভাবে মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ষাটজন মাত্র ডাকাতের ভয়ে ভঙ্গ করি?"

একথা শুনে আহমদ বাদাওয়ীর চোখ দুটো অশ্রুতে ভিজে গেলো। নিজেকে বড়ো ছোট মনে হলো। কাঁদুনে সুরে মন্তব্য করলো, "হে মহান যুবক! তোমার মায়ের নিকট দেওয়া ওয়াদা রক্ষার্থে, আজকে যে আনুগত্যের নিদর্শন দেখালে- তাতে সত্যিই নিজেকে অতি ছোট্ট বলে মনে হচ্ছে। লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে গেছে। আমি তো দীর্ঘদিন যাবৎ আমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নির্দেশ ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে আছি! আমার কী উপায় হবে?"

ডাকাত সর্দার আহমদ বাদাওয়ী কাঁদতে কাঁদতে বেঁহুশ হয়ে গেলেন। ছুটে এসে হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানীর পায়ে পড়লেন। যুবক আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে কাঁধে ধরে উঠালেন। আহমদ বাদাওয়ী ভীষণ লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে লাগলেন। ডাকাতদলের সবাই এ দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। নিজেদের গোনাহের জন্য লজ্জিত হলো। সকলে একসাথে যুবক আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাওবা করলো। প্রতিজ্ঞা করলো, আর কোনোদিন তারা ডাকাতি করবে না। দস্যুবৃত্তি চিরতরে ছেড়ে দেবে। এরপর তারা কাফেলার সদস্যদের নিকট লুণ্ঠিত সব মালামাল ফেরৎ দিলো।

পরবর্তীতে গাউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এ ঘটনার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, "এ ৬০ জন ডাকাতই সর্বপ্রথম আমার হাতে তাওবা করেছিলো।"

বাগদাদে অবস্থানের প্রাথমিক দিনগুলো

হিজরি ৪৮৮ সন [১০৯৫ ঈসায়ী]। বাগদাদের মসনদে অধিষ্ঠিত আছেন খলিফা মুনতাসির বিল্লাহ। এ বছরই যুগের গউস হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদে আগমন করেন। আব্বাসী খেলাফতের মধ্যে দুর্বলতা হেতু সমগ্র মুসলিম জনপদে তখন শুরু হয়েছে অরাজকতা। খলিফাগণ দুনিয়াবী

বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহের মধ্যে ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুন ও মূল্যবোধ সর্বনিম্নে পৌঁছুয়েছে।

বাগদাদে আসার দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর নিকট মায়ের দেওয়া সেই ৪০ দিনার প্রায় শেষ হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শূন্যহস্ত হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে উপোস থাকতে হয় দিনের পর দিন। জীবনরক্ষার্থে তিনি ছুটে গেলেন বাগদাদের অদূরে খসরুজ নামক বাজারে। তিনি অনুসন্ধান করেন হালাল খাদ্যের। কিন্তু দেখতে পেলেন, সেখানে অনেক নিঃস্ব দরবেশ একই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরাও হন্যে হয়ে হালাল খাদ্যের সন্ধানে লিপ্ত। এখানে হালাল খাদ্য পাওয়া যাবে না। ফের যাত্রা করলেন বাগদাদের দিকে। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলো জিলান থেকে আগত এক মুসাফিরের সাথে।

মুসাফির জিজ্ঞেস করলেন, "হে যুবক! জিলান থেকে আসা যুবক আবদুল ক্বাদির কোথায় আছেন বলতে পারবেন?"
শায়খ জবাব দিলেন, "আমিই আবদুল ক্বাদির।"
মুসাফির হযরতের হাতে এক টুকরো স্বর্ণখণ্ড তুলে দিয়ে বললেন, "আপনার আম্মাজান এটি আপনাকে দিয়েছেন।"

হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। প্রিয় মা-জননীর খবরা-খবর জানলেন। এরপর তিনি পুনরায় ঐ খসরুজ বাজারের দিকে পা বাড়ালেন।

সেখানে পৌঁছুয়ে দরবেশদের মধ্যে স্বর্ণখণ্ড ভাগ করে বণ্টন করলেন। নিজের জন্য সামান্য অংশ রাখলেন। এরপর বাগদাদে ফিরে আসলেন।

তিনি বেশ কিছু খাবার প্রস্তুত করলেন। গরীবদের দাওয়াত করে নিয়ে আসলেন এবং তাদের সঙ্গে বসে খাবার খেলেন। এভাবেই বাগদাদের প্রাথমিক দিনগুলো অতিহাবিত হয় হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির।

শরীয়তের উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন

তখন বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো পৃথিবীবিখ্যাত বিদ্যাপীঠ। এখানে ইসলামী বিষয়বস্তু ছাড়াও বিজ্ঞান এবং দর্শনের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন হতো। হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বেশ কজন বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এসব বিষয়ের মধ্যে ছিলো:

১. ফিকাহ্ [চার মাজহবের মাসআলা-মাসাঈল]।
২. তাফসিরুল কুরআন।
৩. সুন্নাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৪. হাদিস শরীফ।
৬. আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ।

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি হাম্বলী ফিকাহ অধ্যয়ন করেন হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহর নিকট। তাঁর তাফসির, সুন্নাহ ও হাদিস শাস্ত্রের উস্তাদ ছিলেন হযরত আবু গালিব আহমদ ও হযরত আবু ক্বাসিম আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। তিনি নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক হযরত আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া তাবরিজী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন।[৯০]

মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ

হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর ফিকাহ শাস্ত্রের উস্তাদ হযরত শায়খ আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ জুনাইদিয়া তরিকার একজন যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ছিলেন। বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালে এই উস্তাদের নিকট হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর মুর্শিদের নির্দেশে নিয়মিত জিকির-আজকার ও মুরাক্বাবা-সাধনায় নিমগ্ন হন।

অধ্যয়নকালীন কঠিন দিনগুলো

অধ্যয়নকালে বাগদাদের জীবন খুব কঠিন ছিলো হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর জন্য। তিনি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হন। হযরত নিজেই বলেছেন, “বাগদাদে পড়াশুনাকালীন সময় আমার ওপর এতোই কঠিন ও নিষ্ঠুর কষ্ট-

---

[৯০] শায়খ মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া তাফিদী রাহি, প্রণীত ‘ক্বাওয়াইদুল জাওয়াহির’ দ্র:।

কাঠিন্যতা পতিত হয় যে, এগুলো যদি কোনো পাহাড়ে রাখা হতো, তাহলে তা দিখণ্ডিত হয়ে যেতো!"

তিনি আরো বলেছেন, "যখনই দুঃখ-কষ্টের মাত্রা বেড়ে আমার জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠতো তখন আমি রাস্তার উপর শুয়ে গড়াগড়ি করতে করতে আল-কুরআনের এই পবিত্র আয়াত দুটি পাঠ করতাম:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

-"নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অবশ্যই, কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।" [সূরা ইনশিরাহ : ৫-৬]
উক্ত আয়াতদ্বয় তাকরার করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম।"

দারস শেষে তিনি বাগদাদের নিকটস্থ জঙ্গলে চলে যেতেন। সময় সময় জঙ্গলে বসে সারারাত আল্লাহর জিকির করে কাটিয়ে দিতেন। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, গরম যাই হতো তিনি তার পরোয়া করতেন না। ক্লান্তিবোধ করলে পাথরের ওপর মাথা রেখে মাটিতে পড়ে বিশ্রাম নিতেন। এসব জিকিরের সময় তাঁর মাথায় থাকতো পাগড়ি ও পরনে পাতলা জুব্বা। ক্ষিদে পেলে চলে যেতেন নিকটস্থ দজলা নদীর তীরে। যাকিছু খাবারযোগ্য লতাপাতা ও শাক-সবজি পেতেন তা-ই ভক্ষণ করতেন। তিনি বলতেন, "এরূপ জীবন-যাপনে আমি বেশ আনন্দবোধ করতাম আত্মিকভাবে। সময় সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হতাম।"

বাগদাদে দুর্ভিক্ষের সময়ে চরম ধৈর্যধারণ

একদা বাগদাদে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষ এতোই ক্ষুদার্ত ছিলো যে, যে যেখানে একদুটো দানা পেয়েছে সেগুলো ভক্ষণ করে জীবনরক্ষা করতে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য সবাই হিমশিম খাচ্ছিলো। এরপর একটি দানাও আর কোথায় অবশিষ্ট থাকলো না। মানুষ বৃক্ষরাজির পাতা, ফুল, মূল ও কাণ্ড খেতে লাগলো বাঁচার তাগিদে। এসময় হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহও সবার মতো খাদ্যের সন্ধানে শহরের বাইরে এখানে সেখানে যেতেন। কিন্তু অসংখ্য মানুষের শূন্য হাত দেখে তিনি ফিরে আসতেন শহরে। তিনি দেখলেন, অন্যান্য ক্ষুদার্তরা তাঁর থেকেও বেশি জরাজীর্ণ। সুতরাং তারা যাতে কিছু খাবার পায় সে জন্য নিজে কিছু না খেয়েও থাকা উত্তম হবে। ফলে কোনো কোনো সময় বেশ কয়েকদিন যাবৎ তিনি উপোশ থাকতেন।

কিন্তু না খেয়ে আর কদিন কাটানো সম্ভব? হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ অসহ্য ক্ষুদার জ্বালায় খাদ্যের সন্ধানে একদিন চলে গেলেন 'সূকুর রাইহান' নামক বাগদাদের একটি বাজারে। বাজার প্রাঙ্গণে প্রবেশকালে ভীষণ ক্ষুদা হেতু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। মাটিতে পড়ে গেলেন। অদূরেই একটি মসজিদ তাঁর নজরে পড়লো। তিনি কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে ঐ মসজিদের ভেতর প্রবেশ করলেন। হেলান দেওয়া সঠিক নয় জেনেও তিনি একটি দেওয়ালে শক্তিহীন দেহকে ঠেকে রাখলেন। অনেকক্ষণ এভাবে বসে কাটালেন। এরপর দেখলেন, একব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করছেন।

আগন্তুক মসজিদের একটি কোণের নিকট বসে পাত্র থেকে কিছু খাবার বের করে থালায় রাখলেন। এতে ছিলো ভুনা মাংস ও রুটি। শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী নিজেই বলেন, "এরপর তিনি খাওয়া শুরু করলেন। আমার ক্ষুদার জ্বালা এতোই বেশি ছিলো যে, তিনি যখনই রুটি ও মাংসের লুকমা মুখে দিচ্ছিলেন, তখনই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার মুখ খুলে যাচ্ছিলো- মনে হচ্ছিলো আমার মুখেও কিছু খাবার ঢুকছে!" এ অবস্থা যখন বিরাজ করছিলো, তিনি নিজের নফসের দিকে খিয়াল করে বললেন, "হে আমার নফস! তুমি ধৈর্যহারা হয়ো না। মহামহিম আল্লাহর ওপর ভরসা করো। তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার কথা স্মরণ করো।" এ কথাগুলো উচ্চারণ করার পর তিনি কিছুটা স্বস্থি বোধ করলেন। তাঁর মুখ আর এমনিতেই খুলে গেলো না।

কিছুক্ষণ চলে যাওয়ার পর ঐ কোণে বসা ব্যক্তি হযরতের নিকট আসলেন। তিনি তাঁকে কিছু খাবার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "মাফ করবেন হযরত! আমার খাদ্যের প্রয়োজন নেই।" কিন্তু নিমন্ত্রণকারী বললেন, "আমি আপনাকে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি, একটুও না হয় খেয়ে নিন।" একথা শুনে অবশেষে তিনি কিছুটা খাবার মুখে দিতে লাগলেন। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, "হযরত! আপনি কোত্থেকে এসেছেন? এই বাগাদাদেই কী বসবাস করছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার বাড়ি পারস্যের জিলানে। বাগদাদে এসেছি উচ্চতর ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে।" আগন্তুক এবার বললেন, "আমিও জিলান থেকে এসেছি। জিলানের হযরত আবদুল ক্বাদিরও এখানে এসেছেন। তিনি কোথায় আছেন জানেন?" এবার শায়খ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "জিলানের আবদুল ক্বাদির আপনারই সামনে বসে আছে!"

একথা শুনে লোকটির চোখদুটো অশ্রুতে ভিজে গেলো। বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "ইয়া শায়খ! অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে যাকিছু আমানত হিসেবে দেওয়া হয়েছিল আমি তার খিয়ানত করে ফেলেছি!" শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কী, একটু খুলে বলুন।"

আগন্তুক বললেন, "আমি যখন জিলান থেকে যাত্রা করি তখন এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমাকে ৮ দিরহাম দিয়ে বললেন, 'এগুলো আমার প্রিয় পুত্র আবদুল ক্বাদিরকে দেবেন। সে বাগদাদে গেছে লেখাপড়া করতে।' ইয়া শায়খ! আমি এইমাত্র যে খাবার খেয়েছি, তা ছিলো ঐ ৮ দিনারের কিছু অংশের বিনিময়ে ক্রয়করা। আমি আপনাকে বেশ কয়েকদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। না পেয়ে বাগদাদে অতিরিক্ত কয়েকদিন থাকতে হয়েছে। নিজের নিকট যা দিনার ছিলো তা শেষ হয়ে যায়। আমি অত্যন্ত ক্ষুদার্ত হয়ে পড়ি। শেষ পর্যন্ত আপনার ৮টি দিনার থেকে কিছু খরচ করতে বাধ্য হই। জনাব, আমি আপনাকে খাবার দেই নি, বরং আপনিই আমাকে খাবার প্রদান করেছেন। দয়াকরে আমাকে ক্ষমা করুন।" তিনি ৮ দিনার থেকে যাকিছু বাকি ছিলো তা হযরতের হাতে তুলে দিলেন।

শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আগন্তুককে জড়িয়ে ধরলেন। তার সততা ও আন্তরিকতার জন্য প্রশংসা করলেন। মায়ের দেওয়া দিনারগুলোর যেটুকু বাকি ছিলো তা-ও তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "বাগদাদে চরম দুর্ভিক্ষ চলছে। আপনি এই দিনারগুলো দ্বারা রাস্তার খাবার ক্রয় করতে পারবেন। যান, জিলানে ফিরে যান। আমার প্রিয় আম্মার নিকট আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন। বলবেন, তোমার আদুরে সন্তান ভালো আছে।"

আল্লাহর সিংহ

শায়খ আবদুল্লাহ সালমি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমি হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহকে তাঁর নিজের ভাষায় বলতে শুনেছি, "বাগদাদে যখন আমি অধ্যয়নরত ছিলাম তখন একদা বেশ কয়েকদিন চলে যায়, অভাব হেতু আমি কিছুই ভক্ষণ করতে পারি নি। এ অবস্থায় একদিন আমি বাগদাদের 'ক্বাতিয়া শাফিয়্যা' নামক একটি রাস্তার ওপর দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম। সেখানে একটি মসজিদ ছিলো। সাধারণত নামাযের সময় ছাড়া মসজিদের ভেতর কেউ থাকতো না। আমি

মসজিদের ভেতরে যেয়ে নিরবে বসে লেখাপড়া করতাম। যাওয়ার পথে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমার হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে দিলেন। বললেন, 'এটা ঐ দোকানে নিয়ে যাও।' আমি বুঝতে পারি নি, বিষয়টা কী? তবুও তার কথা রক্ষা করে ঐ দোকানে যেয়ে মালিকের হাতে কাগজটি তুলে দিলাম। তিনি এটি রেখে দিয়ে, আমাকে হালুয়া ও রুটি দিলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ঐ লোকটি গায়েব হয়ে গেছেন। আমি হালুয়া-রুটি নিয়ে মসজিদে ঢুকলাম।

কিছুক্ষণ পর সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু হালওয়া ও রুটি খাবো। লক্ষ করলাম দেওয়ালের নিকট এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। আমি এটি হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম এতে লিখা আছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা অতীতের একটি আসমানী কিতাবে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সিংহদের এ দুনিয়ার লোভ-লালসার প্রতি একটুকুও আকর্ষণ নেই। আকাঙ্ক্ষা ও [খাবারের] আনন্দ শুধুমাত্র বুড়া মানুষের জন্য, যাদের শারীরিক শক্তির প্রয়োজন ইবাদত করতে।' এ কথাগুলো পাঠ করার পর আমার দেহে আল্লাহর ভয়ে ভীষণ কম্পন শুরু হলো। আমি সাথে সাথে হালওয়া-রুটি ভক্ষণের ইচ্ছা মন থেকে মুছে ফেললাম। এরপর দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলাম।"

আল্লাহর এক মযজূব ওলির সঙ্গে সাক্ষাৎ

বাগদাদের নিকটস্থ একটি গ্রামের নাম ছিলো 'বাকূবা'। নিযামিয়ার ছাত্ররা প্রায়ই এ গ্রামে এসে আড্ডা দিতেন। গ্রামের কৃষকদের নিকট তারা খাদ্যের জন্য আবদার জানাতেন। সে যুগে সাধারণ মানুষ তালিবে ইলমদের খুব শ্রদ্ধা করতো এবং সুযোগ পেলেই তাদেরকে যে যেভাবে পারে আপ্যায়ন করাতো।

একদা হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর হাম-জামাতী ছাত্ররা উক্ত বাকূবা গ্রামে যেতে তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইলো। শ্রেণিবন্ধুদের আবদারে সাড়া দিয়ে তিনি তাদের সঙ্গী হলেন। গ্রামে পৌঁছুনোর পর শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহকে কেউ একজন অবগত করলেন, এখানে শরীফ বাকূবী নামক একজন ওলিআল্লাহ বাস করেন। এ সংবাদে হযরত জিলানীর মনে আগ্রহ জাগলো তাঁর সাথে সাক্ষাতের।

শায়খ বাকূবী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে আসার পরই তিনি শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন। সাথে সাথেই বুঝতে পারলেন, ইনিই হচ্ছেন 'জামানার কুতুব'। বললেন, "হে আমার পুত্র! যারা আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণ করেন, তারা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কখনো অন্যের দিকে হাত প্রসারিত করেন না। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহর নির্বাচিত আবিদদের একজন। ক্বাতিয়া বাকূবের লোকদের নিকট দানার [শস্য] জন্য আবদার করা আপনার ক্ষেত্রে খাঁটে না।"

হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন, "ঐ দিন থেকে আমি আর কখনও এরূপ ভ্রমণে যাই নি এবং কারোর নিকট কোনো কিছু পেতে আবদারও জানাই নি।"

গায়েবী মদদ

একদিন শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ জঙ্গলে যেয়ে লেখাপড়া করছিলেন। হঠাৎ এক গায়েবী আওয়াজ তাঁর শ্রুতিগোচর হলো: "হে আবদুল ক্বাদির! তুমি তো কয়েকদিন যাবৎ কিছু ভক্ষণ করো নি। যাও, কারোর নিকট থেকে দিনার ধার করে কিছু খাবার ক্রয় করো। এটা আম্বিয়াদের সুন্নাত।"

গায়েবী এ নির্দেশনা শ্রবণ করে হযরত শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ উপরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, "আমি তো কিছুই ধার করতে পারবো না- কারণ তা পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নেই।" গায়েবী আওয়াজ আবার শুনা গেলো, "চিন্তার কারণ নেই। কর্জ শোধ করার দায়িত্ব আমাদের!"

সুতরাং, নির্দেশ পালনার্থে তিনি একটি দোকানে গেলেন। বললেন, "টাকা বাকি রেখে আমি কিছু খাবার চাচ্ছি। দয়াকরে দৈনিক আমাকে দেড়টা করে রুটি দেবেন। যখনই আমার সামর্থ হবে আমি সব টাকা পরিশোধ করবো। তবে টাকা পরিশোধ না করেই যদি মারা যাই তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে মাফ করে দেবেন।"

দোকানী ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক মকবূল বান্দাহ। তাঁর কোমল হৃদয় আরো নরম হয়ে গেলো হযরতের আবদার শুনে। চোখ দুটো অশ্রুতে সিক্ত হলো। তিনি বললেন, "আপনি যখনই যা-ই চান আমার দোকান থেকে নিয়ে যাবেন।" সেদিন

থেকে হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ দৈনিক দেড়টি করে রুটি এ দোকান থেকে নিয়ে যেতে থাকেন। বেশ কিছুদিন চলে গেলো। হযরত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দোকানীর নিকট বেশ কিছু টাকা কর্জ হয়ে গেছে। একদিন এ চিন্তায় থাকাবস্থায় সে-ই আগের গায়েবী আওয়াজ তাঁর শ্রুতিগোচর হলো: "হে আবদুল ক্বাদির! অমুক স্থানে তুমি চলে যাও। ওখানে যা-ই পাবে ঐ দোকানীকে দেবে।"

শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ নির্দেশিত স্থানে যেয়ে দেখতে পেলেন সেখানে একখণ্ড স্বর্ণ পড়ে আছে। তিনি এটি হাতে তুলে নিলেন এবং বাজারে যেয়ে সেই দোকানীকে দিলেন। এতেই তাঁর সমস্ত কর্জ শোধ হয়ে গেলো।

আধ্যাত্মিক ভ্রমণ

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করে হাক্বিক্বাতের রাস্তায় ভ্রমণে আরো গভীরভাবে মনোযোগী হন। তিনি জানতেন সত্যিকার জ্ঞান হচ্ছে ইলমে মা'রিফাত [প্রভুপরিচিতি]। ইতোমধ্যে তিনি জুনাইদিয়া তরিকাপন্থী শায়খ আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহর মুরীদ হয়েছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক লেখাপড়ার চাপে আধ্যাত্মিক সাধনায় খুব বেশি নিজেকে লিপ্ত করতে পারেন নি।

স্বীয় মুর্শিদ ছাড়াও তিনি বাগদাদের আরো একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলির সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর নাম ছিলো হযরত হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাস রাহিমাহুল্লাহ। তবে বাগদাদে যখন অরাজকতার সৃষ্টি হয় তখন হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে সিদ্ধান্ত নেন। আমরা হযরতের নিজের ভাষায় বাকি ঘটনাবলীর বর্ণনা শুনবো।

তিনি বলেন, "আমি বাগদাদ শহর থেকে বেরিয়ে পড়ি। কারণ শহরের অবস্থা ছিলো আমার সাধনার জন্য অযোগ্য। তখন শহরের বাইরে একটি রাস্তার ওপর হেটে চলছি। হটাৎ আমাকে এক অদৃশ্য হাত শক্তভাবে ধাক্কা দিলো। আমি জমিনের ওপর পড়ে গেলাম। এরপর এক গায়েবী কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেলাম: "এখান থেকে কোথাও যেয়ো না! আল্লাহর সৃষ্টি তোমার মাধ্যমে উপকৃত হবে।"
আমি জবাব দিলাম, "মানুষের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমি তো আমার ঈমান রক্ষার্থে ছুটে চলছি।"

আবার কণ্ঠধ্বনি শুনা গেলো: “না! তোমাকে এখানে থেকে যাওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তোমার ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে না।”

এরূপ ইলহাম প্রাপ্তির পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বাগদাদে থেকে যাই। পরদিন আমি একটি রাস্তায় চলাকালে একব্যক্তিকে দেখতে পেলাম নিজের দরোজা খুলে আমাকে ইশারা করলেন। দরোজার কাছে যেতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, “হে আবদুল ক্বাদির! তোমার প্রভুর নিকট গতকাল তুমি কী জিজ্ঞেস করেছিলে?” একথা বলেই দরোজা বন্ধ করে দিলেন। আমি সামনে অগ্রসর হলাম। কিছদূর যেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, ঐ ব্যক্তি তো নিশ্চিত আল্লাহর এক ওলি। তিনি যদি তা-ই না হতেন, তাহলে গতকালের গায়েবী কথোপকথনের ব্যাপারটি জানলেন কীভাবে? আহ! আমি কী ভুল করলাম। আমি ফিরে গিয়ে তাঁর দরোজা খুঁজতে লাগলাম কিন্তু সফল হলাম না। এর পর থেকে দীর্ঘদিন আমি তাঁর অনুসন্ধান করেছি। তাঁকে খুঁজে পাই নি। অবশেষে একদিন বাগদাদের এক অঞ্চলে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি তখন বেশ কিছু ভক্ত-মুরিদানকে নসিহত করছিলেন। আমি এগিয়ে বললাম, হযরত! অনুগ্রহ করে এ অধমকে আপনার সান্নিধ্য লাভে ধন্য করুন। তিনি আমার আবদার গ্রহণ করলেন। এরপর দীর্ঘদিন এই শায়খের সুহবতে থাকার সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি ছিলেন, হযরত শায়খ সায়্যিদ হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাস রাহিমাহুল্লাহ।”[৯১]

শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ হযরত শায়খ হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। হযরত হাম্মাদের জন্মস্থান ছিলো শামে [সিরিয়ায়]। তিনি বাগদাদে এসে মুজাফফরিয়া নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। হিজরি ৫২৫ সনে তিনি বাগদাদেই চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর সমাধি বাগদাদের প্রখ্যাত কবরস্থান সুনিজিয়ায় অবস্থিত।

হযরত হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ ছাড়াও হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ আধ্যাত্মিক ভ্রমণের সবক নেন তাঁর প্রথম মুর্শিদ হযরত শায়খ আবু সাইয়্যিদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ থেকে।

---

[৯১] প্রাগুক্ত।

হিজরি ৪৯৬ সনের দিকে গউসুল আজম জিলানী রাহিমাহুল্লাহ শরীয়ত ও তরিকতের ওপর উচ্চতর জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করেন। এরপর ৫২১ হিজরি সন পর্যন্ত প্রায় ২৫ বছরব্যাপী তিনি নিজেকে মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে রাখেন। খিলওয়াত অর্জনের মাধ্যমে তিনি কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করেন। এ দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন বর্ণনার সবটুকু তো দূরের কথা, সামান্য কিছুমাত্র এ প্রসঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছি। আমরা আশাবাদী, পাঠকরা এতে বেশ উপকৃত হবেন। তবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হচ্ছে এ গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা। আল্লাহ আমাদেরকে সফল করুন।

দীর্ঘ পঁচিশটি বছর হযরত রাহিমাহুল্লাহ মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে বাগদাদের বাইরের মরুভূমি ও বিজন অঞ্চলে ঘুরে কাটিয়েছেন। দৈহিক ও মানসিক ভীষণ কষ্ট সহ্য করেছেন। প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি ‘ফানা ফিররাসূল’ এর স্তরে উন্নীত হন। এরপর ‘ফানা ফিল্লাহ’র মাক্বামে আরোহণ করেন। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে ‘ইশকে ইলাহী’র মহাসায়রে নিজেকে পুরোদমে নিমজ্জিত করেন। এ সময় একমাত্র আল্লাহর ধ্যানই ছিলো তাঁর আত্মার খোরাক। তিনি এক মুহূর্তও জিকরুল্লাহ থেকে গাফিল হন নি।

অবশেষে তাঁর ধৈর্যের মাত্রা পরিণত হয় এক কঠিন শিলাবৎ পর্বতের মতো। কিছুই যাকে সীরাতুল মুস্তাক্বীমের ওপর থেকে একবিন্দু এদিক-সেদিক সরাতে পারে না। নিচে এ সময়কার কয়েকটি হৃদয় উন্মোচনী ঘটনা আমরা উল্লেখ করছি।

১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ: হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এক বয়ানে বলেন: “দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ আমি ইরাকের মরু-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। একাধারে চল্লিশ বছর ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছি। পনেরো বছরব্যাপী একপায়ে সারারাত দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছি। এসময় আমি একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত উপবাসে কাটিয়েছি- একটি দানাও মুখে দেই নি।” এসবই ছিলো নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার অংশ।

২. আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা: শায়খ আবুল মাসউদ বিন আবু বকর হারিমী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ আমাকে একদিন বললেন, ‘বছরের পর বছর আমি আমার নফসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। এ সময়

নিজেকে কঠিন ও অসম্ভব রকমের পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছি। দীর্ঘ এক বছর আমি শুধুমাত্র শাক-সবজি খেয়েছি। পানিও পান করি নি। পরের বছর পানি পান করেছি ঠিকই কিন্তু অন্য কিছু খাই নি। এর পরের বছর না খাবার খেয়েছি না পানি পান করেছি।[৯২] সময় সময় একাধারে অনেকদিন কেটেছে, আমি একবারের মতোও চোখ বন্ধ করি নি। এসময় আমি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হয়েছি। কোনো কোনো সময় নফসকে শায়েস্তা করতে অসংখ্য কাটার ওপর গড়াগড়ি করেছি। এতে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছি। মানুষ আমাকে কাঁধে করে বহন করেছে- নিয়ে গেছে চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসক বললেন, 'এ লোক তো মারা গেছে!' লোকজন একথা বিশ্বাস করে আমাকে গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থায় লেগেছে। গোসলের খাঁটে ওঠানোর পর যখন উষ্ণ পানি আমার গাঁয়ে ঢেলেছে তখনই আমার হুঁশ ফিরে এসেছে। আধ্যাত্মিক অবস্থা থেকে জেগে ওঠেছি।"

৩. নিজেকে হারানোর অভিজ্ঞতা: হযরত নিজেই রিয়াজত-মুজাহাদার সময়কার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মুজাহাদার প্রাথমিক দিকে আমি নিজের অবস্থার কথা বুঝতে পারতাম না। এমনকি আমি কখন কোথায় আছি, তা-ও জানতাম না। কিভাবে কোন জায়গায় ভ্রমণ করেছি সে ব্যাপারেও গফিল ছিলাম। একবার বাগদাদের নিকটস্থ একটি গ্রামের কাছে পৌঁছুনোর পর কিছুটা হুঁশ আসলো। এরপর আমি এমন এক আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হলাম যে, নিজের দৈহিক অনুভুতি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেললাম। আমি আমার দেহের মধ্যেই ছিলাম না। এ অবস্থায় আমি দৌড়াতে থাকি। তবে নিজের দেহকে দেখতে বা অনুভব করতে পারি নি। এরপর যখন নিজের দেহকে পুনরায় অনুভব করলাম ও চেতনশীল হলাম তখন হিসেব করে দেখি দীর্ঘ ১২ দিন যাবৎ আমি অবিরাম দৌড়ে ছুটেছি! এ কী হচ্ছিলো তা নিজেই বুঝতে পারি নি। অত্যন্ত আশ্চর্য ও বিস্মিত বোধ করি। এরপর দেখলাম এক বৃদ্ধা আমার কাছে এসেছেন। বললেন, "হে পুরুষ! আপনি হচ্ছেন শায়খ আবদুল ক্বাদির। যখন এরূপ কিছু আপনার ব্যাপারে ঘটে তখন বিস্মিত বা অবাক হবার কিছু নেই!"

[৯২] সাধারণত মানুষ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। উক্ত কথাগুলো দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, কঠোর সাধনাকালে তিনি বেশিরভাগ সময় উপবাসে কাটিছেন। এছাড়া এটা ছিলো হযরতের কারামতের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন কিতাবে এসব কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত আল্লাহ তা'আলা।

৪. হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ: তিনি নিজেই বলেন, "আমি তখন বাগদাদের জঙ্গলে যেয়ে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম-সাধনা শুরু করেছি মাত্র। আমার সম্মুখে হাজির হলেন এক সুদর্শন উজ্জ্বল চেহারাসম্পন্ন ওলি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী আমার সঙ্গে থাকতে চাও?" আমি বললাম, "জী হযরত, থাকতে চাই।" তিনি বললেন, "ভালো কথা। তবে শর্ত হচ্ছে আপনি আমার নির্দেশনার প্রতি শুধুমাত্র আনুগত্যশীল থাকবেন। আমার কথা ও কাজের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না।" হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "আমি রাজী।"

প্রথমেই উভয়ে একটি জায়গায় পৌঁছুলেন। ওলিআল্লাহ ব্যক্তি বললেন, ঠিক এই স্থানে আপনি বসে থাকুন। এ এলাকা থেকে একবিন্দুও নড়বেন না যতক্ষণ না আমি ফিরে এসেছি। তিনি চলে গেলেন। প্রায় বছর খানেক পরে তিনি ফিরে আসলেন। লক্ষ্য করলেন হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ তখনও এলাকায় স্থির আছেন! কিছুক্ষণ হযরতের কাছে বসে থেকে আবার বললেন, "এখানে বসে থাকুন, আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত।" এবারও তিনি এক বছর পর ফিরে আসলেন। হযরত রাহিমাহুল্লাহ স্বস্থান থেকে নড়লেন না। ওলিআল্লাহ ব্যক্তি ফিরে এসে একইভাবে বললেন, "বসে থাকুন। আমি ফিরে আসছি।" এবারও আরেক বছর কেটে গেলো। ওলিআল্লাহ ব্যক্তি ফিরে এসে হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহর কাছে বসলেন। তবে এবার নিয়ে আসলেন কিছু রুটি ও দুধ। অবশেষে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, "আমি খিজির। এ খাবার আপনার সাথে ভক্ষণের জন্য আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে।" উভয়ে একত্রে বসে পবিত্র দুগ্ধ-রুটি আহার করলেন। হযরত খিজির আলাইহিসসালাম এবার শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবদুল ক্বাদির! গত তিন বছর এই একই স্থানে বসে আপনি কী খাবার খেয়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "মানুষ যা কিছু আমার কাছে ছুড়ে দিয়েছে!"[৯৩]

পবিত্র হজ্জ পালন

'আজকারুল আবরার' কিতাবে আছে হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বেশ অল্প বয়সেই প্রথমবারের মতো হজ্জব্রত পালন করেন। হযরত রাহিমাহুল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যুবক বয়সেই আমি প্রথমবারের

---

[৯৩] 'আজকারুল আবরার' দ্র:।

মতো পবিত্র হজ্জ পালন করি। এ সফর শুরুর সময় আমি 'কূরুর' নামক একটি স্তম্ভের নিকট আসি। এখানে সাক্ষাৎ ঘটে শায়খ আদি বিন মুসাফির রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে। এসময় তিনিও অল্প বয়সের যুবক ছিলেন মাত্র। তিনি আবদার জানালেন, আমার সঙ্গে ভ্রমণের। আমি খুশিমনে অনুমতি দিলাম এবং উভয়ে পবিত্রভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে দেখলাম একজন হাবসী মহিলা বুরকা-নেকাব পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমার নাম ও কোথায় থেকে যাত্রা করেছি, তা জানতে চাইলেন। আমি জবাব দিলাম, "আমার নাম আবদুল ক্বাদির। জিলান থেকে যাত্রা করেছি।" তিনি বললেন, "হে যুবক! তোমার সন্ধান হেতু আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি আবিসিনিয়ায় থাকতে আধ্যাত্মিকভাবে অবগত হই যে জিলানের আবদুল ক্বাদিরের হৃদয় আল্লাহর নূরে উজ্জ্বল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। এ ব্যাপারগুলো জানার পর আমি তোমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। আমার হৃদয় বলছে, আজ আমি তোমার সাথে ভ্রমণ করবো ও এক সঙ্গে ইফতার সারবো।"

যখন সন্ধ্যা নেমে এলো, দেখলাম একথালা গায়েবী খাবার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। এতে ছিলো ৬টি রুটি, শুরবা ও সবজি। আবিসিনিয়ান মহিলা থালা দেখে বললেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। সাধারণত আপনি আমার জন্য প্রতি রাত দুটি মাত্র রুটি প্রেরণ করে থাকেন। আজ আপনি আমরা তিন জনের জন্যই যথেষ্ট পাঠিয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ!" খাবার শেষে দেখলাম, থালাটি হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলো। এরপর আরেকটি থালা দৃশ্যমান হলো। এতে ছিলো তিন বাটিভর্তি পানি। এ পানি এমন মিষ্টি ও সুস্বাদু ছিলো যে, ইতোপূর্বে কিংবা পরে আমি কখনও এমন পানি পান করি নি। এরপর আবিসিনিয়ান মহিলা চলে গেলেন। শায়খ মুসাফির ও আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম এবং সময়মতো পবিত্র নগরী মক্কা মুকাররমায় যেয়ে হাজির হলাম।

তাওয়াফকালে আসমানী নূর

হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: "পবিত্র হজ্জের সফরে থাকাকালে একদিন আমি ও আমার সাথী শায়খ আদি বিন মুসাফির বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ ঊর্ধ্বাকাশ থেকে নেমে আসলো আসমানী নূর। শায়খ

মুসাফির এ তাজাল্লির প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে মাতহাফে পড়ে গেলেন। মনে হচ্ছিলো তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। মুসাফিরের নিকট এসে দেখি তাঁর কাছে সে-ই আবিসিনিয়ান আবিদা উপস্থিত আছেন। তিনি তাঁর কাঁধে ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। বললেন, "যে আল্লাহ তোমায় মউত দিয়েছেন সে-ই আল্লাহই পুনরায় তোমায় হায়াত দান করবেন। তিনি সে-ই মহান একক আল্লাহ, যার নূরের তাজাল্লির অনুরূপ আর কিছু নেই। এ মহাবিশ্ব সৃষ্ট ও অস্তিত্বশীল হতো না, তাঁর নির্দেশ ছাড়া। তাঁর সৃষ্টিক্রিয়ার পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিলো না। এখন আল্লাহর নূর ও ক্ষমতায় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়েছে এবং এ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে তাঁদের চোখ।"

আবিসিনিয়ান আবিদা বৃদ্ধার এ কথাগুলো শেষ হতেই শায়খ মুসাফির জ্ঞান ফিরে পেলেন। তিনি চোখ খুলে তাকালেন। এরপর ধীরে ধীরে পুনরায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাওয়াফ শুরু করলেন। কিছুক্ষণ সামনে অগ্রসর হওয়ার পরই কিন্তু আমার ওপরও আসমানী নূরের তাজাল্লি এসে পতিত হলো। সাথে সাথে আমি একটি গায়েবি আওয়াজও শুনলাম: "হে আবদুল ক্বাদির! সৃষ্টজগৎকে ভুলে যাও। তোমার প্রভুর স্মরণে নিজেকে ডুবিয়ে দাও! তোমার নিকট আমাদের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ বস্তু উন্মোচন করবো। তোমার দুনিয়াবী ভাবনার সঙ্গে আমাদের ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটাবে না। দৃঢ় থাকো। আমি ছাড়া কারো সন্তুষ্টি অর্জনের কল্পনাও করবে না। নিজেকে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। তোমার ওয়াসিলায় বেশ কিছু লোক আমার আবিদে পরিণত হবে।"

এ গায়েবি কথাগুলো শোনার পর আবিসিনিয়ান আবিদা বলতে থাকেন: "হে আবদুল ক্বাদির! আজ আপনি উত্তম উপহার দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হলেন। আপনার মাথার ওপর আমি দেখতে পাচ্ছি নূরের ছাতা। দেখতে পাচ্ছি এর চতুর্দিকে ফিরিশতাদের বিচরণ। আজ সকল আউলিয়ায়ে কিরাম আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।" এ কথাগুলো বলার পর বৃদ্ধা আবিদা হঠাৎ গায়েব হলে গেলেন। আমি তাঁকে আর কোনোদিন দেখি নি।"

ইবলিসের মুখোমুখি

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমার জীবনে একাধিকবার ইবলিস ও তার সাথীদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছি। আল্লাহর

দয়া ও সাহায্যে আমি প্রতিবারই এসব আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছি। একইভাবে নফসের প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্ষতিকর আকাঙ্ক্ষা থেকেও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সর্বদা নিরাপদ রেখেছেন। যখনই ইবলিস এসে অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিতে অগ্রসর হয়েছে তখনই আমি গায়েবি আওয়াজ শুনেছি: "হে আবদুল ক্বাদির! দৃঢ় থাকো! এদেরকে প্রতিহত করো! তোমার প্রতি আমাদের নজর ও সাহায্য আছে।""

তিনি বলেন, "উক্ত গায়েবি নির্দেশনা শুনে আমি দৃঢ়তা অবলম্বন করেছি ও ইবলিসের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! সময় সময় শয়তান আমার বিরুদ্ধে খুব ভয়ঙ্কর ও দুঃসাহসী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যখনই সে ভীতিকর চেহারা ধারণ করে আমার দিকে অগ্রসর হয়েছে তখনই খুব আধ্যাত্মিক জালালি সুরে বলেছি, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম'। সাথে সাথে সে অদৃশ্য হয়েছে।"

ইবলিসের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি অবস্থান: তিনি বলেন, "একদিন ইবলিস আমার সম্মুখে খুব ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলো। নরাধমের উপস্থিতি হেতু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো অসহ দুর্গন্ধ। সে বললো, 'আমি ইবলিস! আপনি আমার সকল শাগরিদ ও আমাকে পরাজিত করেছেন। আমরা আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে অনেক ধরণের কৌশল অবলম্বন করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আপনার শাগরিদ হবো!"

একথা শুনে আমি খুব রাগান্বিত হয়ে তাকে নির্দেশের সুরে বললাম, "হে অভিশপ্ত ইবলিস! এক্ষুণি এখান থেকে পালিয়ে যা!" কিন্তু নরাধম এ নির্দেশ অমান্য করে দাঁড়িয়ে রইলো। এক গায়েবি হস্ত এসে তাকে এতো জোরে চপেটাঘাত হানলো যে, সাথে সাথে সে ধরাশায়ী হলো এবং মিলিয়ে গেলো।"

ইবলিসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি অবস্থান: গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একদা শয়তান আমার সামনে হাজির হলো। তার হাতে ছিলো একাধিক অগ্নিগোলক। এগুলো সে একটার পর আরেকটা আমার দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো। আমি নিজেকে রক্ষা করলাম। ইতোমধ্যে মুখোশধারী এক ব্যক্তি সাদা রংয়ের ঘোড়ায় আরোহণ করে উপস্থিত হলেন। তিনি আমার দিকে একটি তরবারি ছুড়ে মারলেন। আমি এটি ঝাপটি মেরে ধরে

আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে শয়তানের দিকে অগ্রসর হলাম। সাথে সাথে মরদুদ শয়তান পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে দ্রুত ছুটে পালালো।”

ইবলিসের সঙ্গে তৃতীয়বার মুখোমুখি অবস্থান: তিনি বলেন, “আমি একদিন এক শয়তানকে দেখলাম। সে তখন খুব বেজার ছিলো। মাটিতে বসে সে তার মাথায় বালু ছড়াচ্ছিলো। আমাকে দেখে সে বললো, “হে শায়খ! আপনি আমাকে খুব বেজার ও মোহমুক্ত করে ফেলেছেন।” আমি তাকে বললাম, “হে অভিশস্ত শয়তান! চলে যা। আমি সব সময় তোর কারসাজি থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক আশ্রয় প্রার্থনা করি: লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।” সে বললো, “আমি এই কথাগুলো শুনলে খুব ভয় পাই। খুব বেশি আঘাত পাই।”

এরপর সে আমার চতুর্দিকে অসংখ্য জাল ও ফাঁদ পাতলো। জিজ্ঞেস করলাম, “এগুলো কী?” বললো, “এগুলো হচ্ছে এ দুনিয়ার জাল ও ফাঁদ। এগুলোর মধ্যে আমরা মানুষকে জব্দ করে থাকি।” এ কথা বলে সে প্রস্থান করলো। শয়তানের এ কথাগুলো আমাকে দুনিয়ার সকল জাল ও ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে আরো বেশি দৃঢ় করে তুললো। এরপরও দীর্ঘ এক বছর সময় লেগেছে, এ কঠিন কাজটি আঞ্জাম দিতে।”

পবিত্র শরীয়ত অনুসরণে দৃঢ়তা

শরীয়ত ও তরিকতের গভীর জ্ঞানার্জন এবং আধ্যাত্মিক উচ্চতর মাক্বামে আরোহণের পর, হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ মানুষের নিকট এক অসাধারণ হক্বানী দিকনির্দেশক ও অন্ধকারে নূরোজ্জ্বল বাতি হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি হক্ব ও বাতিলের দৃঢ় কণ্ঠস্বর হিসেবে তখনকার বাগদাদে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেন। বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন ইস্পাত কঠিন ও সুদৃঢ় পর্বতসম। তিনি সবসময় বলতেন, “কিয়ামত পর্যন্ত কেউ কোনোদিন পবিত্র শরীয়তকে পরিবর্তন করতে পারবে না। যে কেউ শরীয়তের নির্দেশনাকে অমান্য করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।” হযরতের সাহেবজাদা শায়খ জিয়াউদ্দীন আবু নাসির মূসা তাঁর খিলওয়াত অবলম্বনকালীন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হযরত জিয়াউদ্দীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমার আব্বা হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী বলেছেন, তিনি একদিন জঙ্গলের ভেতর একাকী মুজাহাদা অবস্থায়

খুব বেশি তৃষ্ণার্ত হলেন। হঠাৎ মাথার ওপরে একখণ্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটলো। অঝোর ধারায় তাঁর ওপর শীতল বৃম্পিপাত শুরু হয়। তিনি বৃষ্টির পানি পান করে তৃষ্ণা মেটালেন। এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। তিনি বলেন, 'কিছুক্ষণ পর আরেকটি মেঘখণ্ড মাথার ওপর দৃশ্যমান হলো। কিন্তু এ থেকে বৃষ্টি নয়- নির্গত হলো প্রচণ্ড উজ্জ্বল অংশুমালা। সমগ্র আকাশমণ্ডল এবং জমিন আলোকিত হয়ে ওঠলো। এরপর মেঘখণ্ডে একটি অবয়ব চোখে পড়লো। আওয়াজ ওঠলো, "হে আবদুল ক্বাদির! আমি তোমার সৃষ্টিকর্তা! আমি তোমার জন্য সবকিছু হালাল করে দিলাম।"'

তিনি আরো বলেন, 'আমি সাথে সাথে পাঠ করলাম, লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। সঙ্গে সঙ্গে মেঘখণ্ড অদৃশ্য হয়ে গেলো। সবদিকে পুনরায় অন্ধকার নেমে আসলো। এরপর মরদুদ শয়তানের কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'হে আবদুল ক্বাদির! আপনি আলিম ও পরহেজগার হওয়ায় রক্ষা পেলেন। আমি অনেক আবিদকে এই ফাঁদে আটকিয়ে ইতোমধ্যে পথভ্রষ্ট করেছি।' শায়খ বললেন, 'অবশ্যই, আমার প্রভুই আমাকে তোর এই ফাঁদ থেকে রক্ষা করেছেন।'

আমি এ ঘটনা শুনে প্রিয় আব্বাজানকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কীভাবে বুঝলেন, সে শয়তান ছিলো?' তিনি জবাব দিলেন, 'তার উক্তি দ্বারা- যখন সে হারাম ও হালালকে আমার জন্য হালাল করেছে বললো। কারণ আল্লাহর নির্দেশ কখনও ভুলের হয় না। তিনি সবাইকে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন করতে বলেছেন। অভিশপ্ত শয়তান এ লোভ দেখিয়ে আমাকে পথভ্রষ্ট করার হীন চেষ্টা করেছিল।'"

যেসব স্থানে শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ ভ্রমণ করেছিলেন

সাধনার অংশ হিসেবে অধিকাংশ ওলিআল্লাহ বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন। হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহও বিভিন্ন জনপদ ও নির্জন ভূমিতে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন। প্রায়শঃই তিনি জনশূন্য মরু অঞ্চল, জঙ্গল ও পরিত্যক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত পল্লিগাঁয়ে যেতেন একাগ্রচিত্তে আল্লাহর জিকির-মুরাক্বাবা ও ধ্যান-ফিকির করতে। নিম্নে তাঁর এসব ভ্রমণের কয়েকটি স্থানের নাম, সাধনার নমুনা ইত্যাদি ব্যাখ্যাসহ উল্লেখিত হলো।

১. কারখ: শাইখুত তরিকত ও মা'রিফাত হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলিফা হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর জন্মস্থান কারখে

একাধিকবার সফরে যান হযরত গউসুল আজম জিলানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি কারখের নির্জন মরু অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। জায়গাটি বাগদাদের নিকটেই অবস্থিত। এ অঞ্চলটি ছিলো একাকী আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরে নিমগ্ন হওয়ার জন্য উত্তম জায়গা।

২. শুশতার: হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদ থেকে [সে যুগে] ১২ দিন ভ্রমণের দূরত্বে শুশতার নামক একটি স্থানে দীর্ঘ ১১ বছর কাটিয়েছেন। তিনি এখানে নির্জনে বসে আল্লাহর ধ্যান-মুরাক্বাবা ও ইবাদত-বন্দেগি করেছেন। এখানেই ইবলিস তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

৩. বুরুজ আজমীতে অবস্থান ও খিলাফত লাভ: শয়তানের সঙ্গে উপরোক্ত মুখোমুখি অবস্থান পরে হযরত শায়খ গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ আরো বেশি আল্লাহর জিকির ও ইবাদতে লেগে যান। তিনি বুরুজ আজমী নামক অঞ্চলে পরিত্যক্ত একটি উঁচু ইমারতের চূড়ায় ওঠে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতেন। এ স্থানটি বাগদাদের শহরতলীতে অবস্থিত ছিলো। একদা এখানে অবস্থানকালে তাঁর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা উন্মোচন হয়। হযরত শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এ অবস্থার বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন।

তিনি বলেন, “আমি এই ইমারতের চূড়ায় ধ্যানস্থ অবস্থায় একদিন আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, যতক্ষণ না কেউ নিজ হাতে আমার মুখে এক লুকমা খাবার ও পানীয় তুলে দেবে ততক্ষণ আমি কিছুই ভাক্ষণ বা পান করবো না। এ প্রতিজ্ঞা করার পর দীর্ঘ ৪০ দিন পার হয়ে গেলো। আমি কিছুই ভক্ষণ করি নি। আল্লাহর কুদরতে জীবিত থেকে যাই। এরপর এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে হাজির হলেন। থালাভর্তি খাবার আমার সম্মুখে পরিবেশন করলেন। এতে ছিলো গরম গোস্ত ভুনা ও রুটি। থালা রেখেই তিনি চলে গেলেন। ভীষণ ক্ষুদা হেতু আমার নফস বলতে লাগলো, এক্ষুণি আহার করে নাও। ক্ষুদা মেটাও। অপরদিকে আমার আত্মা বলতে লাগলো, সাবধান! তুমি তোমার মা’বুদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! খাবারে হাত দেবে না। ভেতরে এই দন্ধ চলাকালে প্রচণ্ড আওয়াজ শুনলাম। আমার নফস বলছিলো চিৎকার করে, “আমি ভীষণ ক্ষুদার্ত! ভীষণ ক্ষুদার্ত! আমাকে বাঁচাও!” আমি নফসের এ আহাজারির দিকে ভ্রুক্ষেপই করলাম না। আল্লাহর জিকিরে লেগে গেলাম। থালাটি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এর কিছুক্ষণ পরই আমার শায়খ হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ কোত্থেকে এসে আমার সম্মুখে হাজির হলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক কাশফের মাধ্যমে আমার অভ্যন্তরের চিৎকার শ্রবণ করলেন।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবদুল ক্বাদির! কীসের চিৎকার এটি?"
জবাব দিলাম, "ইয়া শাইখী! এটা হচ্ছে নফসের অধৈর্যতার চিৎকার। আমার আত্মা প্রশান্ত আছে।"
তিনি তখন বললেন, "এসো আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে এসো।" একথা বলেই তিনি চলে গেলেন।
আমি মনে মনে বললাম, "ইয়া শাইখী! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তো নির্দেশ ছাড়া যেতে অপারগ।"

ঠিক এসময় হযরত খিজির আলাইহিসসালাম উপস্থিত হলেন। বললেন, "দাঁড়াও! তোমার শায়খ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর বাড়িতে যাও।"

এ নির্দেশ পেয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কোনোমতে আমার শায়খ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর বাড়ির কক্ষের সামনে উপস্থিত হলাম। দেখলাম তিনি দরোজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "হে আবদুল ক্বাদির! আমার বলাটা কী তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলো না যে, শেষ পর্যন্ত হযরত খিজির আলাইহিসসালাম এসে তোমাকে দির্শেন প্রদানের প্রয়োজন দাঁড়ালো?" আমি মাথা নত করে নিরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিনি আমাকে ভেতরে নিয়ে যেয়ে নিজের হাতে খাবার মুখে দিলেন। এরপর তরিকতের খিরক্বা পরিয়ে দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন।"[৯৪]

৪. আইওয়ান কাছরা: হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ তালহা বিন মুজাফফর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একদিন শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ আধ্যাত্মিক সাধনার দিনগুলোর কথা বলতে যেয়ে উল্লেখ করেন: 'একদা দীর্ঘ ২০ দিন চলে গেলো, অভাব হেতু এক লুকমাও খাবার খাই নি। আমি তখন আইওয়ান কাছরা

---

[৯৪] অর্থাৎ, তাঁকে খিলাফত দান করলেন।

নামক ধ্বংসাবশেষ অঞ্চলে চলে গেলাম। ভাবলাম, হয়তো সেখানে কিছু খাবার যোগাড় হবে। কিন্তু দেখতে পেলাম, ওখানে সত্তুর জন দরবেশ খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এ দৃশ্য দেখে আমি বাগদাদে ফিরে যেতে পা বাড়ালাম। আসার পথে একজনকে পেলাম, তিনি আমাকে কিছু দিনার দিলেন। বললেন, এগুলো আপনার আম্মা পাঠিয়েছেন। আমি সটান ফিরে গেলাম আইওয়ান কাছরায়। ঐ সত্তুর জন দরবেশ তখনও খাবারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছিলেন। সামান্য কিছু দিনার নিজের জন্য রেখে বাকিটা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম। আমার নিকট যা ছিলো সেই দিনারগুলো দিয়ে কিছু খাবার কিনলাম এবং বাগদাদের গরীবদের নিয়ে একত্রে বসে আহার করলাম।’”

৫. মাদাইন: হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদাইন অঞ্চলেও ভ্রমণ করেছেন। সেখানে যেয়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন ও আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন হন।

মুর্শিদের সুহবতে

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ দু’জন শায়খের নিকট থেকে ইলমে তাসাওউফের দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমজন হচ্ছেন শায়খ হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাস রাহিমাহুল্লাহ। দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ। তবে তিনি খিলাফত লাভ করেন শেষোক্ত শায়খের নিকট থেকে।

হযরত মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় অবস্থানকালে মুর্শিদের সুহবত লাভে ধন্য হন। একদিন মুর্শিদ তাঁর এ প্রিয় মুরিদকে নিজের হাতে খাবার মুখে তুলে দিলেন। এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যখন আমার শায়খে তরিকত মুখের ভেতর একেকটি লুকমা খাবার তুলে দিচ্ছিলেন, মনে হলো আমি মা’রিফাতের একেকটি স্তর অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম।”

শায়খ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহকে খিলাফতের খিরক্বা পরিয়ে বললেন: “এই খিরক্বার মূল মালিক হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এটি দান করেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব

রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে। আর হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু এটি দান করেন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহকে। এভাবে যুগ যুগ ধরে মুর্শিদ থেকে খলিফাদের হাত হয়ে এটি আমার নিকট এসছে। হে আবদুল ক্বাদির! এখন আমি এটি তোমাকে দান করলাম।"

যে মুহূর্তে এই মুবারক খিরক্বা হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ গায়ে পরলেন, তখনই দেখা গেলো, উজ্জ্বল আলোর ঝলকে সমগ্র কক্ষটি আলোকিত হয়ে উঠলো। হযরতের অন্তরাত্মায় উদ্ভাসিত হলো ইলমে মা'রিফাতের অপূর্ব নূর।

একটি আশ্চর্য স্বপ্ন

একবার দূরের এক স্থান থেকে বাগদাদে ফেরার প্রাক্কালে হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, "আমি দেখলাম, বাগদাদের একটি রাস্তার ওপর আমি হেটে চলছি। চোখে পড়লো রাস্তার একপাশে এক ক্ষীণকায়, দুর্বল ব্যক্তি পড়ে আছেন। তিনি আমাকে সালাম জানালেন। আমি সালামের জবাব দেওয়ার পর তিনি বললেন, "বাবা! আমাকে উঠে বসতে একটু সাহায্য করো।" আমি তাঁকে সাহায্য করলাম। বসার পর তিনি ধীরে ধীরে বড়ো ও শক্তিশালী হতে লাগলেন! বিরাট আকার ধারণ করলেন। আমি এতে কিছুটা ভীতি অনুভব করলাম। তিনি বললেন, "ভয় করো না। আমি হচ্ছি তোমার পূর্বপূরুষের ধর্ম! আমি রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে পুনরায় জাগ্রত ও শক্তিশালী করেছেন তোমার সাহায্যে।" আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো।

উক্ত স্বপ্নের তাবির করতে যেয়ে যুগের ওলিগণ বলেছেন, "এর দ্বারা স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো, হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে শরীয়ত ও তরিকতের বিরাট খিদমাত সাধিত হবে।"

সমসাময়িক বাগদাদের দুরাবস্থা

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর যুগে বাগদাদ ও চতুর্দিকের জনপদের সামাজিক ও ধার্মিকতার অবস্থা খুব নাজুক ছিলো। মিথ্যাচার, ফিরকাবাজী ইত্যাদি সমগ্র এলাকায় আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। মানুষ আল্লাহর মনোনীত দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলো। ইলম ও আলিমদের প্রতি মানুষের মধ্যে সম্মানবোধ পর্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে আসে। এছাড়া সুন্নাতের অনুসরণ থেকে মানুষ একেবারে দূরে সরে পড়ে। মোটকথা একজন যুগ সংস্কারকের প্রয়োজন দাঁড়ায় যিনি মানুষকে পুনরায়

সঠিক দ্বীনদারিত্বের দিকনির্দেশনা দেবেন ও নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে সকল মানুষকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ঠিক এরূপ একজন যুগ সংস্কারক বাগদাদে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি আর কেউ নন, আমাদের আলোচিত মহান ওলিআল্লাহ গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরতের আল্লাহ প্রদত্ব আধ্যাত্মিক শক্তি ও শরীয়তের গভীর জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাগদাদ ও আশপাশের অঞ্চল তিনি আলোকিত করে তুলেন।

দীর্ঘদিন রিয়াজত-মুরাক্বাবা-মুশাহাদা শেষে তিনি পুনরায় স্থায়ীভাবে বাগদাদে বসবাস শুরু করেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চশেরও উপরে। তখন হিজরি ৫২১ সালের শুরু, যখন তিনি প্রকাশ্যে জনমসক্ষে হাজির হয়ে তাঁর বিখ্যাত বয়ানসমূহের সূচনা করেন।

বাগদাদের গোলাপ

আধ্যাত্মিক দীর্ঘ ভ্রমণশেষে বাগদাদে ফিরেই তিনি প্রথমেই কয়েকটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি সব বাঁধা-বিপত্তি ও কষ্ট-কাঠিন্যতা রাজকীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠেন। বাগদাদের তখনকার ইসলামী প্রতিভাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি তাঁর আগমনে কিছুটা বিচলিত হন। হযরতের উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তর তাঁদেরকে ভাবিয়ে তুলে। অচিরেই তাঁর চতুর্দিকে জড়োত হয় একঝাক অনুসারী, ভক্ত-মুরিদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। অপরদিকে উলামায়ে কিরাম একত্রিত হয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে, হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর বাগদাদে অবস্থানে তাঁর সন্তুষ্ট নন।

তাঁদের ইশারা-ইঙ্গিতের নমুনা হিসেবে একটি বড়ো পাতিলে সম্পূর্ণভাবে পানি ভর্তি করে পাঠিয়ে দিলেন হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানীর বাসস্থানে। এর দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য ছিলো যে, পাতিলটি হচ্ছে 'বাগদাদ' আর এর ভেতরের 'পানি' হলো বাগদাদের উলামায়ে কিরাম। অর্থাৎ বাগদাদ শহরে আর কোনো শায়খের সঙ্কুলান হবে না! যথেষ্ট আছেন।

খুব বিচক্ষণ প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে যুগের গউস হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁদের এই আক্রমণকে প্রতিহত করেন। তিনি পাত্রের ঠিক মাঝখানে একটি তাজা গোলাপ ফুল রাখলেন। এটি

ভাসতে থাকে। এরপর তিনি পাত্রটি ফেরৎ পাঠালেন প্রেরক আলিমদের নিকট। সবাই পাত্রটির মাঝখানে গোলাপ ফুল ভাসছে দেখে বিস্মিত হলেন। শায়খ জিলানীর প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক স্তরের প্রমাণ পেয়ে অভিভূত হলেন। আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে ‘বাদাদের গোলাপ’ খেতাবে ভূষিত করলেন।

শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর বয়ান

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর বয়ানসমূহ স্বরচিত বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলো এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্য। আমরা প্রসঙ্গক্রমে এক দুটো বয়ানের সারাংশ তুলে ধরবো মাত্র। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, শরীয়ত ও তাসাউফের ওপর গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহর বয়ানসমূহ পাঠ করতে নিম্নলিখিত কিতাবগুলো পাঠ করুন। এগুলো উর্দু ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১. ফুতুহুল গায়িব।
২. সিররুল আসরার।
৩. গুণিয়াতুত তালিবীন।
৪. আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়াল ফায়জুর রাহমানী।
৫. মালফুযাতে গউসুল আজম।

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বয়ানের সূচনা: শাওয়াল মাস, ৫২১ হিজরি। শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ একটি স্বপ্ন দেখেন। রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন: “হে আবদুল ক্বাদির! বয়ানের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দাও।”

শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিতো একজন অনারব। আরবি ভাষায় প্রাঞ্জল বয়ান পেশ কী আমার পক্ষে সম্ভব?”

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই আয়াতে করীম তিলাওয়াত করেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ * وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ * وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

-“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে। এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ

থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।” (সূরা নাহল: ১২৫)

এ স্বপ্ন দেখার পর ঐদিনই গউসুল আজম রাহিমহুল্লাহ মিম্বরে ওঠে বয়ান শুরু করেন। আমরা তাঁর এই প্রথম বয়ানের কিয়দংশ পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

হযরত রাহিমাহুল্লাহ বয়ানটি প্রদান করেন ‘হালবাই বারানিয়া’য়, ৫২১ হিজরি সনের শুক্রবার দিন ১৫ই শাওয়াল মাসে। প্রথমে হামদ ও নাত পেশ করেন। এরপর বলেন:

“আল্লাহর ওলিদের হৃদয় পবিত্র ও পরিষ্কার। তাঁরা সৃষ্টিকে তালাক দিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রেমের সায়রে ডুব দিয়েছেন। তাঁরা ইহলোককে বিসর্জন দিয়ে পরলোকের অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। তোমরা তাঁদেরকে চিনতে অপারগ এ কারণে যে, গাইরুল্লাহর মধ্যে তোমরা হারিয়ে গেছো। এ কারণে, তোমরা ও তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট দূরত্ব। যদি কেনো ঈমানদার তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তাহলে এর বিপরীত কর্ম করবে না। কারণ, এ উপদেশদাতা তেমোদের মধ্যে কী আছে তা দেখেন- যা তোমরা নিজেই দেখতে অপারগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ

“একজন মু’মিন ওপর আরেক মু’মিনের আয়নাস্বরূপ এবং একজন মু’মিন আরেকজন মু’মিনের ভাই।”[৯৫]

সত্যিকার একজন ঈমানদার সর্বদাই তার অপর মুসলমান ভাইকে নিজের হৃদয় থেকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি তাকে খোলাখুলিভাবে তার দুর্বলতা ও অলসতার কথা বলে দেন। মহান আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক পবিত্র। তিনি আমার অন্তরে অনুভূতি জাগ্রত করে দিয়েছেন, যাতে আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে উপদেশ প্রদান করি। এখন, আমি বলে দিচ্ছি আমার প্রিয় উত্তম আমলের কথা। আমি তোমাদেরকে হক্বের উপদেশ দেবো। বুঝিয়ে দেবো যা আমি সত্য ও সঠিক হিসাবে জেনেছি। বিনিময়ে আমি কোনো জাগতিক ফায়দা চাই না- এমনকি পরলোকেও বিনিময় কামনা করি না।

---

[৯৫] আবু দাউদ. হা. নং. ৪৯১৮।

সকল আকাঙ্ক্ষা আমার প্রেমাস্পদের জন্য খাস। তাহলো, আমার আন্তরিক উপাসনা। হ্যাঁ, আমি খুব আনন্দিত হই যখন দেখি আমার মুরিদান সফলতা ও স্বচ্ছলতা অর্জন করেছেন। এতে আমার হৃদয় এতোই খুশি হয় যে, ক্বলব ও মস্তক আমার সৃষ্টিকর্তা সকাশে অবনত হয়ে পড়ে। হে আল্লাহর বাদাহগণ! আমি তোমাদের হৃদয়ের পরিশুদ্ধি সাধনকে আমার লক্ষ্য বানিয়েছি। আমি নিজের ব্যক্তিগত কোনো ফায়দা লাভের প্রতি লালায়িত নয়। কারণ, ইতোমধ্যে আল্লাহর মর্জিতে এ স্তর আমি অতিক্রম করেছি।

আমি তোমাদের হাতে হাত ধরে সঠিক রাস্তায় নিয়ে যেতে চাই। সুতরাং এ লক্ষ্যর্জনে আমার নিকট আবদার জানাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পবিত্র দরবারে যেতে সুসজ্জিত হতে সাহায্য করবো। ... তোমাদের অবস্থা কী? এটা যেনো নির্জীব কিংবা মৃতদেহের মতো একটি জড়ের ওপর এক ফোটা জল। একে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শকুনের কিংবা অন্যান্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণের শিকার হিসেবে। তোমাদের জানা থাকা দরকার, জাগতিক বাদশাহরা তোমাদেরকে স্বর্ণ-মুদ্রা-ধন-সম্পদের লোভ দ্বারা তোমাদের অন্তরকে আসল ধন [ঈমান] থেকে গাফিল করে দিয়েছে। এর দ্বারা তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছো। এ তো শয়তান ছাড়া আর কেউ নয়।

স্মরণ রেখো! উক্ত লালসার বদলে শুধুমাত্র বেইজ্জতি ও অস্বস্থি ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ঐ ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হিসেবে বেশি যোগ্য, যে কিনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেতে [লোভের কারণে] লালায়িত।”

তোমরা যদি মনে করো, দুনিয়ার মানুষ তেমোদেরকে অনেককিছু দিয়ে দেবে যার দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে, তাহলে তোমরা তাক্বীর বাগান সম্পর্কে অবগত হও নি। এটা হৃদয়ের মাঝে হচ্ছে শয়তানের কানকথা [ওয়াসওয়াসা]। বাস্তবে তোমরা আল্লাহর বান্দাহ হও নি। বরং তোমরা হয়েছো আকাঙ্ক্ষার গোলাম ও শয়তানের সাহায্যকারী!

অর্থ-বিত্তের প্রতি ভালোবাসাকে বিসর্জন দাও। নিজেকে এ দুনিয়ার জেলখানা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হও। যদি এটা চাও তাহলে তোমাদের প্রয়োজন একজন

মুর্শিদের। ... মনে রেখো, এ মুর্শিদে কামিলকে বাহ্যিক চোখে অনুসন্ধান করা হচ্ছে, ভীষণ অন্ধকারে কাউকে দেখার চেষ্টা! তাঁকে খুঁজে দেখো অন্তরের দৃষ্টি দ্বারা। হৃদয়ের ও আত্মার দৃষ্টি দ্বারা। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"[ঈমানহীনতা] বাহ্যিক চক্ষুকে অন্ধ করে না, কিন্তু অন্ধ করে দেয় হৃদয়কে যার অবস্থান বুকের মধ্যে।"[৯৬]

লোভের কারণে দুনিয়াপ্রাপ্তির চেষ্টার উপমা হচ্ছে এই: কেউ একজন ঘাস ক্রয় করলো স্বর্ণের বিনিময়ে। এরূপ ক্ষেত্রে ঘাস তো শীঘ্রই জ্বলে-পুড়ে ছাই হবে ও অস্তিত্ব হারাবে। অথচ যে স্বর্ণ তার ছিলো, তা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলো।

তোমার ঈমান যদি দুর্বল হয়, তাহলে অবশ্যই তুমি দুনিয়া পেতে সচেষ্ট হবে। তোমার উচিত হবে ঈমানকে দৃঢ় করতে সচেষ্ট হওয়া, এতে করে তুমি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের দরোজা লাভ করবে। তুমি তখন দেখবে, তোমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেছে। তুমি তা বুঝতেই পারবে না। মানুষের সংসর্গ থেকে যখন তুমি দূরে থাকবে তখন অনুভব করবে যে, নিজের জীবনকে সহজেই 'মালিকুল মাউথ' এর হাতে তুলে দিতে আনন্দবোধ করছো। চিরন্তন জীবনের প্রতি ধাবমান হতে তোমার মনে আগ্রহ জন্মাবে।

এখন তোমার দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনা ও বস্তুভিত্তিক সুখ-শান্তি আত্মাকে আর প্রভাবিত ও ব্যতিচার করবে না। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "বস্তুতান্ত্রিক এ দুনিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করো।"

হে আল্লাহর বান্দাগণ! দুনিয়ার সকল শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চেষ্টা চালাও। মহান দয়ালু আল্লাহর সাথে নিজেদেরকে শক্ত দড়ি দ্বারা বেঁধে দাও। এটাই তোমাদের হৃদয়ের জাহাজকে ক্রমান্বয়ে প্রেমের মহাসাগরের মধ্যে ভাসিয়ে নেবে। সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান মহান আল্লাহ তা'আলা। তিনি সব জনেন, সব দেখেন। সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার পূর্বে নিজের ক্বলবকে পরিশুদ্ধ করতে তাঁকে আকুতি-মিনতি জানাও। ঈমান ও মা'রিফাত লাভের জন্য আবদার

---

[৯৬] সূরা হিজর: ৪৬।

করো। ইলম অর্জনের জন্য বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করো। প্রার্থনা করো তাঁর নিকট হৃদয়কে ধারণক্ষমতাসম্পন্ন করে দিতে। হৃদয়কে নূরান্বিত করে দিতে। আবদার জানাও তাঁর দরবাবে, হে প্রভু! আপনার প্রেম ও করুণা আমার প্রতি বর্ষণ করুন।

... হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা যদি কালিমা শাহাতদের বাক্যটি শুধুমাত্র জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করে থাকো এবং এর মর্মার্থ আমলে পরিণত না করো, তাহলে তোমরা তো সৃষ্টিকর্তার দিকে একটিও পদক্ষেপ নিলে না। আল্লাহর দিকে ভ্রমণের বাস্তবতা নির্ভর করে হৃদয়ের শক্তি ও গতির ওপর। হাক্বিক্বাতের নৈকট্য হচ্ছে হৃদয়ের নৈকট্য। হাক্বিক্বাতের মধ্যে উত্তম আমলসমূহ হচ্ছে সেগুলো যার মধ্যে আছে আত্মা। অন্যকথায়, সত্যিকার আন্তরিকতা [ইখলাস]। আর কোনো আমলই সঠিক ও ফলপ্রসু নয়, যদি না তা শরীয়তের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে। আল্লাহর ওলিরা হচ্ছেন তোমাদের জন্য সত্যের মাপকাঠি। নিজেদেরকে কখনো মাপকাঠি বানাবে না। কারণ এর দ্বারা কখনও সফলকাম হবে না। যে কোনো আমল যদি স্বীয় ‘পরহেজগারী’ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয়- তাহলে এটা সত্যিকার ভালো আমল নয়। সত্যিকার আমল পালিত হয় গোপনে। শুধুমাত্র ফরয আমল প্রকাশ্যে হবে- কারণ, এর জন্য অন্য কোনো পথ নেই। আমল নির্ভর করে তাওহিদ [ঈমান] ও আন্তরিকতার [ইখলাস] ওপর। এতে কমতি থাকার অর্থ হচ্ছে, ভিত্তি ছাড়া ইমারত তৈরির মতো। শীঘ্রই এটি ধ্বসে পড়বে মাটিতে। প্রথমে এই ভিত্তিকে মজবুত করে তৈরি করো। এরপর বিরাট ইমারত বানানো হবে ফলপ্রসু ও শক্তিশালী।

যদি আল্লাহর মর্জি হয়, এরূপ শক্ত ইমারত কখনো ধ্বসে পড়বে না। কারণ তার শক্তির উৎস হচ্ছে ভিত্তিমূলে। আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমে তোমার আমলসমূহ আত্মার আকাশে নূরান্বিত হয়ে ওঠবে। যেমন পূর্ণিমার চাঁদ। আলো দেবে সূর্যের মতো।”[৯৭]

বয়ানের নিয়ম-কানুন

শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ সপ্তাহে তিনবার মাত্র বয়ান পেশ করতেন। তিনি বুধবার সন্ধ্যায়, শুক্রবার জুমু’আর সময় এবং রোববার সকালে শ্রোতাদেরকে ইলমে শরীয়ত ও তাসাওউফের ওপর মহামূল্যবান বয়ান দ্বারা

[৯৭] শায়খ ইমাম আবুল হাসান আলী শাত্বনুফী শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ‘বাহযাতুল আসরার’ গ্রন্থ দ্রঃ।

উপকৃত করতেন। এই মুবারক ও মূল্যবান কাজটি তিনি ৫২১ থেকে ৫৬১ হিজরি পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর অব্যাহত রাখেন। প্রাথমিক দিনগুলোতে তাঁর বয়ান শুরু হয়েছিল হযরতের উস্তাদ ও মুর্শিদ হযরত আবু সাঈদ মুখাররিমী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘বাবুল আযাজ’ নামক মাদরাসায়।

এরপর শ্রোতাদের উপস্থিতি এতোই বেড়ে যায় যে, হযরতের মিম্বর বাগদাদের ঈদগাহ মাঠে নিয়ে যেতে হলো। সেখানে ৭০ হাজার মানুষ একসঙ্গে বসে তাঁর ওয়াজ শুনতে থাকেন। প্রত্যেক ওয়াজ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য নিযুক্ত থাকতেন অনেক অনুলেখক। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সুললিত কণ্ঠে ও পূর্ণ তাজবিদের সাথে তিলাওয়াতের জন্য নিযুক্ত ছিলেন বাগদাদের একাধিক বিশিষ্ট ক্বারী। হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর এসব বয়ান এতোই বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে, তখনকার মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোকজন বাগদাদে একত্রিত হন ওয়াজ শ্রবণের জন্য। বাগদাদ হয়ে ওঠে মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে যা হযরত জুনাইদ বাগদাদী ও তাঁর পূর্বের যুগ থেকে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

বয়ানের প্রতিক্রিয়া

হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহর ওয়াজের প্রতিক্রিয়া ছিলো অত্যাশ্চর্য। প্রায়ই শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে আধ্যাত্মিক হালের কারণে একেবারে পাগলপ্রায় হয়ে যেতেন। দেখা যেতো তারা পরনের বস্ত্রাদি পর্যন্ত ছিড়ে ফেলছেন। অন্যরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। কোনো কোনো সময় আল্লাহর প্রেম ও রাসূলের মুহাব্বতের বয়ান শুনে কেউ কেউ এতোই প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন যে, তারের প্রাণবায়ু সেখানেই বেরিয়ে গেছে!

সময় সময় তাঁর কথা শ্রবণ করতে অমুসলিমদের আগমন ঘটতো সভাস্থলে। শরীয়ত ও তরিকতের ওপর হযরতের মুখ থেকে মনোমুগ্ধকর হাক্বিক্বাতের বয়ান শুনে তারা এতোই প্রভাবিত হয়েছেন যে, অনেকেই তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। কথিত আছে, গউসুল আজম আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওয়াজ মাহফিলে সাধারণ মানুষ ছাড়াও অনেক জিন ও রিজাউল গায়েব ব্যক্তিদের উপস্থিতি থাকতো। অবশ্য, এদের উপস্থিতির ব্যাপারে মানুষ গাফিল ছিলো, তবে হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ ঠিকই জানতেন। এ ব্যাপারে একটি বর্ণনা নিচে তুলে ধরছি।

হযরত আবুল হাসান আলী শাত্বনুফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী আবদুল্লাহ আবহারী- তিনি আবু যাকারিয়া বাগদাদী থেকে, তাঁকে তাঁর পিতা বলেন, “আমি একবার জিনদেরকে আযিমাত [আমল] সহকারে আহ্বান করলাম। তারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দেরি করলো। এরপর আমার নিকট এসে বললো, ‘যখন শায়খ আবদুল ক্বাদির ওয়াজ করেন তখন আমাদেরকে ডাকবেন না।’ আমি বললাম, ‘কেনো?’ তারা বললো, ‘আমরা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হই।’ আমি বললাম, ‘তোমরাও কী যাও?’ বললো, ‘হ্যাঁ। তাঁর মজলিসে মানুষের চেয়ে আমাদের ভিড় বেশি হয়। আমাদের মধ্যে অনেক গোত্র আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর হাতে তাওবাহ করেছে [মুরিদ হয়েছে]।”[৯৮]

আসমান থেকে আল-খেল্লা অবতীর্ণ হওয়া

হযরত আবু হাফস ওমর ইবনে খলিল ত্বিবী বর্ণনা করেন, “শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ একদিন আমাকে বললেন, “হে ওমর! আমার মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কেননা, এতে আল-খেল্লা [বিশেষ গায়েবি পোশাক] বণ্টন করা হয়। তার জন্য আফসোস! যে এটা হাতছাড়া করে ফেলে।” শায়খ আবু হাফস বলেন, এরপর দীর্ঘ একযুগ অতিবাহিত হলো। আমি একদিন মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। কিছুটা তন্দ্রা আসলে পরে দেখতে পেলাম, আসমান থেকে অনেক লাল-সবুজ ‘খিলআহ’ [আল-খেল্লা] অবতীর্ণ হচ্ছে। এগুলো মজলিসে উপস্থিত কিছু লোকদের ওপর পতিত হলো। আমার চোখ খুলে গেলো। আমি লোকদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করতে লাফ দিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু বক্তা শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ আমাকে ডেকে বললেন, “হে বৎস! চুপ থাকো! কারণ, সংবাদ চাক্ষুষ দেখার মতো হয় না!”[৯৯]

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর আরেকটি ওয়াজ

পাঠকদেরকে এবার হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহর আরেকটি বয়ানের সারাংশ উপহার দিচ্ছি। তিনি এটি ৫৪৫ হিজরির শাওয়াল মাসের ১৯ তারিখ প্রদান করেন।

---

[৯৮] ‘বাহজাতুল আসরার ও মা’দিনুল আনওয়ার’ [বঙ্গানুবাদ], পৃ. ৩২৮-৩২৯।

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আমল প্রদর্শনে অভ্যস্ত, তার বাহ্যিক রূপ বেশ ভালো হতে পারে। কিন্তু তার হৃদয় কলুষিত। যা হালাল ও গ্রহণীয় তা থেকেও সে পরহেজ করে এবং ধর্মকে আর্থিক স্বচ্ছতা অর্জনে ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে থাকে তার আসল রূপ। কিন্তু কিছু লোক আছেন যারা তার আসল চেহারা কী তা বুঝেন ও জানেন।

তার এসব পরহেজগারী ভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়। তার অভ্যন্তরীণ নফস দূষিত ও অপবিত্র। এটা সত্যিই দুঃখজনক যদি তোমরা বুঝতে সক্ষম হও না যে, সত্যিকার আল্লাহর আনুগত্য আসে হৃদয় থেকে- কারো দৈহিক 'আপন' থেকে নয়। যতো উত্তম আমল আছে তা সবই আসে হৃদয়ের গভীর থেকে। তোমাদের সত্যিকার আমলগুলো সেখান থেকেই উত্থিত হোক। কোনো ভণ্ডামি তোমাদেরকে ছুঁতে দেবে না।

মিথ্যা ও আন্তরিকতাহীনতাকে অন্তর থেকে মুছে ফেলো। মুনাফিকী ও লোক-দেখানো অবস্থা থেকে তোমরা মুক্ত হও। জাহান্নামের লেবাস পরিত্যাগ করে জান্নাতের লেবাস পরো। জান্নাতের লেবাস হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে একটি উপহার।

মানুষকে খুশি করতে কিছুই করো না- এ আশায় যে, তারা তোমাকে বাহবা দেবে। এতে তুমি হয়ে ওঠবে উদ্ধত [পয়দা হবে গরিমা]। এটা পরিত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হও। তোমাকে তিনি নিজের করে নেবেন এবং তুমি হবে তাঁর।

... এখন, তুমি কোন উদারতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী হতে চাও? তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তি থেকেও কী উত্তম আর কিছু হতে পারে? যিনি তোমাকে দুঃখ-বেদনার সময় সান্ত্বনা দেবেন, রোগ থেকে শিফা দেবেন এবং যাকিছু প্রয়োজন তার যোগাড় দেবেন। যে মুহূর্তে তুমি নিজেকে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবে, সমগ্র জগতের মানুষ মিলেও তোমার কেনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি যদি তোমাকে তাঁর বন্ধুজনে পরিণত করেন, তাহলে জাগতিক সকল যুদ্ধে তুমি জয়ী হবে। যে কেউ অন্য সব [আকাঙ্ক্ষার] অগ্নি নিভিয়ে নিজের ক্বলব আল্লাহর ইশকের আগুনে প্রজ্বলিত করেছে, সে-ই সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনে ধন্য হয়েছে।

এ ব্যক্তিই তার সর্বশেষ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুয়েছে। প্রাপ্ত হয়েছে চিরন্তন মুক্তি। সে জগতে আসার সত্যিকার গোপন রহস্য কী তা বুঝতে পেরেছে। সে বুঝতে পেরেছে ইহলোকে আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও এখান থেকে সফলতা লাভের চাবি কী? সে জানে 'মৃত্যুর পূর্বে মুত্যু' কথাটির অর্থ কী। এর অর্থ হলো, তোমার নফসকে হত্যা করো, তোমার শাহওয়াতী আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করো, তোমার জন্য শয়তান নিহত হয়ে যাক!

এ ধরনের মৃত্যু সত্যিই একক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দৈহিক মৃত্যু যা থেকে কেউ রেহাই পাবে না, তা আমরা জানি। কিন্তু উক্ত মৃত্যু [মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু] কী, তা অল্পজনই বুঝেন।

হে লোকসকল! আমার কথার প্রতি খিয়াল করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ডাক দিচ্ছি না। মুনাফিকরা আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় না। বরং তারা নিজের নফসের দিকে আহ্বান করে। তারা হচ্ছে এ দুনিয়ার ভিক্ষুক।

হে অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত মানুষ! তোমরা আল্লাহর ওলিদের উপদেশ শ্রবণ করে অস্বস্থিবোধ করছো। কারণ, তোমরা চাওনা তোমাদের প্রভুর ভালোবাসায় নিজেদেরকে খিলওয়াত অবলম্বনে জড়িয়ে দিতে। তোমাদের ইচ্ছে হচ্ছে মূর্তিঘরে যেতে! এতে তোমরা শরীয়তের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত হতে চাও। কিন্তু এটা তো তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। তোমাদের প্রতি আমার হৃদয়-ছোঁয়া উপদেশ হলো, তোমরা ওলিআল্লাহদের সুহবত অবলম্বন করো। তোমাদের গলে ঝুলন্ত পাপের দড়ি ছিলে ফেলো। তোমাদের মুর্শিদে কামিলের নির্দেশনাবলীর ওপর দৃঢ় থাকো। এরই মাধ্যমে তোমরা উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত হবে এবং হ্যাঁ, তোমাদের মাধ্যমে ওদের অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হবে- যারা তোমাদের সংস্পর্শে আসবে। যে কেউ পরহেজগারী ও খোদাভীতির কথা মুখে বলে বেড়ায় অথচ তার নিজের মধ্যে এগুলো অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে হচ্ছে বাহ্যিক মুসলিম। অভ্যন্তরে সে মুসলিম হওয়া থেকে দূরে। বাহ্যিকভাবে সে একজন মাওয়াহিদ [তৌহিদবাদী] কিন্তু ভেতরে সে মুশরিক। একজন সত্যিকার ঈমানদার তার অভ্যন্তরের নফসকে পরিশুদ্ধ

করতে সদা-উদগ্রিব। ঠিক একজন বুদ্ধিমান রাজমিস্ত্রি যেভাবে প্রথমে ঘর তৈরি করে শক্ত করে। তারপর সুন্দর সুন্দর দরোজা, জানালা এতে যুক্ত করে চিত্তাকর্ষক করে তুলে।"[১০০]

দৈনিক আমল

বাগদাদের ঈদগাহ মাঠে নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত প্রদান ছাড়াও হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বাবুল আযাজ মাদরাসায় পাঠদান করতেন। তাফসির, হাদিস, উসূলে হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি শরীয়তের উচ্চতর বিষয়ে তিনি জ্ঞানগর্ব আলোচনা করতেন শিক্ষার্থীদের সম্মুখে। তাঁর পাঠদান চলতো প্রত্যহ সকাল ও যুহরের পূর্ব পর্যন্ত। বাদ-যুহর তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র থেকে প্রেরিত শরয়ী প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতেন। প্রত্যেকদিন বাদ-আছর হযরত রাহিমাহুল্লাহ গরীবদের মধ্যে রুটি বণ্টন করতেন। মাগরিবের নামায শেষে তাঁর অভ্যেস ছিলো রাতের খাবার গ্রহণ করা। এসময় তিনি আশপাশের সবাইকে তাঁর সাথে আহার করতে দাওয়াত দিতেন। তিনি বছরের অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন। ইশার নামাযের পর সকল ওলিআল্লাহদের মতো তিনি শয়ন কক্ষে চলে যেতেন। এরপর গভীর ধ্যান-মুরাক্বাবা ও জিকরুল্লাহর মধ্যে রাতের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিতেন। অবশ্য, অবশ্য তাহাজ্জুদের নামায কখনও ছুটতো না।

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর কারামত

গউসুল আজম হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর অধিকাংশ কারামত সঠিকভাবে প্রমাণিত। তাঁর কারামতের সংখ্যা বর্ণনা করে শেষ করার মতো নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইয়াফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হযরতের কারামত অসংখ্য। তাঁর থেকে যে পরিমাণ কারামত প্রকাশ পেয়েছে, তা অন্য কারোর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় নি।" পাঠকদের মনের খোরাক হিসেবে নির্ভরযোগ্য সূত্র[১০১] থেকে নিচে কয়েকটির বর্ণনা তুলে ধরছি।

[১০০] সূত্র: sufiwiki.com

[১০১] এ সূত্রগুলো হচ্ছে: ১. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'গাউছুল আযম'। ২. ইমাম আবুল হাসান আলী শাত্বনূফী শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ রচিত, 'বাহযাতুল আসরার', ৩. শায়খ মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া তাদিফী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'ক্বাওয়াইডুল জাওয়াহির' ইত্যাদি প্রামাণ্য গ্রন্থাদি।

১. আবদাল ও ফিরিশতাদের মধ্যে কথোপকথন: হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জিলানে থাকতে একদিন আমার পাশ দিয়ে একব্যক্তি গমন করলেন যাকে আমি কখনও ইতোপূর্বে দেখি নি। কিছু ফিরিশতা আকাশ থেকে নেমে এসেছেন দেখলাম। তাঁরা ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, 'তিনি হচ্ছেন আল্লাহর ওলি।' লোকটি আসমানের ফিরিশতাদের প্রশ্ন করলেন, 'এ ছেলেটি কে?' তাঁরা জবাব দিলেন, 'একে বড়ো মর্তবা দেওয়া হবে।' চল্লিশ বছর পর জানতে পেরেছি যে, উক্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন আবদাল।"

২. যুবক কর্তৃক মাসের খবর প্রদান: হযরতের সাহেবজাদা শায়খ সাইফুদ্দিন আবদুল ওয়াহহাব বর্ণনা করেন, "একবার শায়খের খিদমাতে কয়েকজন বিশিষ্ট মশাইখে আজম বসা ছিলেন। তারিখটা ছিলো জমাদিউল আখিরের শেষ দিন, ৫৬০ হিজরি। হযরত রাহিমাহুল্লাহ আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একজন সুদর্শন উজ্জ্বল চেহারাসম্পন্ন যুবক কক্ষে প্রবেশ করলেন। সালাম প্রদান করে বললেন, 'আমি মাহে রজব! আপনাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এ মাসে সাধারণ লোকের অনেক উপকার হবে। সবাই সুখে থাকবে।' একথা বলে তিনি বের হয়ে গেলেন। সত্যিই দেখা গেলো এ বছরের রজব মাসে মানুষের মধ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করছে।

অপর একদিন একই ধরনের মজলিসে এক বিকৃত চোহারার যুবক এসে হাজির হয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম! আমি শা'বান মাস। আমার এ মাসে বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ হবে। খোরাশানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে'। ঠিকই ঐ বছর শা'বান মাসে হিজাযে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খুরাশানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।"

৩. তেরো ব্যক্তির মনের বাসনা পূরণ: একদিন হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর মজলিসে তেরো জন বিশিষ্ট শায়খ বসা ছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত বললেন, "আপনারা আমার নিকট যা ইচ্ছে তা চেয়ে নিন।"

শায়খ মাসউদ আহমদ বিন হারিমী দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আত্মপ্রচেষ্টা ও আত্ম-অধিকার বর্জন কামনা করি।' শায়খ মুহাম্মদ বিন কায়িদ বললেন, 'আমি আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তি কামনা করি।' শায়খ আবুল ক্বাসিম উমর বাজ্জাজ বললেন, 'আমি খোদাভীতি কামনা করি।' শায়খ আবু মুহাম্মদ হাসান ফার্সি বললেন, 'আমাকে

আল্লাহর সাথে সংযুক্তি স্থাপন করে দিন।' শায়খ জামাল আবু ইউসুফ বললেন, 'সময়ের সদ্ব্যবহার আমার কাম্য।' শায়খ আবু হাফস উমর গাজ্জাল বললেন, 'আমার অধিক ইলমের প্রয়োজন।' শায়খ জলিল সরসরী আরয করলেন, 'আমি কামনা করছি, কুতবিয়াতের স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যেনো আমার মৃত্যু হয় না।' শায়খ আবুল বারাকাত হুমামী বললেন, 'আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা আমার কাম্য।' শায়খ আবুল ফতু বললেন, 'আমি চাই কুরআন-হাদিস হিফজ করবো।' শায়খ আবুল খাইর আবদার জানালেন, 'আমি এমন মা'রিফাত কামনা করি, যার দ্বারা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারি।' শায়খ আবু আবদুল্লাহ বিন হায়বতুল্লাহ বললেন, 'আমি মুসাফিরখানার পাহারাদার হতে ইচ্ছা করি।' শায়খ আবুল ক্বাসিম আরয করলেন, 'শায়খ! আমাকে বাবুল আজিজ [মিশরের বাদশা] এর দারোয়ান বানিয়ে দিন।'

হযরত গউসুল আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবার কথা শ্রবণ করার পর খুব গম্ভীর সুরে নিচের আয়াতে করীম পাঠ করলেন:

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ * وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

-"এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই, এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত।" [বনী ইসরাঈল: ২০]

বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম! উক্ত তেরোজন শায়খের প্রত্যেকের বাসনা আল্লাহ তা'আলা পূরণ করে দেন। অবশ্য জলিল সুরসরী রাহিমাহুল্লাহ কুতবিয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হন মাত্র ৭ দিনের জন্য। এরপর তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪. দর্শনের জ্ঞান বিলুপ্তকরণ: হযরত আবুল মুজাফফর মনসুর বিন মুবারক ওয়াসিতী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "যৌবনকালে আমি একদিন হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হই। আমার হাতে ছিলো গ্রীক দর্শন ও আত্মা বিষয়ক একখানা কিতাব। উপস্থিত একব্যক্তি উপদেশ দিলেন, গউসুল আজম যদি এ বই সম্পর্কে কিছু বলেন তাহলে এটি ঘরের কিনারে রেখে এসো। ঠিকই তিনি আমাকে এ বই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তখন এটি ঘরের এক কিনারে এটি রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে দর্শনের ওপর আমার আকর্ষণ এতো বেশি ছিলো যে, এটি সমূলে বিনষ্ট করতে চাই নি। বইটির অধিকাংশ বিষয় আমার মুখস্ত ছিলো। আমি যখন বিইটি কোণে রাখার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে

চাইলাম তখন পারলাম না- আমি সম্পূর্ণ অবশ হয়ে পড়লাম! আমি নড়তেই পারছিলাম না- যেনো হাত-পা বাঁধা একজন কয়েদী! হযরত শায়খ বললেন, 'এটি আমার হাতে দাও'। এবার অচেতন অবস্থা কেটে গেলো। বইটি তাঁর হাতে হস্তান্তরের পূর্বে একটু খুলে দেখলাম। ইয়া আল্লাহ! সব পাতা শূন্য! লেখা সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। যাক, নির্দেশ মুতাবিক এটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি একেক পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকেন। এরপর বললেন, 'এটা তো হযরত মুহাম্মদ বিন জরিস লিখিত 'ফাযায়িলে কুরআন'!' আমি সম্পূর্ণ অবাক! পুনরায় এটি হাতে নিয়ে দেখি, সত্যিই তিনি যা বলেছেন তা-ই। পবিত্র কুরআনের ফযিলতের ওপর সুন্দর বর্ণনা এতে লিপিবদ্ধ আছে। শুধু একুটু নয়- ইতোমধ্যে উক্ত কিতাব থেকে দর্শনের ওপর যাকিছু মুখস্ত করেছিলাম তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলাম! অনেক চেষ্টা করেও একটিমাত্র বাক্যও স্মরণে আসলো না।"[১০২]

৫. পাখিদের টুকরো টুকরো হওয়ার ঘটনা: মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতাহ হারভী বলেন, "আমি একদিন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর বরকতময় ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে বয়ান পেশ করছিলেন। মানুষ তন্ময় হয়ে তাঁর প্রতিটি কথা শুনছিলেন। এরপর কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে একদল অদ্ভুত পাখি মজলিসের উপরে আকাশের মধ্যে চক্কর দিতে লাগলো। এতে মানুষ হযরতের বয়ান থেকে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে উপরের দিকে তাকাতে থাকে। হযরত তখন বললেন, "মা'বূদের মহাসম্মানের শপথ! যদি আমি চাই এবং ওই পাখির উদ্দেশ্যে বলি, 'তোরা মরে যা এবং টুকরো টুকরো হয়ে যা!', তাহলে তৎক্ষণাৎ এগুলো আল্লাহর হুকুমে মরে টুকরো টুকরো হবে।' হযরতের কথা শেষ না হতেই দেখা গেলো সব পাখি মরে টুকরো টুকরো হয়ে আকাশ থেকে মসলিজের উপর পড়ে গেলো।"

৬. শায়খ মারুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর কবর থেকে আওয়াজ: হযরত আবুল হাসান আলী ইবনে হায়তী যারিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ [৫৬৩ হিজরি সনে] বলেন, "আমি শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে হযরত মারুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর কবর জিয়ারত করেছি। তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন: "আসসালামু আলাইকা ইয়া শাইখ মা'রুফ আ'বার লানা বাদারযাহ" - হে শায়খ মা'রুফ!

[১০২] কারামতের উক্ত ১, ২, ৩ ও ৪ নং ঘটনার সূত্র শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'গাউছুল আযম' কিতাবটি।

আপনাকে সালাম। আপনি আমাদের চেয়ে আরো এক স্তর আগে চলে গেছেন।” কিছুদিন পর দ্বিতীয়বার তিনি হযরত মা’রুফ রাহিমাহুল্লাহর কবর জিয়ারত করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এবার তিনি বললেন, “হে শায়খ মা’রুফ! আপনাকে সালাম। এখন আমরা আপনার চেয়ে দু’স্তর উপরে চলে গেছি।” সাথে সাথে কবর থেকে আওয়াজ হলো: ‘ওয়া আ’লাইকাসসালামু ইয়া সাইয়্যিদ আহলে জামান!’ - আপনার উপরও সালাম হে যুগের সরদার!’”

৭. দিনারের থলে রক্ত: শায়খ আবুল আব্বাস ইয়াহইয়া মুসেলী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, “আমার পিতা বলেন, আমরা একরাতে বাগদাদে স্থাপিত শাইখী হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহর মাদরাসায় ছিলাম। তখন হযরতের দরবারে উপস্থিত হলেন আব্বাসী খলিফা আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ। তিনি হযরতকে সালাম জানালেন। নসিহত প্রদান করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর সম্মুখে দশটি দিনার ভর্তি থলে রাখলেন। দশজন খাদিম এগুলো বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। হযরত শায়খ বললেন, “আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।” খলিফা এগুলো গ্রহণ করার জন্য হযরতের নিকট বারবার আবদার জানালেন।

হযরত শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এক পর্যায়ে একটি থলে ডান হাতে ও আরেকটি বামহাতে নিলেন। দুটোকে হাতের মুষ্ঠির ভেতর মোচড়াতে লাগলেন। কী আশ্চর্য! দেখা গেলো উভয়টি থেকে টাটকা রক্ত ঝরে পড়ছে। হযরত রাহিমাহুল্লাহ খলিফাকে বললেন, “হে আবুল মুজাফফর! তোমার কী আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ হয় না? জনগণের রক্ত আমার সামনে আনতে ভয় লাগে না?” খলিফা এ কথাগুলো শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। শায়খ বললেন, “মা’বূদ আল্লাহর ইজ্জতের কসম! যদি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকতো, তাহলে আমি এ রক্তকে এভাবে প্রবাহিত করতাম যে, এতে তাঁর প্রসাদ পর্যন্ত ডুবে যেতো।”

৮. শায়খ কর্তৃক আবদাল নিয়োগ: শায়খ আবুল হাসান তানতানাহ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, “আমি শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে থাকতাম। রাতের বেলা হযরতের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে ঘুমোতাম না। হিজরি ৫৩৩ সনের সফর মাসের একরাতে হযরত স্বীয় কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বদনা দিতে চাইলাম। তিনি তা নিলেন না। এরপর মাদরাসার মূল ফটকের সামনে

আসলেন। এমনিতেই এটি খুলে গেলো। তিনি বের হলেন। আমিও চুপি চুপি তাঁর পেছনে চলতে থাকি। বাগদাদের মূল ফটকের সামনে যেতেই এটি তাঁর জন্য খুলে গেলো। আমি তাঁর পিছনে চলতে থাকি। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হলেন। সুবহানাল্লাহ! আমি কী দেখছি! আমরা এমন একটি শহরে এসেছি যা আমি ইতোপূর্বে কখনও দেখি নি। তিনি একটি কক্ষে ঢুকলেন। আমি চুপি চুপি একটি স্তম্ভের পেছনে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে সব দেখছিলাম। কক্ষটি ছিলো সরাইখানার মতো। সেখানে উপস্থিত আছেন ছয় ব্যক্তি। সবাই তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে শায়খকে সালাম জানালেন।

কক্ষের এক কোণ থেকে কান্নার আওয়াজ শুনা গেলো। কিছুক্ষণ পরই কিন্তু কান্নার শব্দ বন্ধ হলো। একব্যক্তি উঠে ঐ কোণের দিকে চলে গিয়ে একটি লাশ কাঁধে বহন করে নিয়ে আসলেন। অপর এক ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করলেন- যার মুখে লম্বা গোফ ও দাড়ি। তিনি শায়খের সম্মুখে বসলেন। শায়খ তাঁকে কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করালেন। তাঁর মাথা ও গোফ কর্তন করা হলো। মাথায় টুপি পরিয়ে শায়খ তাঁর নাম রাখলেন, মুহাম্মদ। এবার শায়খ সবার উদ্দেশ্যে বললেন, “আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একে ঐ মরহুম ব্যক্তির পবিতর্তে আবদাল নিয়োগ করা।” তাঁরা সবাই বললেন, “খুবই ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। আমরাও এতে রাজি।”

হযরত শায়খ রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদে ফিরে আসলেন। আমিও আসলাম। পরদিন ভোরে অভ্যেস অনুযায়ী হযরতের সামনে বসে পড়তে বসলাম। তবে আমি ভয় পাচ্ছিলাম- গতরাতের ব্যাপারে। তিনি বললেন, “বেটা! পড়ো কোনো অসুবিধা নেই।” আমি তখন সাহস করে সবকিছু খুলে বলার জন্য শায়খকে আবদার জানালাম।

তিনি বললেন, “ঐ শহর ছিলো নিহাওয়ান্দ। আর তুমি যে ছয় ব্যক্তিকে দেখেছো তাঁরা হচ্ছেন ‘আবদাল’ ও ‘নুজাবা’ পদে অধিষ্ঠিত ওলিআল্লাহ। যিনি সেখানে ইন্তিকাল করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সপ্তম আবদাল। যিনি তাঁর লাশ কাঁধে করে বেরিয়ে যান তিনি হচ্ছেন আবুল আব্বাস খিজির আলাইহিসসালাম। তিনি ঐ আবদালের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। আর যাকে আমি কালিমা পাঠ করিয়েছিলাম, তিনি ছিলেন কন্সটান্টিনোপলের [বর্তমান ইস্তাম্বুলের] একজন খৃষ্টান। তিনি আমার হাতে মুসলমান হয়ে আবদালের পদে উন্নীত হয়েছেন।” এরপর

শায়খ বললেন, “খবরদার! আমার জীবদ্দশায় এই ঘটনা কারোর নিকট প্রকাশ করবে না।”[১০৩]

৯. খলিফাকে কারামত প্রদর্শন: শায়খ আবুল আব্বাস হুসাইন বর্ণনা করেন, “একদিন আমি শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহর খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, আব্বাসী খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহ তাঁর দরবারে আসলেন। আবদার জানালেন, হুজুর! আমাকে একটি কারামত দেখান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কী চান, বলুন?” খলিফা বললেন, আমার আপেল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সময় বাগদাদে আপেল পাওয়া যেতো না। আপেলের মৌসুম ছিলো না। শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ হাত বাড়িয়ে কোত্থেকে দুটি আপেল আনলেন। একটি দিলেন খলিফার হাতে ও অপরটি নিজেই রাখলেন। দেখা গেলো তাঁর হাতের আপেল থেকে মিশক-আম্বরের ঘ্রাণ নির্গত হচ্ছে। অপরদিকে খলিফার হাতের আপেলের ভেতর পোকা! খলিফা প্রশ্ন করলেন, আমার আপেলের ভেতর পোকা থাকার কারণ কী? হযরত বললেন, “জালিমের হাত স্পর্শ করার ফলে আপেলের মধ্যে পোকা এসেছে।””

১০. আবু গালিব ও হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ: একাধিক মাশাইখে আজম নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা করেন, “বাগদাদের এক বিখ্যাত বণিক যার নাম ছিলো আবু গালিব, একবার হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। আরজ করলেন, “ইয়া শায়খ! আপনার দাদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘কেউ কাউকে দাওয়াত করলে কবুল করো।’ আমার গরীবালয়ে আপনার পদধূলি কামনা করছি। হযরত বললেন, “চলুন।”

আমরা আবু গালিবের বাড়িতে যেয়ে দেখি অনেক মাশাইখে আজম বসে আছেন। তাঁরা হযরতের অপেক্ষায় ছিলেন। দস্তারখানে খাবার পরিবেশন করা হলো। হযরতের পাশেই একটি মুখ বন্ধ করা বড় মটকা ছিলো। আবু গালিব বললেন, আসুন, বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করি। হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ খাবারে হাত দিলেন না। তাঁর সম্মানে অন্য কেউও খাবার খেতে অগ্রসর হলেন না। এরপর গউসুল আজম বললেন, “মটকার মুখ খুলো! ভেতরে যে আছে আল্লাহর ওয়াস্তে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে আসো!” দেখা গেলো আবু গালিবের জন্মগত খোঁড়া, অন্ধ ও বোবা ছেলে

---

[১০৩] ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং কারামতের বর্ণনার সূত্র হচ্ছে, ‘আল-বাহযাতুল আসরার’ কিতাবটি।

বেরিয়ে আসছে। সে দৌড়াদৌড়ি ও লাফালাফি করতে লাগলো। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। এ আশ্চর্য কারামত দেখে সবাই নির্বাক হয়ে গেলেন। গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "চলো। হুজরায় ফিরে যেতে হবে।" সুতরাং আবু গালিবের পরিবেশিত খাবারে হাত না দিয়ে ফিরে আসলেন।"

১১. খাদিমকে জিনা থেকে রক্ষা: হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহর একজন খাদিম স্বপ্নে দেখলেন, একে একে সত্তুর জন মহিলার সঙ্গে তিনি সঙ্গম করেছেন। এ অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখে তিনি ভীষণ ভয় পেলেন। ভাবলেন, স্বীয় শায়খের নিকট স্বপ্নের বর্ণনা করবেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে হাজির হতেই হযরত বললেন, "ভয়ের কিছু নয়। আমাকে ইলহামের মাধ্যমে আগেই জানানো হয়েছিলো, তোমার তক্বদিরে লিখা আছে সত্তুর জন মহিলার সঙ্গে জিনা করবে। আমি আল্লাহর দরবারে তোমার জন্য দু'আ করেছি। তিনি দুআ কবুল করেছেন। বাহ্যিকভাবে চরম কবিরা গুনাহ থেকে বাঁচাতে দয়ালু আল্লাহ স্বপ্নযোগে তক্বদিরের ঘটনাগুলো ঘটিয়ে তোমাকে রক্ষা করেছেন।" একথা শুনে খাদিমের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগলো।

১২. ইঁদুরের প্রতি অভিশাপ ও ক্রন্দন: শায়খ মনসুর ওয়াসিতী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ কাগজের মধ্যে কী একটা লিখছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে কিছু ধূলো পড়লো কাগজের ওপর। তিনি তা ঝেড়ে ফেললেন। এরপর আবার পড়লো। এবারও ঝেড়ে ফেললেন। তৃতীয়বার পড়লে পুনরায় ঝেড়ে নিলেন। এরপর চতুর্থবার ধূলো পড়ার পর উপরের দিকে তাকালেন। দেখলেন, একটি ইঁদুর ধূলো ফেলছে। তিনি রাগ করে বললেন, "আল্লাহর হুকুমে তোমার মাথা ছিন্ন হয়ে যাক!" আশ্চর্য! সাথে সাথে মস্তক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইঁদুরটি কক্ষের একপাশে পড়ে গেলো। হযরত খাতা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন। কারণ জানতে চাইলে বললেন, "আমি ভয় করছি, কোনো মুসলাম কর্তৃক এরূপ যন্ত্রণার শিকার হলে তার অবস্থাও যদি এই ইঁদুরের মতো হয়ে যায়, তখন উপায় কী হবে?"[১০৪]

[১০৪] ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং কারামতের সূত্র হচ্ছে, হযরত মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী [মৃ. ১০১৪ হি.] রাহিমাহুল্লাহ রচিত, "নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী মানাকিব-ই শায়খ আবদুল ক্বাদির" [হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কারামত]। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ হয়েছে।

১৩. শায়খ আলী বিন হাইয়িতী রাহিমাহুল্লাহর স্বপ: একদা শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ মিম্বরে বসে নিয়মিত বয়ান করছিলেন। অসংখ্য মানুষ বয়ান শুনছিলেন। হরতের সম্মুখেই বসা ছিলেন, শায়খ আলী বিন হাইয়িতী রাহিমাহুল্লাহ। এক পর্যায়ে তাঁর তন্দ্রা এসে গেলো। শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বয়ান থামিয়ে মিম্বর থেকে নেমে নিদ্রারত শায়খ হাইয়িতীর সম্মুখে এসে খুব আদবের সাথে দাঁড়ালেন। একটু পর হাইয়িতী রাহিমাহুল্লাহর নিদ্রা ভেঙ্গে গেলো। তিনি হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহকে সামনে দেখে চমকে উঠলেন। কেউ কিছু বলার পূর্বেই শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তাঁর সম্মুখে আমি দাঁড়িয়েছি এ কারণে যে, তিনি স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সক্ষাৎ পেয়েছেন। আর আমি সজ্ঞানে হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছিলাম।"

১৪. চোর হয়ে গেলেন আবদাল: এক রাতে হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহর কক্ষে একজন চোর ঢুকলো। কিন্তু তার চোখ অন্ধ হয়ে গেলো। কোনদিকে বেরিয়ে যেতে হবে সে তা খুঁজে পেলো না। অবশেষে এক জায়গায় বসে পড়লো। ভোরবেলা তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হালো হযরতের সম্মুখে। তিনি তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন। এরপর মাথায় হাত রাখলেন। চোখে হাত বুলালেন। চোরের চোখ ভালো হয়ে গেলো। সে কাঁপতে কাঁপতে হযরতের চেহারার দিকে তাকালো। না-জানি কোন শাস্তি হয় তার। কিন্তু হযরত মুচকি হাসি দিলেন। বললেন, "সে এসেছিলো দুনিয়াবী ধন চুরি করতে। আমি তাঁকে এমন ধন-ভাণ্ডার দান করবো যা তাঁর সঙ্গে চিরকাল থাকবে।" একথা বলে চোরের দিকে তাকিয়ে তাওয়াজ্জুহ দিলেন। চোর তখন ওলি হয়ে গেলেন। একই সময় একজন আবদালের মৃত্যু হয়। শায়খ এই নতুন ওলিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সেই মৃত আবদালের স্থানে অধিষ্ঠিত করলেন।

১৫. দুআর বরকত: শায়খ আলী বিন ইদ্রিস ইয়াকুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একদিন আমার মুর্শিদ শায়খ আলী বিন হাইয়িতী রাহিমাহুল্লাহ আমাকে হযরত গউসুল আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে নিয়ে গেলেন। আমার বয়স তখন অল্প। আমি দেখলাম তাঁর গায়ে তখন একখানা চাদর শোভা পাচ্ছে। তিনি চাদরখানা খুলে আমার মাথা আবৃত করলেন। এরপর বললেন, 'আমি দুআ করছি, এখন থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সকলপ্রকার রোগ থেকে মুক্ত রাখবেন।' ঐদিন পর থেকে সত্যিই আমি কখনো রোগাক্রান্ত হই নি। এখন আমার বয়স ৬৫ বছর হয়েছে।"

মহামূল্যবান বাণী

১. "হে প্রশান্ত আত্মা! আল্লাহর দিকে রুজু হও সন্তুষ্টচিত্তে।"

২. "মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই সতর্ক হও।"

৩. "তোমার হৃদয় যখন পরিশুদ্ধ হবে, তোমার সকল অবস্থাও পরিশুদ্ধ হবে।"

৪. "উত্তম ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হন এবং দুনিয়াকে জয় করেন খোদাভীতি ও পরহেজগারীর মাধ্যমে।"

৫. "তাক্বদিরে প্রতি আমার সন্তুষ্টি আমাকে প্রভু পর্যন্ত পৌঁছুয়ে দিয়েছে।"

৬. "পরহেজগারীকে তোমার অস্ত্রে পরিণত করো, তাওহিদকে পরিণত করো ধ্যানে। পরহেজগারী এবং একাগ্রতায় ইখলাস অবলম্বন ও আল্লাহর প্রতি আবদার- হয়ে যাক তোমার সৈন্যদল।"

৭. "যখন তুমি পরিপক্কতা লাভ করবে, নিযুক্ত করো নফসকে ইহলোকের জন্য, পরকালের জন্য নিযুক্ত করো ক্বলবকে এবং শুধুমাত্র তোমার প্রভুর জন্য নিযুক্ত করো রূহকে।"

৮. "আল্লাভীতি ও তাঁর উপাসনা হোক তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আল্লাহ ছাড়া কাউকে একটুও ভয় করো না। কারো নিকট থেকে কিছু পেতে আশাও করো না। নিজেকে রক্ষা করো। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহকে ভয় করো।"

৯. "ঈমানদারের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনটি জিনিষ অপরিহার্য। ১. আল্লাহর দির্নেশনাবলী মান্য করা। ২. হারাম থেকে বেঁচে থাকা। ৩. যাকিছু রিজিক প্রাপ্ত হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।"

১০. "যখন তিনি [আল্লাহ] তোমাকে মৃত্যু দেবেন তোমার ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষা মুতাবিক, তখন তোমাকে [মৃত্যুর পর] বলা হবে, "রাহমাতুল্লাহি আলাইহি"। তিনি [আল্লাহ] তোমাকে একটি নতুন জীবন দান করবেন।"

১১. "তুমি যে অবস্থায় আছো তাতেই সন্তুষ্ট থেকো। অপর কেনো অবস্থার আকাঙ্ক্ষী হবে না- হোক তা উচ্চ কিংবা নিম্ন স্তরের। সুতরাং যখন তুমি বাদশাহর রাজপ্রাসাদের তোরণে পৌঁছুয়ে যাবে, তখন প্রাসাদের ভেতর প্রবেশের জন্য লালায়িত হবে না- যদি না তোমাকে ইচ্ছে করে প্রবেশ কারানো না হয়।"

১২. "সম্পদ হচ্ছে তোমার গোলাম আর তুমি হচ্ছো আল্লাহর গোলাম।"

১৩. “জেনে রেখো, আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রত্যহ নতুনত্ব অর্জন করে। সুতরাং তিনি যখন ইচ্ছে মানুষের স্তরকে নিচে নামান কিংবা উপরে তুলেন।”

১৪. “পরীক্ষা ও বিপর্যয় হৃদয়কে শক্তিশালী ও [ঈমানে] দৃঢ় করে। এতে প্রতিষ্ঠিত হয় ধৈর্যগুণ এবং পশুসূলভ নফস দুর্বল হয়ে যায়।”

১৫. “গোনাহ করা থেকে সতর্ক থাকো। তোমার দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তা, চেতনা সবকিছুকে পাহারায় রাখো।”

১৬. “আল্লাহ থেকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করবে না- কারণ তিনি আগে-পিছে সর্বত্র বিদ্যমান।”

১৭. “তোমরা কী জানো না, প্রত্যেক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে? তোমরা কী জানো না, প্রত্যেক বিপর্যয়ের পূর্ণতাক্ষণ আছে?”

১৮. “তোমাদের পরকালের জীবনকে সঞ্চায়িত অর্থ বানাও এবং ইহকালীন জীবনকে বানাও এর মুনাফা। মত্যৃর পর [উত্তম] জীবন পেতে তোমাদের ইহকালীন জীবনকে নিবেদিত করো।”

১৯. “ভীতি ও আশার সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো আধ্যাত্মিক জীবন বা স্তর নেই। ভীতি ও আশা হচ্ছে পাখির দুটি ডানার মতো। ডানা না থাকলে উড়া সম্ভব ও সঠিক হবে না। এটি প্রত্যেক স্তর ও মাক্বামের ক্ষেত্রে সত্য। তবে স্তর ও মাক্বাম মুতাবিক উভয়টির মাত্রা নির্ধারিত হয়।”

২০. “দুনিয়ার জীবন হচ্ছে চাষাবাদের স্থান। এর মধ্যে যে ফসল হবে তা পাওয়া যাবে আখিরাতের জীবনে। নবী-রাসূল ও আউলিয়ায়ে কিরামের ফসল হচ্ছে ভালো আমল যার সূত্র আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। এতে আছে ধৈর্য ও [ইবাদতের মধ্যে] স্বাদ এবং পরীক্ষার মধ্যে রেজা অবলম্বন।”

২১. প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের [ইসমে সিফাতের] প্রতিফলন। তাঁর প্রত্যেক নামে নিহিত আছে একেকটি ইশারা। সুতরাং তোমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্র নাম ও সিফাতের মাঝখানে আছো। তোমাদের সকল আমল মূলত আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তাঁর ক্ষমতার বিকাশ এবং বাহ্যিক দিক থেকে তাঁরই প্রজ্ঞার প্রতিফলন। তিনি তাঁর গুণাবলী দ্বারা প্রকাশিত এবং গোপন তাঁর সত্তায়। তাঁর সত্তা গোপন আছে তাঁর গুণাবলীর মধ্যে। আর তাঁর গুণাবলী গোপন আছে তাঁর কর্মের মধ্যে। তিনি তাঁর জ্ঞানকে ইচ্ছামাফিক উন্মোচন করেছেন। তাঁর ইচ্ছার বিকাশ ঘটিয়েছেন জগতের গতিশীলতায়। তিনি তাঁর ইচ্ছায় নিজের কর্ম ও

কৌশলকে গোপন রেখেছেন। সুতরাং তিনি গোপন আছেন তাঁর গোপনীয়তায় এবং প্রকাশ আছেন তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতায়। কোনো কিছুই তাঁর মতো নেই, তিনি সর্বত্র, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

২২. "তাসাওউফের মূল আটটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত: (১) হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের মতো উদারতা। (২) হযরত ইসহাক আলাইহিসসালামের মতো আগ্রহান্বিত আত্মসমর্পণ। (৩) হযরত ইয়াকুব আলাইহিসসালামের মতো ধৈর্য। (৪) হযরত জাকারিয়া আলাইহিসসালামের মতো ইবাদত। (৫) হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিসসালামের মতো ফকিরী। (৬) হযরত মূসা আলাইহিসসালামের মতো [মোটা সুতার] পশমের বস্ত্র পরিধান। (৭) হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের মতো ভ্রমণ করা। (৮) হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ধর্মীয় ফকিরী।"

২৩. "দরবেশ তিনি যিনি সবকিছুর ব্যাপারে উদাসীন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।"

২৪. "আমার দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পীড়িত হচ্ছে শুধুমাত্র হৃদযন্ত্র ছাড়া, যার মধ্যে কোনো বেদনা নেই ও এটি সম্পৃক্ত আছে আল্লাহর সঙ্গে।"

২৫. "মানব চেতনায় আছে তিনটি অবস্থা যা আরোহী: (১) নফসে আম্মারা - এটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন পশুসম আকাঙ্ক্ষী উপাদান। (২) নফসে লাউওয়ামা - এটি হচ্ছে সংগ্রামী উপাদান। (৩) নফসে মুতমায়িন্না - এটি হচ্ছে আল্লাহর মা'রিফাত লভাকারী উপাদান।"

২৬. "এমন কিছু ইচ্ছা করো না, যা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।"

হযরতের স্বরচিত গ্রন্থাদি

শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওয়াজের বেশ কটি সংকলন যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। হযরত নিজও কয়েকটি উচ্চাঙ্গের কিতাব রচনা করেছিলেন। এগুলোর অধিকাংশ এখনো প্রাপ্য। নিচে ব্যাখ্যাসহ একটি তালিকা দেওয়া হলো।

১. ফুতুহুল গায়েব [গায়েব উন্মোচন] - এতে সংকলিত হয়েছে ৭৮টি ভাষণ। প্রতিটি ভাষণই তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

২. ফাতহুর রাব্বানী [বিস্ময়কর প্রকাশ] - এতে সংকলিত হয়েছে ৬২টি বক্তৃতা। হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এসব বক্তৃতা বাগদাদের রিবাত ও মাদরাসায় ৫৪৫-৫৪৬ হিজরি সনে প্রদান করেন। পূর্বেরটির তুলনায় প্রতিটি বক্তৃতা অধিক লম্বা ও ব্যাখ্যামূলক।

৩. জালালুল খাওয়াতির [দুশ্চিন্তা থেকে অপসারণ] - এতে সংকলিত হয়েছে ৪৫টি ভাষণ। উক্ত একই স্থানে হযরত রাহিমাহুল্লাহ ৫৪৬ হিজরি সনে প্রদান করেন।

৪. সিররুল আসরার ওয়া মাজহারুল আনওয়ার [গোপন রহস্যের রহস্য ও নূরের প্রকাশ]।

৫. গুনিয়াতুত তালিবীন তারিক্বুল হাক্ব [সত্যের রাস্তার সন্ধানীর জন্য পর্যাস্ত প্রস্তুতি] - পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এ বিরাট গ্রন্থটি হযরত জিলানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এক বিশিষ্ট মুরিদের অনুরোধে রচনা করেছিলেন। এতে ইসলামের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলেচনা হয়েছে।

৬. মালফুজাত [বাণীসমূহ] - এতে সংকলিত হয়েছে হযরত শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহর মূল্যবান বাণীসমূহ। অবশ্য অধিাকংশ বাণী আরবিতে হস্তলিখিত '**ফাতহুর রাব্বানী**' কিতাবের শেষের দিকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. খামছাতা 'আশারা মাকতূবাত [পনেরো পত্র] - হযরত তাঁর এক মুরিদের নিকট ফার্সি ভাষায় ১৫টি পত্র লিখেছিলেন। এ গ্রন্থে ওগুলো সংকলিত হয়েছে।

৮. ফুয়ূজাতুর রাব্বানিয়া [প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত বারাকাত]।

৯. বাশাইরুল খাইরাত [প্রভুর পক্ষ থেকে সুসংবাদের ঊর্মিমালা] - প্রভুপ্রেরণায় শায়খ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত সালাওয়াত।

১০. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব - পরবর্তীতে সংকলিত হযরতের নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্নোত্তর।

১১. বিশেষ ইবাদত পদ্ধতি - হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর শেখানো কিছু দুআর কিতাব।

স্ত্রী-সন্তানাদি

হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ ৫১ বছর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন। হযরতের মোট চার জন স্ত্রী ছিলেন। এরা হচ্ছেন:

১. সায়্যিদা বিবি মাদিয়া (রাহ.)

২. সায়্যিদা বিবি সাদিক্বা (রাহ.)
৩. সায়্যিদা বিবি মু'মিনাহ (রাহ.)
৪. সায়্যিদা বিবি মাহবুবাহ (রাহ.)

হযরতের সন্তানাদির সংখ্যা ৪৯ জন ছিলেন বলে বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এরমধ্যে ২৭ জন পুত্রসন্তান ও ২২ জন কন্যাসন্তান ছিলেন। নিচে ১২ জন বিশিষ্ট পুত্রসন্তানের নাম উল্লেখিত হলো।

১. শায়খ সাইফুদ্দিন আবদুল ওয়াহহাব (রাহ.)
২. শায়খ শরফুদ্দিন আবু মুহাম্মদ ঈসা (রাহ.)
৩. শায়খ হাফিজ আবদুর রাজ্জাক তাজউদ্দিন (রাহ.)
৪. শায়খ আবু বকর আবদুল আজিজ (রাহ.)
৫. শায়খ সিরাজুদ্দিন আবদুল জাব্বার (রাহ.)
৬. শায়খ ইহাহইয়া (রাহ.)
৭. শায়খ মূসা (রাহ')
৮. শায়খ আবুল ফজল মুহাম্মদ (রাহ.)
৯. শায়খ আবু ইসহাক ইব্রাহিম (রাহ.)
১০. শায়খ আবদুল্লাহ (রাহ.)
১১. শায়খ আবদুর রাহমান (রা.)
১২. শায়খ আবু নাসির মূসা (রাহ.)[১০৫]

মৃত্যুকালীন অবস্থা

হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুকালীন অবস্থা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে নিচে বর্ণিত হলো।

হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহর সাহেবজাদা ও তরিকতের খলিফা শায়খ আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যু সায়াহ্নে অসিয়তের জন্য তাঁর কাছে আবদার জালালেন, "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন, "বাবা আবদুল ওয়াহহাব! তোমাদের জন্য তাক্বওয়া অবলম্বন খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয়

---

[১০৫] সূত্র: sufiwiki.com/Abdul_Qadir_Jilani

করবে না। কারো কাছে নিজের হাজত পেশ করবে না। কারো নিকট থেকে কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা করবে না। সব সময় যে কোনো হাজত পূরণের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে আরজ করো। অন্য কারোর প্রতি ভরসা করো না। মনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া কেনো সত্তা নির্ভরযোগ্য নয়। তাওহিদ! তাওহিদ! তাওহিদ! এটার ওপর সমস্ত উম্মাতের ইজমা রয়েছে।"

মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে তিনি আরোও বললেন, "মনকে যখন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করো তখন অন্য কারোর থেকে কিছুই কামনা করবে না। এটাই আমার কথার সারমর্ম।" সকল সন্তানদেরকে ডেকে বললেন, "আমার চৌকির কাছ থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও! বাহ্যিকভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বললেও বাতিনীভাবে আছি অন্যদের সাথে। এখন আমার ও তোমাদের মধ্যে বিরাট দূরত্ব বিদ্যমান। সৃষ্ট জীব ও আমার মধ্যে দূরত্বের মাত্রা এতো বেশি যে, যেনো আসমান-জমিনের তফাৎ। আমাকে অন্যদের সাথে তুলনা করো না। আর অন্যদেরকেও আমার সঙ্গে তুলনা করবে না। তোমরা ছাড়াও আমার নিকট এখন বিশিষ্ট আরো অনেক ব্যক্তি আসছেন। তোমরা তাঁদের জন্য জায়গা খোলামেলা করে দাও। তাঁদের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখো। তাঁরা আল্লাহর রহমত বহনকারী।"

হযরতের আরেক সাহেবজাদা বলেন, "মৃত্যুর সময় হযরতের জবান থেকে প্রায়ই বের হচ্ছিলো, "ওয়াআলাইকুমুস সালাম! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাকে ক্ষমা করুন। আমার ও আপনার তাওবা কবুল করুন। মৃত্যুর ফিরিশতাদের আমি ভয় করছি না। মৃত্যুর ফিরিশতারা তাকেই তালাশ করে- যে ভয় পায়। হে মৃত্যুর ফিরিশতারা! তাঁকে তালাশ করে নিয়ে আসো, যাঁকে আমার জান কবজ করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।" এ কথাগুলো বলেই তিনি স্বরবে 'আল্লাহু আকবার! বললেন এবং পরমুহূর্তেই তাঁর রূহ মালিকুল মাউতের নিকট সোপর্দ করে দিলেন।"[১০৬] ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত গউসুল আজম শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৫৬১ হিজরি সনের ১১ রবিউস সানী এ মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি এ পৃথিবীতে ৯১ বছর জীবিত ছিলেন। এক বর্ণনামতে তাঁর

---

[১০৬] 'কিতাবুল মাজালিস', সূত্র: হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ প্রাণীত 'গাউসুল আজম' কিতাব।

জানাযায় এতো বেশি লোকের আগমন ঘটে যে, হযরতের সাহেবজাদাগণ রাতের বেলা তাঁকে কবরস্থ করতে বাধ্য হন। হে আল্লাহ! যুগের শ্রেষ্ঠ তোমার এই মহান বন্ধুকে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন। তাঁর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। সংরক্ষণ করুন তাঁর গোপনীয়তা ও রহস্যকে।

ইমামুত তরিকত শায়খ হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পর থেকে তরিকার নামকরণ হয় 'ক্বাদিরীয়া'। আমরা হযরতের পরে হক্কানী সিলসিলা সনাক্তকরণে বেশ হিমশিম খেয়েছি। এরপরও যে সিলসিলাটি অধিক উলামায়ে কিরাম ও পীর-মাশাইখ কর্তৃক হক্কানী বলে স্বীকৃত, আমরা সেটির কয়েকজন গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তী ক্বাদিরীয়া তরিকার শায়খদের জীবন ও কর্মের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করি।

গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তী ক্বাদিরিয়া শাজারাহ মুবারক

চিশতিয়া তরিকার বিখ্যাত শাইখুল মাশাইখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বরচিত "জিয়াউল ক্বুলুব" [হৃদয়ের আলো] নামক কিতাবে ক্বাদিরিয়া তরিকার সঙ্গে তাঁর নিসবতের [সিলসিলার] ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন। তিনি দুটি শাজারাহ মুবারক উপস্থাপন করেছেন। আমরা নিচে উভয়টি লিপিবদ্ধ করছি। এ পবিত্র শাজারাহদ্বয়ের যেসব মহাত্মন শাইখুল মাশাইখের জীবন ও কর্মের ওপর নির্ভরযোগ্য জীবনালোচনা পাবো তা-ই পাঠকদের উপহার দেবো। এছাড়া ক্বাদিরিয়া তরিকার অন্যান্য শাইখুল মাশাইখের ওপরও জীবনালোচনার চেষ্টা করবো। আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্যপ্রার্থী।

চিশতিয়া-ক্বাদিরিয়া-কুদ্দুসিয়া তরিকার শাজারাহ মুবারক

শায়খ হযরত গউসুল আজম সাইয়্যিদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সামসুদ্দিন হাদ্দাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত কুতুবুদ্দিন আবুল গায়িছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত আবুল মাকারিম ফাজিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত উবাইদ ইবনে আবুল ক্বাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত উবাইদ ইবনে ঈসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ জালালুদ্দিন বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ বুঢডুন বাহড়ায়িচি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত ইবনে মুহাম্মদ কাসিম আওধি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[১০৭]

---

[১০৭] হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লাহ থেকে হযরত শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত চিশতিয়া-ক্বাদিরিয়া-সাবিরিয়া সিলসিলা হচ্ছে: হযরত শায়খ জালালুদ্দিন জলীল তানেশ্বরী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন বলখী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ আবু সাঈদ আসআদ গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ মুহাম্মদ মক্কী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ আবদুল হাদী আমরুহী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ আবদুল বারী আমরুহী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ আবদুর রহীম রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ - হযরত শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ। মহাত্মন

চিশতিয়া-ক্বাদিরিয়া-রাজ্জাকিয়া তরিকার শাজারাহ মুবারক

শায়খ হযরত গউসুল আজম সাইয়্যিদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ আবদুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সায়্যিদ ইয়াহইয়া জাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত আবদুল ওয়াহহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ আবদুল ক্বাদির রাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ আহমদ কুদসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত মাওলানা মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত আবদুল হক মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ ইলইয়াস মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ কামীসুল আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ শাহ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ মুহাম্মদ গায়িস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত সাইয়্যিদ আবদুল হাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শায়খ হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[১০৮]
শায়খ হযরত হাজী ইমমাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

এসব ওলির জীবন ও সাধনার ওপর বিশদ আলোচনা হয়েছে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে প্রকাশিত "আউলিয়ায়ে চিশত" নামক কিতাবে।

[১০৮] হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহর দুজন মুর্শিদ ছিলেন। তিনি উভয়ের কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। প্রথমজন হচ্ছেন শায়খ আবদুর রহীম রাহিমাহুল্লাহ। তিনি একই সঙ্গে চিশতি, নকশবন্দী-মুজাদ্দিদী শায়খ ছিলেন। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শায়খ সাইয়্যিদ আবদুল হাই রাহিমাহুল্লাহ। তিনি সরাসরি ক্বাদিরিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন। সুতরাং নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ একইসঙ্গে চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া ও ক্বাদিরিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন।

হযরত শায়খ সাইয়্যিদ আবদুর রাজ্জাক বিন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত- ৬০৩ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

তিনি ছিলেন ইমামুত তরিকত গউসুল আজম শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সন্তান এবং তরিকতের খলিফা। তিনি আবু বকর জিলানী নামেও পরিচিত ছিলেন। পিতার অনুসরণে তিনি হাম্বলী মাজহাবপন্থী একজন ফকীহ্ আলিম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

জন্ম ও বংশ

শায়খ আবদুর রাজ্জাক জিলানী রাহিমাহুল্লাহ ৫২৪ হিজরির জিলকদ মাসের ১৮ তারিখ বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হাসাইনী ও হুসাইনী সাইয়্যিদ। সুতরাং পিতার দিক থেকে আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহও সাইয়্যিদ বংশের ছিলেন।

নামকরণ ও শিক্ষা

তাঁর পূর্ণ নাম হলো সুলতানুল ফক্বর আবু বকর তাজউদ্দিন শায়খ সাইয়্যিদ আবদুর রাজ্জাক জিলানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি সমকালীন যুগে বাগদাদের প্রধান মুফতি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

যুগের অন্যান্য আলিমদের মতো তিনি স্বীয় পিতা শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর কাছে শরীয়তের ওপর জ্ঞানার্জন করেন। এছাড়া বাগদাদ ও আশপাশ অঞ্চলের বিভিন্ন মাশাইখে আজমের সুহবতে থেকে তিনি ইলমে শরীয়তের উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। বাগদাদের একজন উচ্চপর্যায়ের মুফতি ও আলিম হওয়ায় উলামায়ে কিরাম তাঁকে 'তাজউদ্দিন' [দ্বীনের মুকুট] উপাধি দেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় জিকির-মুরাক্বাবা ও অন্যান্য নফল ইবাদতের মধ্যে কাটিয়েছেন। পারতপক্ষে মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে থাকতেন। তবে তাঁর অসংখ্য মুরিদ ও ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাদের সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে মেলামেশা করতেন ও উপদেশ দিতেন।

হাফিজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হযরত আবদুর রাজ্জাক ছিলেন একজন উচ্চপর্যায়ের ওলি, শায়খ ও পরহেজগার ব্যক্তি। হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর সন্তানাদির মধ্যে তাঁর মতো বড়ো আলিম ও শায়খ আর কেউ ছিলেন না। তিনি দুনিয়াবী সম্পদ লাভ, উচ্চ সামাজিক অবস্থান কিংবা উচ্চপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নি। দুনিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ খুব সীমিত ছিলো। আখিরাতমূখিতা ছিলো তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি হাদিস শ্রবণ করেছেন, শিখেছেন ও অপরদের শিক্ষা দিয়েছেন।"[১০৯]

একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা

হযরত শায়খ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহর পিতা গউসুল আজম আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ একদিন অসংখ্য শ্রোতাদের সম্মুখে ওয়াজ করছিলেন। আকাশের মধ্যে অনেক অজানা-অচেনা অদ্ভুত প্রাণী উড়াউড়ি- করছিলেন। শ্রোতাদের কেউ এদের দেখেন নি। কিন্তু শায়খ আবদুর রাজ্জাক আকাশের দিকে তাকিয়ে এদের দেখতে পেলেন। এসময় তিনি স্বীয় পিতার আসনের পাশেই বসা ছিলেন। আকাশের প্রাণীদের দেখে তিনি ভয় পেলেন। হযরত গউসুল আজম পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমার আদুরে পুত্র! ভয় পেয়ো না। তুমিও এদের অন্তর্ভূক্ত!"

ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত আরেকজন শায়খ ছিলেন যার নাম আবু জুরা'আ বিন মুক্বাদ্দাস দারী। তিনি বলেন, "আমি শুনলাম হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, 'আজ কিছু লোক এ মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন, যারা 'ক্বা'ফ কুদুস' পর্বতের অপর প্রান্তে বসবাস করেন। তাঁরা পদার্পণ করেছেন আকাশে। তাঁদের মাথায় আল্লাহপ্রেমের মুকুট শোভা পাচ্ছে। তাঁদের পরনে আছে মা'রিফাতের জুব্বা। তাঁদের অন্তর প্রজ্বলিত আছে ইশকে ইলাহির তাজাল্লিতে।'"

স্বীয় পিতার কাছে উপবিষ্ট শায়খ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ উক্ত কথাগুলো শুনলেন। তিনি মাথা তুলে আকাশের দিক পুনরায় তাকালেন। অনুভব করলেন, মুহূর্তেই তাঁর পাগড়ি ও জুব্বায় ইশকে ইলাহির অগ্নি জ্বলে ওঠেছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন।

---

[১০৯] ইবনে কাছির- "আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া"।

হাত দ্বারা পুত্রের মাথা ও জুব্বা বুলিয়ে দিলেন। বললেন, "হে আমার পুত্র আবদুর রাজ্জাক! তুমি এখন তাঁদেরই একজন।"

হযরত আবু জুরা'আ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বয়ান শেষে আমি শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছিল আজ? তিনি জবাব দিলেন, 'আবদুর রাজ্জাক যখন আকাশের দিকে তাকালো তখন সে দেখলো, অসংখ্য মানুষ উড়াউড়ি করছেন। তাঁদের পাগড়ি ও জুব্বা ইশকে ইলাহির তাজাল্লির মাধ্যমে প্রজ্বলিত আছে। তাঁরা আকাশে নেচে নেচে ছক্কর দিচ্ছিলেন। মেঘমালায় যেরূপ বিজলির কারণে গর্জন হয় সেরূপ তাঁদের মধ্য থেকে ইশকের যন্ত্রণায় আওয়াজ হচ্ছিল বিরহ-গর্জন। এদেরকে দেখে আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়।'"

সন্তানাদি

হযরত আবদুর রাজ্জাক জিলানী রাহিমাহুল্লাহর ৫ জন পুত্রসন্তান ছিলেন। এরা হচ্ছেন:

১. সাইয়্যিদ আবু সালেহ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ
২. সাইয়্যিদ আবুল ক্বাসিম আবদুর রহীম জিলানী রাহিমাহুল্লাহ
৩. সাইয়্যিদ আবু মুহাম্মদ ইসমাঈল জিলানী রাহিমাহুল্লাহ
৪. সাইয়্যিদ আবু মুহসিন ফাজলুল্লাহ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ
৫. সাইয়্যিদ জামালুল্লাহ জিলানী (হায়াতুল মীর) রাহিমাহুল্লাহ

ভারতের কাশ্মীরে হযরত আবদুর রাজ্জাক জিলানী রাহিমাহুল্লাহর বংশধর আছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। পরবর্তী এ সায়্যিদ বংশের লোকজন আফগানিস্তান, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[১১০]

ক্বাদিরীয়া তরিকার গোড়াপত্তন

গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন 'জুনাইদিয়া' তরিকার একজন যুগশ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখ। ঈসায়ী **১১৬৬** সালে

[১১০] 'তুহফাতুল ক্বাদিরীয়া' গ্রন্থ দ্র:।

গউসুল আজমের ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও খলিফা হযরত আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ তরিকার নামকরণ করেন, 'ক্বাদিরিয়া' যা মূলত জুনাইদিয়া-ক্বাদিরিয়া হিসেবই প্রাথমিক দিনগুলোতো পরিচিত ছিলো। পরবর্তীতে জুনাইদিয়া শব্দ উহ্য হয়ে যায়।

ক্বাদিরিয়া তরিকা ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। একটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থী হক্কানি সুফি তরিকা হিসেবে, উলামায়ে কিরামসহ সকল মুসলমানদের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা পায়। এখনও এই তরিকাপন্থী অসংখ্য মুসলমান সমগ্র পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত পাক-ভারত-বাংলাদেশে কিছু 'বিদআতী' ফিরক্বা এই তরিকাপন্থী দাবিদার হওয়ার ফলে উপমহাদেশের হক্কানী উলামায়ে কিরাম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তি। আমরা এ থেকে পানাহ চাচ্ছি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে।

খলিফা

আমাদের জানামতে হযরত শায়খ আবদুর রাজ্জাক জিলানী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন তাঁরই নাতি আবদুল জব্বার জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর আরেকজন খলিফার নাম ছিলো হযরত সায়্যিদ শরফউদ্দিন কাত্তাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ইন্তিকাল

হযরত শায়খ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতানৈক্য আছে। এ ব্যাপারে তিনটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়: ৬ শাওয়াল ৬০৩ হিজরি, ৭ শাওয়াল ৬১৩ হিজরি এবং ৭ শাওয়াল ৫৯৫ হিজরি। অধিকাংশের মতে প্রথমোক্ত তারিখটিই সঠিক। তবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। হযরতের জানাযার নামাযে এতো বেশি মানুষের সমাগম হয়েছিলো যে, বাগদাদের বাইরে নামায আদায় করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে বাগদাদের বাবে হারামে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর সমাধির নিকটে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দার মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন।

হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির সানি মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত- ৯৪০ হিজরি, সমাধি- ওউচ, মুলতান।)

তাঁর নাম ছিলো আবদুল ক্বাদির। পিতার নাম মুহাম্মদ হাসানী। হযরতের উপাধি ছিলো শায়খ আবদুল ক্বাদির সানি এবং মাখদুম সানি। হিজরি ৮৬২ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

একজন কারামতওয়ালা বিশিষ্ট সুফি-দরবেশ ছিলেন হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ। সুদর্শন এই মহান ওলিআল্লাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে অনেক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্মের ৫ শতাধিক বছর পূর্বে জন্ম নেওয়া ক্বাদিরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সত্যিকার ওয়ারিস ছিলেন মুলতানের ওউচে বসবাসকারী এই মহাত্মন শাইখুল মাশাইখ। আর এ কারণেই মানুষ তাঁকে আবদুল ক্বাদির সানি - বা দ্বিতীয় আবদুল ক্বাদির বলে সম্বোধান করতেন। কেউ কেউ তাঁকে মাখদুম সানি বলেও সম্বোধন করেছেন। তিনি উভয় উপাধির সুযোগ্য ব্যক্তিই ছিলেন বটে।

তাওবাহর ঘটনা

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকালে হযরতের জীবন-যাপন ছিলো অনেকটা হাসি-তামাশা ও ফূর্তি-আমোদের। তিনি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর একটি উট ছিলো। বাদ্য-যন্ত্রাদি উটের পিঠে তুলে তিনি বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এই একই ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহে তাওবাহ করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন, তখন গান-বাজনা শ্রবণ করলেই তিনি কান চেপে ধরতেন ও এমনকি অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

হযরত আবদুল ক্বাদির মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর তাওবাহর ঘটনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তিনি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের পাত্র কীভাবে হলেন- তার বর্ণনা হচ্ছে এই: একদিন তিনি ওউচ এর নিকটস্থ গভীর জঙ্গলে শিকারে গেলেন। এক জায়গায় যেয়ে শিকারের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় এক তিতির পাখি অদ্ভুত আওয়াজে ডাকতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো পাখিটি কোনো বিরহ যন্ত্রণায় ক্রন্দন করছে! তিনি তন্ময়

হয়ে পাখিটির ডাক শুনছিলেন। এরপর কোত্থেকে একজন দরবেশ এসে হাজির হলেন হযরতের নিকট। দরবেশ বললেন: "সুবহানাল্লাহ্! এমন একদিন আসবে, যখন এই যুবকও তিতির পাখিটির মতো বিরহ-যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যাবে!" কথাটি শেষ করেই দরবেশ সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন। এদিকে ঘেড়ায় আরোহণরত আবদুল ক্বাদিরের অন্তরে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হলো। তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। হঠাৎ যেনো ইশকে ইলাহীর ছোঁয়ায় তিনি আপ্লুত হয়ে পড়লেন। ঘোড়া থেকে নেমে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। জীবনের সকল পাপকাজের জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাসহ তাওবাহ্ করলেন। এরপর সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন।

সৌভাগ্যবশত পীরের সন্ধানে তাঁকে বেশিদূর যেতে হয় নি। তাঁর পিতা ছিলেন ক্বাদিরিয়া তরিকার একজন শায়খ। তিনি তাঁর মুরিদ হয়ে তরিকতের উচ্চ মাক্বামে আরোহণ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ্কে তাঁর পিতা খিলাফত দান করেন।

বাদশাহর নিকট থেকে টাকা গ্রহণে অনীহা

হযরত আবদুল ক্বাদির মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ প্রাথমিক জীবনে বাদশাহর একজন কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমানোর পর তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন। এতে বাদশাহ অসন্তুষ্ট হন। এরপর পিতার মৃত্যুর পর বাদশাহ তাঁকে কিছু টাকা হাদিয়া হিসেবে নিয়মিত দিতে চাইলেন। হযরত টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, "আমার টাকার প্রয়োজন নেই। অনেক লোক আছে যাদের টাকার বেশি প্রয়োজন। আপনি বরং তাদেরকেই টাকা প্রদান করুন।"

নিঃস্ব হিসেবে হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ অনেক বছর ভীষণ কষ্ট সহ্য করে জীবন কাটিয়েছেন। ভুখা থাকার কারণে ক্ষুদার জ্বালায় প্রায়ই কাতর হয়ে পড়তেন। তিনি সব সহ্য করে আল্লাহর জিকির-আজকার ও রিয়াজত-মুজাহাদা অব্যাহত রাখেন। পাড়া-পড়শীরাও তাঁকে এসময় বেশ জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে সবর করতে থাকেন। আর বিপদে-আপদে, অভাব-অনটনে যে ব্যক্তি সবর করে সে-ই তো আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদের ব্যাপারে তাঁর পবিত্র কালামে একাধিকবার সুসংবাদ দান করেছেন।

হযরতের ওয়াজিফা

সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমানোর শুরুতে হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ দৈনন্দিন ওয়াজিফা পালনে খুব সতর্ক ছিলেন। সময় সময় পুরো দিনই তিনি নফল নামায ও জিকির-মুরাক্বাবায় কাটিয়ে দিতেন। মুরাক্বাবার সময় তিনি খোদাপ্রেমের গভীর সায়রে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যেতেন যে, দিনের পর দিন চলে যেতো ধ্যানস্থ অবস্থায়- তিনি তা বুঝতেই পারতেন না। শুধুমাত্র ফরয ও সুন্নাত নামায আদায়কালে তাঁর হুঁশ ফিরে আসতো। সকালে ফযরের নামায শেষে ইশরাকের পূর্ব পর্যন্ত ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে থাকতেন। ইশরাকের নামায আদায় করে আবার মুরাক্বায় নিমজ্জিত হতেন। এরপর যখন চাশতের নামাযের সময় হতো তখন দেখা যেতো, নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। এরপর আবার ধ্যানে নিমগ্ন হতেন যুহরের পূর্ব পর্যন্ত। এভাবে এক নামায থেকে আরেক নামাযের সময় পর্যন্ত মুরাক্বাবা করতে করতে পুরো দিন ও রাত কাটাতেন। সময় সময় বেতের তৈরি মসজিদের মাদুরে কাত হয়ে পড়ে থাকতেন।

মুয়াজ্জিন ও ইমামের দায়িত্ব

কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদার সময় হযরত আবদুল ক্বাদির মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ একাধারে অনেকদিন মসজিদে পড়ে থাকতেন। এসময় তিনি মুয়াজ্জিন এবং ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ফযরের আজান দিয়ে ঘরে ঘরে যেতেন। মানুষকে সজাগ করতেন নামাযে আসার জন্য। তিনি বলতেন: “ওঠো! জেগে ওঠো! এখন হচ্ছে ইবাদত ও আনন্দের সময়।” মানুষ একত্রিত হলে তিনি বলতেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্যসহ এক্ষুণি একথা বলে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমি চাই তোমরা সবাই আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে যেনো বঞ্চিত না হও। এটা তোমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, তোমরা জেগে ওঠতে অলসতা করছো।”

একটি ঘটনা

হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহ তখন সঙ্গী-সাথী ও মুরিদানদের নিয়ে বৈঠকে ছিলেন। এসময় একজন ক্বাওয়াল [গায়ক] সেখানে উপস্থিত হলেন। তার হাতে ছিলো সেতার। হযরত তাকে বললেন, “তোমার সেতার ভেঙ্গে ফেলো! তোমার বাড়িতেও যতো বাদ্যযন্ত্র আছে সব ভেঙ্গে চুরমার করো! একজন সুফি-দরবেশে পরিণত হয়ে যাও।” এ কথাগুলো আপাতদৃষ্টিকে ক্বাওয়ালের মধ্যে কোনো

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন খুব ধনবান ও প্রভাবশীল। হযরতের উক্ত কথাগুলো দ্বারা তাঁর মনে এতোই ভাবান্তর সৃষ্টি হলো যে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অতীতের সকল গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে তাওবাহ করলেন। অচিরেই এ ব্যক্তি এক উচ্চ পর্যায়ের ওলি হয়ে গেলেন। দয়ার সাগর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছে তাঁর আপনজনে পরিণত করেন। সুবহানাল্লাহ!

ইন্তিকাল

প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। নির্দিশ ক্ষণটি উপস্থিত হলেই চলে যেতে হবে এ মায়াবী ধরার কোল থেকে চিরদিনের জন্য। এতে এক মুহূর্তও হেরফের নেই। ক্বাদিরিয়া তরিকার শায়খ আবদুল ক্বাদির সানি মুলতানী রাহিমাহুল্লাহও একদিন তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের শেকোর সায়রে নিমজ্জিত করে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ছিলো ১৮ রবিউল আউয়াল ৯৪০ হিজরি। তিনি সমাহিত আছেন মুলতানের ওউচে। হে আল্লাহ! আপনি এই মহাত্মন ওলির কবরকে আরো বেশি নূরান্বিত করুন। সমুন্নত করুন হযরতের মাক্বামাতকে।

হযরত শায়খ শাহ আল-আমিন আবদুর রাজ্জাক ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত- ৯৪৯ হিজরি, সমাধি- ঝানঝানাহ, ভারত।)

হযরতের নাম ছিলো আবদুর রাজ্জাক, তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ এবং উপাধি ছিলো শাহ আল-আমিন। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ আহমদ জাহিদ ইবনে ক্বাজি কুদাত ফাজিল রাহিমাহুল্লাহ। হযরতের পূর্বপূরুষ ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

শায়খ আবদুর রাজ্জাক ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ ৮৮৬ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ছিলো ইরাক। শাহ সাহেবের এক ঊর্ধতন পুরুষ শায়খুল ইসলাম আবু সাঈদ রাজি আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ হিজরত করে চলে আসেন ভারতের দিল্লিতে। তখন দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতানুল হিন্দ শিহাবুদ্দিন ঘুরি। তবে হযরত আবু সাঈদ দিল্লিতে বেশিদিন থাকেন নি। মুজাফফরনগরের কিরানায় যেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মহাত্মন এ ওলির বংশধরই হচ্ছেন শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ।

মাতৃবিয়োগ ও পিতার স্বপ্ন

হযরত শাহ আবদুর রাজ্জাক সাহেব শিশুকালেই তাঁর মাতার স্নেহমমতা থেকে বঞ্চিত হন। মাতৃহারা শিশুর ভরণপোষের দায়িত্ব কে নেবে এ ব্যাপারে তাঁর পিতা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শায়খ আহমদ জাহিদ এক রাতে স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তিনি দেখলেন, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কোল মুবারকে তাঁর পুত্র আবদুর রাজ্জাক বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: "হে আহমদ জাহিদ! এ শিশুর ব্যাপারে চিন্তা করো না। তাকে নিয়ে দুঃখ করো না। সে আমার! সে হচ্ছে সিদ্দিকীনের অন্তর্ভুক্ত।" ঘুম ভেঙ্গে গেলো হযরত আহমদ জাহিদের। তাঁর অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হয়ে ওঠলো। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। পাশেই ঘুমন্ত স্বীয় পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

কপালে বার বার চুমো খেলেন। এরপর থেকে তিনি এ সৌভাগ্যশীল শিশুর দেখভাল করতে লাগলেন একান্ত মনোযোগসহ।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বয়সে পদার্পণ করার পর স্বীয় পিতা শিশু আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে গেলেন হযরত ক্বাজি নুমান আয-জামান প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়। মাদরাসার দায়িত্বে ছিলেন হযরত শায়খ জালালুদ্দিন ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ। ছোট্ট এ শিশুকে দেখেই তিনি রূহানী দৃষ্টিপাত দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, এ ছাত্রটি একদিন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবে। সুতরাং তিনি নিজেই এ ছাত্রের প্রতি বিশেষ খিয়াল-নজর রাখেন। নিজ হাতে তাঁকে শরীয়তের জ্ঞানদান ও প্রশিক্ষণ দেন। তাহাজ্জুদের নামাযের সময় তিনি যখন জেগে ওঠতেন তখন আবদুর রাজ্জাককে নিজের কক্ষে ডেকে এনে একসাথে নামাজ আদায় করতেন। এরপর তিনি হাত তুলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করতেন: "হে প্রভু! আপনি যে স্তরে আমাকে অনুগ্রহ করে আরোহিত করেছেন, আবদুর রাজ্জাককেও সে স্তরে উন্নীত করুন।"

হযরত আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ ১০ বছর হযরত ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে ছিলেন। এ সময় তিনি শরীয়ত ও তরিকতের ওপর উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন। তিনি কুরআনের হাফিজ হোন, বিভিন্ন ফার্সি কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং ফিকাহ শাস্ত্রের অনেক কিতাব পাঠ করে শরীয়তের ওপর দক্ষতা অর্জন করেন। হযরত ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের পর উচ্চতর জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তিনি পানিপথে যেয়ে উপস্থিত হন।

পানিপথে কিছুদিন অবস্থান করার পর শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ চলে যান দিল্লি শহরে। সেখানে অবস্থান করেন হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ উসমানী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে। দীর্ঘ ৫ বছর এখানে থেকে শরীয়ত ও তরিকতের ওপর দারস গ্রহণের পর তিনি ভ্রমণে বের হন। তিনি কালপি, কিরা মানিকপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। এসব স্থানে সাক্ষাৎ করেন যুগের বিভিন্ন আকাবিরে কিরামের সঙ্গে। এসময় হযরত আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ যৌক্তিক ও ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। অবশেষে তিনি দিল্লিতে ফিরে এসে শায়খ মাওলানা আবদুল্লাহ দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর শায়খ আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থাকার সৌভাগ্য হয় শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহর। হযরত আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দূর-দুরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর দরবারে আসতে থাকে। বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইল ও দিকনির্দেশা দ্বারা সবাই উকপৃত হয়। একজন সুপণ্ডিত ফকীহ হিসেবে হযরত শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহর সুনাম সমগ্র ভাতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

মুরিদ হওয়া ও খিলাফত লাভ

ইলমে শরীয়ত ও তাসাউফ সম্পর্কে কিতাবী জ্ঞানার্জন জরুরি। শরীয়তের নির্ধারিত বাহ্যিক আমল সঠিকভাবে পালনের জন্য শরীয়তের জ্ঞান দরকার। অপরদিকে ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন দ্বারা ইসলাহুন-নাফস লাভ বাস্তবে খুব কঠিন। কারণ নিজে নিজে জিকির-মুরাক্বাবা-ধ্যান-সাধনা বেশ উপকারী হলেও, তাসাউফের উচ্চ মাক্বামে আরোহণকৃত একজন কামিল শায়খের সুহবত লাভ ছাড়া মনজিলে মাকসূদে পৌঁছুনো আদৌ খুব কঠিন ব্যাপার। আমরা তাই দেখতে পাই, সমগ্র ইতিহাসব্যাপী তরিকতের শায়খগণ সিলসিলা মুতাবিক মুরিদ হয়ে বেলায়েতের উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অন্য-কথায় শায়খ-শাগরিদ (পীর-মুরিদ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ওলিআল্লাহগণের আবির্ভাব ঘটে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবেও। ইসলাহুন-নাফস বা আত্মশুদ্ধির এ রাস্তা মহান আল্লাহ তা'আলার একটি নিযাম হিসেবে ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত।

যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হযরত শায়খ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা-সাধনায় শরীয়ত ও তরিকতের জ্ঞানে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে তিনি অনুভব করলেন পর্যাপ্তহীনতা। যদিও তাসাওউফ শাস্ত্রের কিছু কিছু বিষয়ের ওপর তাঁর আস্থা তখনও ছিলো না। এরপরও একজন কামিল পীরের হাতে বাইআত গ্রহণের ইচ্ছে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশত সে সময় পবিত্র মক্কা মুকাররমা থেকে ক্বাদিরিয়া তরিকার একজন উচ্চ স্তরের শায়খুল মাশাইখ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তিনি ছিলেন কুতবুল আলম শায়খ আজম মুহাম্মদ খিয়ালী ইবনে হাসান তাহির কামাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তখনকার সুলতান সিকান্দার লোদি [১৪৫৮-১৫১৭ ঈ - রাজত্বকাল: ১৪৮৯-১৫১৭ ঈ.] হযরতকে ভারতে আসার জন্য বিশেষ নিমন্ত্রণ জানান। কুতবুল আলম শায়খ আজম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ এ দাওয়াত গ্রহণ করে আহমদাবাদে আসেন।

কুতবে আলম শায়খ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ আহমদাবাদে এসেছেন জেনে হযরত আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন। তিনি হযরত কুতবে আলমের সঙ্গে তাসাওউফের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা-সমালোচনা করলেন। তিনি কিছু কিছু বিষয়কে প্রমাণসহ প্রত্যাখ্যন করতে থাকেন। দীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী উভয় বুজুর্গের মধ্যে এ 'বাহাস' চলতে থাকে। হযরত কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহর কণ্ঠ থেকে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের সময় মুচকি হাসি হাসছিলেন। এরপর হঠাৎ তিনি আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ গর্ধানে ধরে নিজের দিকে টেনে নিলেন। কানকথায় কী যেনো বললেন। সাথে সাথে কথাগুলোর প্রভাব তাঁর অন্তরাত্মা পর্যন্ত পৌঁছুয়ে গেলো। তিনি বুঝতে পারলেন, যাবতীয় যৌক্তিক চিন্তা-চেতনা ও বিজ্ঞান মুহূর্তের মধ্যে মন-মস্তিষ্ক থেকে মুছে গেছে!

হযরত কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে বিদায় হওয়ার পর তিনি শিক্ষকতা সম্পর্কে সবকিছু ভুলে গেলেন। তিনি একখানা তাফসির গ্রন্থ খুললেন। এতে নিম্নোক্ত আয়াতে করীম তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ * إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

-"বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" [সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১]

এ আয়াতের ওপর তাঁর চোখ পড়তেই তিনি দেখলেন হযরত শায়খ কুতবে আলমের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য তাঁর মন ও অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করে তুলেছে। এ অভিজ্ঞতা লাভের পরই তিনি পুনরায় ছুটে গেলেন কুতবে আলমের দরবারে। তখনও হযরত আবদুর রাজ্জান রাহিমাহুল্লাহর আভ্যন্তরীণ অবস্থার সমাপ্তি ঘটেনি। কিন্তু শায়খ কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহর দিকে আন্তরিক দৃষ্টিপাত করলেন। আর এতেই শায়খ আবদুর রাজ্জাকের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেলো। তিনি ফিরে এসে আবারও তাফসিরের গ্রন্থটি খুললেন। এবারও চোখে ভেসে এলো উক্ত আয়াতে করীমটি। তাঁর অবস্থাও আগের মতো হলো। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে পুনরায় তাফসিরের গ্রন্থটি খুললেন। এবার দৃশ্যমান হলো এই আয়াতে করীমটি:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ * أَفَلَا تُبْصِرُونَ

-"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" [সূরা জারিয়াত : ২১]

তিনি এ পবিত্র আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তাঁর অবস্থা পুনরায় পবিবর্তন হলো। আবার ছুটে গেলেন কুতবে আলমের দরবারে। শায়খ কুতবে আলম তাঁকে বিশেষ কিছু শব্দ শিক্ষা দিলেন। এগুলো পাঠ করার পর তিনি হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করলেন। তিনি এবার হযরতের সুহবতে থেকে তিন ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। অবশেষে কুতবে আলম শায়খ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। শায়খ তাঁকে একটি টুপি প্রদান করলেন। এরপর এই বিশেষ মুরিদের নিকট সমজিয়ে দিলেন ক্বাদিরিয়া তরিকার শাজারাহ মাবুরকের একটি লিখিত কাগজ।

সুলুকের রাস্তায় কঠোর মুজাহাদা

মুরিদ হওয়ার পর শায়খের নির্দেশ মুতাবিক হযরত আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ সুলুকের রাস্তায় কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত হন। এসময় তিনি রিয়াজত-মুজাহাদার মাধ্যমে স্বীয় হৃদয়ের কলুষতা দূর করেন। তিনি স্তরে স্তরে রাস্তার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে থাকেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর শায়খের নিকট বর্ণনা করলে কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহ বললেন: "হে আবদুর রাজ্জাক! তোমার আসল মাকসাদ এখনও অনেক দূরে!"

হযরত আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তীতে বলেন: "সুলুকের অবস্থায় আলমে মালাকুত ও আলমে জাবারুতের চিত্র সময় সময় সালিকের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে। তবে সত্যিকার সালিককে এসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে আরো সামনে এগুতে চেষ্টা চালাতে হবে। হৃদয়ের ওপর যতো ধরনের পর্দা আছে তার সবই উন্মোচন করা চাই। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেখানে আর কোনো কিছুই যাতে স্থান করে নিতে না পারে, সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। আর যখন এ স্তরে উন্নীত হবে, তখনই আমরা ধরে নিতে পারি সালিক ফানা ফিল্লাহর মাক্বামে আরোহণ করেছেন। এর পরই আসবে বাক্বা বিল্লাহর মাক্বাম। এসময় সালিক 'আখলাসুল খাওয়াস'-এর স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। যেমন হাদিসে আছে:

تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللهِ واتَّصِفُوْا بِصِفَاتِ اللهِ

-"আল্লাহর চরিত্রকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করো, এবং নিজেকে আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত করো।"

হযরত শাহ আল-আমিন আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ সাত বছর তাঁর পীর সাহেব কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থাকেন। এসময় এমন কোনো গাইরুল্লাহ সম্পর্কিত বস্তু নেই যা থেকে তিনি পরহেজ করেন নি এবং এমন কেনো আধ্যাত্মিক সাধনা নেই যা থেকে তিনি গাফিল ছিলেন। তিনি স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে কঠোর মুজাহাদা ও অনুসরণীয় ইখলাসের মাধ্যমে সুলুকের উচ্চতম মাক্বামে আরোহণ করেন। এরপর একদিন তাঁর শায়খ কাছে এসে বললেন:
"শায়খ আবদুর রাজ্জাক! তোমার মতো রূহানী সন্তান থাকাসত্ত্বেও মুরিদ করা ও তাঁদেরকে দিকনির্শেনা দিতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এখন তোমাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শরীয়ত ও তরিকতের রাস্তায় বহাল থেকে নিজেকে দায়িত্বশীল করে তুলো তোমার মুসলমান ভাইদেরকে দিক-নির্দেশনা দান করতে। তাঁদেরকে শিক্ষা ও সবক দাও সুলুকের অমূল্য সম্পদ লাভের লক্ষ্যে। ঠিক যেভাবে ক্বাদিরীয়া তরিকার আউলিয়ায়ে কিরাম করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি আমি ইতোমধ্যে যে দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম সেটা এখন তোমার উপর পতিত হলো। তুমি এখন থেকে ক্বাদিরীয়া তরিকার শায়খ হিসেবে মানুষকে মুরিদ করো।"

খিলাফত লাভের পর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ বললেন: "আমি যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ!" কিন্তু তিনি জানতেন, কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক এখন থেকে তাঁকে শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি তা অত্যন্ত সফলভাবে করেও গেছেন।[১১১]

ঝানঝানায় বসবাস

হযরত শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় শায়খের ইন্তিকালের পর ঝানঝানায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি সর্বদা খানক্বায় অবস্থান করে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত থাকতেন। তিনি নিজের মুরিদানের সার্বিক দেখভাল ও আধ্যাত্মিক

---

[১১১] সাহায়িফে মা'রিফাত দ্র;।

উন্নতির জন্য সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। অন্য কোনো মানুষের সঙ্গ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। শুধুমাত্র জীবনরক্ষার্থে যেকুটু খাবার প্রয়োজন তিনি সেটুকুই ভক্ষণ করতেন। বছরের অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন এবং প্রায়ই শুধুমাত্র পানি ও আহারযোগ্য গাছের পত্র দ্বারা ইফতার সারতেন।

কারামতওয়ালা বুজুর্গ

কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন। ওলিদের কর্তৃক আল্লাহর ইচ্ছায় কারামত প্রকাশ আহলে সুন্নাত-ওয়াল জামা'আতের আক্বিদার অর্ন্তুক্ত ব্যাপার। সুতরাং কারামত প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে কারো ইখতিলাফ নেই। যারা ইখতিলাফ করে থাকে তারা মূলত আউলিয়ায়ে কিরাম ও কারামত এ উভয় বিষয়েই পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়। তবে এটা সত্য, সকল ওলির জন্য কারামত প্রকাশ হওয়া ওলায়েতের শর্ত নয়। যাক, হযরত শাহ আবদুর রাজ্জাক ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। বিভিন্ন কিতাবে হযরতের মাধ্যমে ২০০ পর্যন্ত কারামত প্রকাশের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১১২] আমরা এ প্রসঙ্গে কোনো কারামতের বর্ণনা না দিয়ে তাঁর মহামূল্যবান কিছু বাণী পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

মূলবান বাণী

১. "আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন শরীয়তকে যথাযথ অনুসরণ করার। মানুষ যখন এ ব্যাপারে চিন্তা করে তখন তার অন্তরে আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে সে বদান্যতা ও আত্মসমর্পণের রাস্তা বেছে নেয়।"

২. "তোমাকে জানতে হবে যে, বোধশক্তি হচ্ছে উপাসনার আত্মা। আল্লাহকে না জেনে না চিনে উপাসনা হচ্ছে অর্থহীন। তিনি তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেন:

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

-"এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর।" [সূরা আম্বিয়া : ৯২ (অংশ)]

সুতরাং আল্লাহর পরিচিতি অর্জন করে যে উপাসনা হবে- তা-ই হচ্ছে প্রকৃত ইবাদত।"

---

১১২ প্রাগুক্ত এবং বাহরুল আসরার কিতাব দ্র:।

৩. “তরিকতের সালিককে অবশ্যই প্রদর্শন [বা দর্শনেচ্ছু] ও আত্ম-গৌরববোধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এভাবেই তাঁকে আনুগত্য ও উপাসনার দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। এসময় তাকে মুছে ফেলতে হবে যাবতীয় গোপন-চিন্তা- তা ভালো কিংবা মন্দ হোক। এগুলো তার হৃদয়ে জাগ্রত হয় মূলত ওয়াসওয়াসা থেকে। তাকে চিনতে হবে কোনটি তার জন্য ভালো ও কোনটি অশনি সংকেত।”

৪. “অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ ও হামলা থেকে আত্মরক্ষা হচ্ছে প্রথম শর্ত। আল্লাহ তা’আলা তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেন:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

-“তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা অবগত আছেন।” [সূরা আম্বিয়া : ৫১ (অংশ)]

হৃদয় হচ্ছে দেহের বাদশাহ। বাকি সবকিছু এ বাদশাহর প্রজা ও নির্দেশ পালনকারী। যখন হৃদয় পরহেজগারীকে পছন্দ করে নেয় তখন তার প্রজারাও আনুগত্যশীল হয়। ক্রমান্বয়ে সবাই হয়ে যায় ইবাদতকারী। এ সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আছে। এতে তিনি বলেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

-“সাবধান! মানুষের দেহের ভেতর এক টুকরো মাংস আছে। এটা যদি ভালো হয়ে যায় [পরিশুদ্ধ হয়], তাহলে সমগ্র দেহ ভালো হবে [আল্লাহর আনুগত্যশীল হয়]। কিন্তু এটা যদি নষ্ট হয়ে যায় [অপরিশুদ্ধ থাকে] তাহলে সমস্ত দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ক্বলব [হৃদয়]।”[১১৩]

৫. “তরিকতের সালিকদের চিন্তা-চেতনাকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়: ১. আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বাস্তব চিন্তা। ২. ফিরিশতাসূলভ চিন্তা। ৩. নফসানী [নিজকে নিয়ে] চিন্তা। ৪. শয়তানী চিন্তা।”

---

[১১৩] সহীহ বুখারী।

৬. “সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার মুশাহাদার মধ্যে [তাঁকে দেখে দেখে] ইবাদত করা। তোমার চেতনা বা স্তর যদি এ পর্যায়ের না হয় তাহলে ইবাদতের সময় মনে করবে তিনি [আল্লাহ] তোমাকে দেখছেন। কেউ যখন ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ায় নামায আদায় করতে, তখন সে অন্য সকল দিককে পরিত্যাগ করে। যে মুহূর্তে সে ক্বিবলার দিক থেকে নিজেকে ঘুরিয়ে অন্য কোনো দিকে নিয়ে যাবে, তখন তার নামায বাতিল হবে। হৃদয়ের ঘুরে দাঁড়ানোও অনুরূপ। মানব হৃদয়ের ক্বিবলা [উদ্দেশ্য] হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা। সুতরাং যখন কোনো বান্দাহ তার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করবে তখন তার হৃদয় সত্যিকার ক্বিবলার [আল্লাহ তা’আলার] দিকে থাকতে হবে। এর ফলে তার নামায হবে কলুষমুক্ত ও গ্রহণীয়।[১১৪]

এমন নামায যাতে তোমার দেহ [ক্বিবলার দিকে] উপস্থিত কিন্তু মন [ক্বলব] অনুপস্থিত, ত-তো অতি সাধারণ্যের নামাযের মতো। এভাবে নামায আদায় হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু মনে রাখবে তুমি অপর সকল মুসল্লির মতোই নামায আদায় করলে মাত্র। অথচ তুমিই বলছো, আমি আল্লাহ তা’আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, তিনি আমাকে নামায আদায়ের তাওফিক দিয়েছেন। কিন্তু মনে রেখো, হে তরিকতের সালিক! এমন নামায গ্রহণীয় হবে না। এ নামায তোমার প্রতি ফিরিয়ে মুখের ওপর ছুড়ে মারা হবে!”[১১৫]

৭. “যে ব্যক্তি দেহের মাধ্যমে হাজ্জ পালন করে, মনে হয় সে যেনো দেহ দ্বারা বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। এটা তো সাধারণ মানুষের হাজ্জ। ঐ ব্যক্তি যিনি ক্বলবের মাধ্যমে হাজ্জ পালন করেন, তিনি কা’বার মালিককে পেতে প্রত্যাশী। তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বিশেষ বান্দাহ।

যে ব্যক্তি শুধু দৈহিক হাজ্জ পালন করেন, তিনি তাওয়াফ করেন কা’বার চতুর্দিকে। আর যিনি তাঁর হৃদয় [ক্বলব] ও দেহ দ্বারা হাজ্জ পালন করেন, কা’বা ঘুরতে থাকে তাঁকে ভালোবেসে।

---

[১১৪] সাহাইফে মা’রিফাত। জানা থাকা প্রয়োজন যে, শুধু নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয ইবাদতের সময় নয়, বরং জিকির-মুরাক্বাবা ও অন্যান্য সকল নফল ইবাদতের সময়ও ক্বলবকে অনুরূপভাবে আসল ক্বিবলা তথা আল্লাহ তা’আলার দিকে নিবদ্ধ রাখা জরুরি। আল্লাহর ওলিদের ক্বলব তো সর্বদাই আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট আছে। -গ্রন্থকার।
[১১৫] প্রাগুক্ত।

যে ব্যক্তি শুধু দৈহিক হাজ্জ পালন করেন, তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাত দৌড় দেন। আর যিনি ক্বলব দ্বারা হাজ্জ পালন করেন, তিনি আল্লাহর জালাল [অসীম ক্ষমতা] ও জামালের [অসীম সৌন্দর্য] মধ্যস্থ উপত্যকায় ছুটোছুটি করেন।

যে ব্যক্তি শুধু দৈহিক হাজ্জ করেন, তিনি হাজারে আসওয়াদে চুমো খান। যিনি ক্বলবের দ্বারা হাজ্জ পালন করেন, তিনি অনন্ত প্রেমের সদনপত্রে চুমো খান।

যে ব্যক্তি বাহ্যিক-দৈহিক হাজ্জ করেন, তিনি চর্মচক্ষুতে বাইতুল্লাহর দিকে তাকানোকে অধিক গুরুত্ব দেন। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক-ক্বালবী হাজ্জ পালনে রত, তিনি এক মুহূর্তের জন্য শান্ত নন যতক্ষণ না আল্লাহর অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করেছেন।”[১১৬]

৮. “আল্লাহ তা’আলা বলেছেন: যে ব্যক্তি পাঁচটি বস্তু নিয়ন্ত্রণে রাখে, আমি তাকে পাঁচটি বস্তু প্রদান করবো। এগুলো হচ্ছে:

১. সে তার জিহ্বার হিফাজত করবে। আমি তাকে দান করবো ‘আমার জিকির’।

২. সে যদি আমাকে ছাড়া সবকিছু থেকে নিজের জিহ্বাকে গাফিল করে দেয়, তাহলে আমি তাকে আমার দর্শন দ্বারা প্রফুল্ল করবো।

৩. সে যদি নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে, আমি তাকে দান করবো প্রজ্ঞা যার দ্বারা সে মানুষের মধ্যে বিচরণ করবে।

৪. সে যদি নিজের ক্বলবকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে দূরে রাখে, তাহলে আমি তাকে দান করবো আমার মর্যাদার দৃষ্টি।

৫. সে যদি নিজেকে সবরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখে, তাহলে আমি তাকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবো।”

৯. “কানা’আত [অল্পেতুষ্টি] অর্থ হচ্ছে, যাকিছু তোমার আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং যা তোমার নেই তা অর্জনের চেষ্টা না করা। এটা হচ্ছে সাধারণ পরহেজগারদের কানা’আত। আর আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের [ওলিদের] কানা’আত হলো এই: যখন তাঁরা কিছু প্রাপ্ত হন তখন তা অপরদেরকে প্রদান করেন। একই সময় তাঁরা শুধু

---

[১১৬] সাহাইফে মা’রিফাত।

আল্লাহর সন্তুষ্টি চান বিনিময় হিসেবে। এটা হচ্ছে 'আবরার' ও পরহেজগারদের কানা'আত। খুব উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর বান্দাদের কানা'আত হচ্ছে এই: তাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহর মুশাহাদার মধ্যেই সন্তুষ্ট। তাঁরা গাইরুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। এটা হচ্ছে আল্লাহর সত্যিকার প্রেমিকদের কানা'আত।"

১০. "তুমি যখন জিকিরের মধ্যে নিমগ্ন হবে, এটা জরুরি যে, তোমার অন্তরাত্মা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহর দিকে এভাবে ফিরে তাকানোর সময় ভাববে যে, তুমি তাঁর পবিত্র দরবারে উপস্থিত আছো। এরূপ ধারণা জন্মাবে যদি তুমি কোনো কামিল পীরের মুরিদ হও এবং তাঁর নির্দেশিত জিকির-আজকারে লেগে যাও। তুমি যখন বলবে, 'লা-ইলাহা' তখন কল্পনা করবে যে, যাবতীয় দুনিয়াবী সম্পর্ক তথা গাইরুল্লাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছো। এরপর যখন 'ইল্লাল্লাহ' বলবে তখন কল্পনা করবে, ক্বলবের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বীজ বপন করছো। এ জিকির সর্বদা করবে। এর ফলে তোমার অন্তরাত্মা থেকে গাইরুল্লাহর সকল ভালোবাসা ক্রমান্বয়ে মুছে যাবে। সেখানে তখন বিরাজ করবে মহান আল্লাহ তা'আলার ইশক ও মুহাব্বত। দায়িমী জিকির অন্তরে সৃষ্টি করে 'ইহতিয়াজ'। 'ইহতিয়াজ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, অতিরিক্ত জিকির ও এর প্রভাবের ফলে, জাকির জিকিরের আলোকের মধ্যে ডুবে যাওয়া। যার ফলস্বরূপ জাকির তার নিজের অস্তিত্ব থেকে গাফিল হয়ে যায়। জিকিরের প্রভাবে জাকির দুনিয়াবী সীমাবদ্ধতা, সংযোগ ও সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। সে দৈহিকভাবে পাতলা ও দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে হয়ে ওঠে সবল ও দৃঢ়।"

হযরত শায়খ আবদুর রাজ্জাক ঝানাঝাওয়ী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

একটি সফল জীবন শেষে শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ ঝানঝানায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। জিলহাজ্জ মাসের ২৩ তারিখ, ৯৪৯ হিজরি সনে তিনি এ ধরাধাম থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে হযরতের বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। এসময় দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান শের শাহ সুরী [১৪৮৬ – ১৫৪৫ ঈ. শাসনকাল: ১৫৪০ - ১৫৪৫ ঈ.]। হযরত রাহিমাহুল্লাহকে ঝানঝানার প্রধান জামে মসজিদের পাশে দক্ষিণ দিকে সমাহিত করা হয়। হে আল্লাহ! তোমার অফুরন্ত রহমত দ্বারা তাঁর কবরকে নূরান্বিত করো। দান করো তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাক্বাম। তাঁর রূহানী ফায়েজ দ্বারা আমাদেরকে মালামালা করো।

হযরত শায়খ জামাল ইবনে হুসাইন বেহতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত- ৯৭১ হিজরি, সমাধি- রায়গড়, আহমদাবাদ, ভারত।)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো সাইয়্যিদ শাহ জামাল ইবনে হুসাইন আবু মুজাফফর ইবনে আবু ওয়াক্ত হাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন ইমামুত তরিকত গউসুল আজম সাইয়্যিদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর।

হরমুজ থেকে ভারতে হিজরত

হযরত শায়খ জামালের পিতা হিজরি নবম শতকের শেষের দিকে ইরানের হরমুজ শহর থেকে ভারতের দক্ষিণাপথের বেহতার শহরে এসে স্বপরিবারে বসবাস শুরু করেন। শায়খ জামালের জন্ম এখানেই হয়। তিনি প্রথামিক ও মাধ্যমিক উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন তাঁর সুযোগ্য পিতার নিকট। তিনি ছিলেন ক্বাদিরীয়া তরিকার একজন শায়খ। হযরত জামাল স্বীয় পিতার মুরিদ ছিলেন এবং পরবর্তীতে খলিফা নির্বাচিত হন। সুলুকের উচ্চতর মাক্বামে আরোহিত শায়খ জামাল রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ও কারামতওয়ালা একজন যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ।

স্বীয় পিতার ইন্তিকালের পর শাহ জামাল রাহিমাহুল্লাহ দক্ষিণাপথের বেহতার শহরের ক্বাদীরিয়া শায়খ হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। তবে সে সময়কার গুজরাটের শাসনকর্তা সুলতান কুতুবউদ্দিন বাহাদুর শাহ [মৃ. ১৫৭৩ ঈ.] তাঁকে গুজরাটে যেতে আমন্ত্রণ জানান। তিনি এতে সাড়া দেন ও সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি খানক্বার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুলতান হযরতকে বাৎসরিক ভাতাও দান করেন।

সদুপদেশের ঘটনা

গুজরাটের খানক্বায় আসার পূর্বেই শায়খ জামাল রাহিমাহুল্লাহর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ তাঁর সুহবত থেকে উপকৃত হতে থাকেন। সুলতান বাহাদুর শাহ এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি একবার বেহতার শহরে যেয়ে হযরত শাহ জামাল রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ যাত্রার মূল কারণ ছিলো এই: ইতোমধ্যে কেউ একজন তাঁকে অবগত করলো যে, শায়খ জামাল কারো প্রতি কোনো ধরনের ছাড় দেন না। তিনি গোস্বা করে বললেন, “তিনি যদি আমার প্রতি

উপযুক্ত আদব-কায়দা দেখান না তাহলে আমি তাঁকে অপমানিত ও বেইজ্জত করে ছাড়বো!”

সুলতানের সঙ্গী-সাথীগণ পরবর্তীতে বলেন, আমরা লক্ষ করলাম সুলতান বাহাদুর শাহ কক্ষে প্রবেশ করে হযরত শাহ জামালের সামনে খুব আদবসহ বসলেন। শাহ জামাল তাঁকে অতিরিক্ত কেনো সম্মানপ্রর্দশন না করে সবাইকে যেভাবে উপদেশ দেন সেভাবেই কিছু উপদেশ দিলেন সুলতানকে। এরপর সুলতান আদবসহ খানক্বাহ থেকে প্রস্থান করেন। পরবর্তীতে কেউ একজন সুলতানকে প্রশ্ন করলো: “হে মহামান্য সুলতান! হযরত শাহ জামালের খানক্বায় কী ঘটেছিলো?” তিনি জবাব দিলেন: “আমি যখন শায়খের নিকট উপস্থিত হলাম, দেখতে পেলাম তাঁর উভয়দিকে বসে আছে দুটি বিরাটাকার হিংস্র সিংহ! উভয়টি আমার দিকে খুব বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাচ্ছিলো।”

এ ঘটনার পর থেকে গুজরাটের সুলতান কুতুবউদ্দিন বাহাদুর শাহ হযরত শাহ জামাল রাহিমাহুল্লাহর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আনুগত্যশীল হয়ে ওঠেন। তিনি হযরতকে গুজরাটে এনে খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত হযরত শাহ জামাল রাহিমাহুল্লাহ এখানে অবস্থান করেন। গুজরাট সালতানাতের অসংখ্য মানুষ হযরতের সুহবত থেকে উপকৃত হন।

সন্তানাদি

হযরত শাহ জামাল রাহিমাহুল্লাহর ৫ জন পুত্রসন্তান ছিলেন। এরা হচ্ছেন:

১. আমিনুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ।
২. ইয়াতিমুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ।
৩. সুফি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ।
৪. হুসাইন সাহেব রাহিমাহুল্লাহ।
৫. বদরউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ।

হযরতের পুত্র ইয়াতিমুল্লাহ সাহেব ইলমে শরীয়ত ও তাসাওউফের ওপর পারদর্শী ছিলেন। তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ‘গুলজার আবরার’ নামক কিতাবের লেখক বলেন, ‘আমি হযরত ইয়াতিমুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ১০০৩ হিজরি সনে

আহমদাবাদে যেয়ে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি এর পাঁচ বছর পর ইন্তিকাল করেন।’[১১৭]

ইন্তিকাল

হযরত শাহ জামাল বেহতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মায়াবী ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন **২৩** শা’বান **৯৭১** হিজরি সনে [**১৪** এপ্রিল **১৫৬৪** ঈ]। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে আহমদাবাদের রায়গড়ে সমাহিত করা হয়েছে। হে আল্লাহ! তোমার এ প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন।

---

[১১৭] মাশাইখে আহমদাবাদ, খ. ২, পৃ. ১১৯।

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত- ১০৪২ হিজরি, সমাধি- হাওজ শামী, দিল্লি, ভারত।)

দিল্লির বিখ্যাত এই মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তবে হয়তো অনেকের জানা নেই যে, এই শায়খ ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকার একজন স্বনামধন্য ওলিআল্লাহও ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে খুব সংক্ষিপ্তভাবে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্ম এবং বিশেষভাবে তাঁর তাসাওউফ চর্চার ওপর বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

জন্ম

শায়খ আবদুল হক রাহিমাহুল্লাহ ৯৫৮ হিজরি সনের [১৫৫১ ঈ.] মুহাররম মাসে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ মাওলানা সাইফুদ্দিন তুর্ক বুখারী রাহিমাহুল্লাহ।

প্রাথমিক শিক্ষা

শায়খ মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর পিতা তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পিতা নিজেই এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী তাঁর সন্তানকে খুব সতর্কতাসহ অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই পাঠদান, আমলী জিন্দেগী গড়া ও দ্বিনী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তখন হযরতের বয়স মাত্র তিন বছর ছিলো। পরবর্তীতে এ সময়কার কথা স্মরণ করতে যেয়ে শায়খ আবদুল হক রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন: "আমি আমার পিতার নিরাপদ ও মমতাময় কোলো বসে দিবারাত্র লেখাপড়া করেছি।"

শুধু বাহ্যিক শিক্ষা নয়, হযরত মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর পিতা ক্বাদিরীয়া তরিকার একজন শায়খ হিসেবে ছোট থেকেই তাঁর এ প্রিয় সন্তানকে আধ্যাত্মিক সবক দেওয়া

শুরু করেন। তিনি সময় সময় তাঁকে 'ওয়াহদাতুল উজূদ'[১১৮] সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতেন। যদিও শায়খ মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ উচ্চ পর্যায়ের এ তাসাওউফ তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুব একটা তখন বুঝতে অপারগ ছিলেন। তাঁর পিতা যখন এ ব্যাপারটি অনুধাবন করতেন তখন তাঁকে স্বস্থি দান করতে বলতেন: "যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে হয়, তাহলে অবশ্যই হাক্বিক্বাতের সম্মুখস্থ পর্দাসমূহ উন্মোচন করে তোমার অন্তরকে নূরান্বিত করে দেবেন। তুমি তখন ঈমানের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে।"

হযরতের পিতা শায়খ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে আরো বলতেন: "হে আবদুল হক! ওয়াহদাতুল উজূদ নিয়ে সর্বদা চিন্তা-গবেষণা করা তোমার জন্য জরুরি। এ লক্ষ্যর্জনে সুলুকের রাস্তায় তোমাকে ভ্রমণ করতে হবে।"[১১৯]

হযরত মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ নিজেই তাঁর শিশুকালের কথা স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেন:
"আমার পিতা আমাকে বিভিন্ন ওলিআল্লাহর জীবনকথা শুনাতেন। একইসাথে বাহ্যিক আদব-আখলাক শিক্ষা দিতেন। এছাড়া সবসময় আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন। আমার বুঝার সামর্থ অনুযায়ী তাঁর কথাগুলো শ্রবণ করে আমি বেশ আনন্দ অনুভব করতাম। মাঝে মধ্যে তিনি নিরব থাকতেন। আমি বলতাম, আব্বু! আমাকে ওলিদের জীবনগল্প বলুন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যখন আমি দুধের শিশু মাত্র, তখনও পিতার বিভিন্ন কথা আমার স্মরণে থাকতো। এখনও মনে আছে। যেনো এ কথাগুলো আমি গতকাল শুনেছি।"

---

[১১৮] এ দুটো আরবি [وحدت الوجود] শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সত্তার এককত্ব' [Unity of Being -Oxford Arabic Dictionary]। বলা হয়ে থাকে, 'ওয়াহদাতুল উজূদ' -এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ ['ফুতুহাতে মাক্কিয়্যাহ'- কিতাবের লেখক]। তবে 'সুফিতত্ত্বের অধিবিদ্যা' সম্পর্কিত এ বিয়য়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিলেন, হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি এ ব্যাপারে 'মির'আতুল আ'রিফীন' শিরোনামে একটি কিতাব রচনা করেন। তাঁর পুত্র হযরত জাইনুল আবিদীন রাহিমাহুল্লাহর একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। [গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ হয়েছে। ডাউনলোড লিংক: https://vdocuments.site/mirat-ul-arifeen-written-by-hazrat-imam-hussain-razi-allah-anhu.html]- 'ওয়াহদাতুল উজূদ' এবং 'ওয়াহদাতুশ শুহূদ' -এ উভয়টি হচ্ছে সুফি অধিবিদ্যার উচ্চতর তত্ত্ব। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা এ প্রসঙ্গে যথাযথ হবে না। - গ্রন্থকার।
[১১৯] আখবারুল আখইয়ার।

যুগের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে পিতার উপদেশ

হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর যুগে বিদআতী ও পথভ্রষ্ট কিছু আলিমদের আবির্ভাব ঘটে। হযরতের পিতা সাইফুদ্দিন বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করতে যেয়ে স্বীয় পুত্রকে বলেন:

"শরয়ী ব্যাপারে এদের সঙ্গে কোনো মতানৈক্যে জড়িত হবে না। তুমি যদি মনে করো কেউ হক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহলে তার উক্তিকে গ্রহণ করবে। যদি এর ব্যত্যয় দেখো তাহলে, তাকে কয়েকবার পর্যন্ত বুঝিয়ে বলবে। এরপরও যদি তিনি মানতে নারাজ হন তাহলে, তাকে বলো যে, আমার মত ও ধারণা এই-সেই। আপনার মতামত সঠিক হতে পারে। এ ব্যাপারে আর অতিরিক্ত তর্কাতর্কির প্রয়োজন নেই।"[১২০]

শায়খ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আরো বলতেন: "পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়-আসয় নিয়ে যুদ্ধ করার মূল কারণ হচ্ছে, বিজয়ী হয়ে নফসকে খুশি করার ইচ্ছে। এগুলো ধ্বংসাত্মক কাজ। এর ফলে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ও দুশমনী বৃদ্ধি পায়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিয়য়ে আলোচনা-সমালোচনার পেছনে থাকতে হবে সৌহার্দ্যতা ও মুহাব্বাত। কারণ, 'মুহাব্বত জড়িত থাকা ছাড়া এসব ব্যাপারে কোনো ফলপ্রসু সিদ্ধান্ত আসবে না।'"

স্বীয় পিতার এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে তিনি অনেক বাহাস, সংঘাত, বিতআতীদের দৌরাত্ম্যপূর্ণ আচরণ এবং দুষ্কর্ম থেকে নিজেকে সফলভাবে আত্মরক্ষা করেন। কখনো হক্বপন্থা থেকে একবিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হন নি।[১২১]

পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার্জনের সময় মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ অল্প বয়সেই 'বুস্তান' ও 'দিওয়ান'[১২২] কিতাবদ্বয় অধ্যয়ন করেন। সে যুগে ফর্সি কবিতা অধ্যয়ন ছিলো ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। অনেক কিতাব পড়ানো হতো। তবে শায়খ সাইফুদ্দিন স্বীয় পুত্রকে সবগুলো থেকে পাঠ গ্রহণ করতে দেন নি। হযরত

---

[১২০] আখবারুল আখইয়ার।

[121] হায়াতে শায়খ।

[১২২] ফার্সিতে রচিত এ উভয় গ্রন্থের লেখত হচ্ছেন শায়খ সা'দি শিরাজী রাহিমাহুল্লাহ [১২১০-১২৯১ ঈ.]।

মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর তখনই তিনি 'শরহে শামসিয়্যাহ' ও 'শরহে আক্বাঈদ' কিতাবদ্বয় অধ্যয়ন করে নেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সের ভেতরই তিনি ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের সব বই পাঠ করে নিয়েছিলেন।[১২৩]

হযরত শায়খ মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমী রাহিমাহুল্লাহ্ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর ছাত্রজীবন নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে তাঁর নিজের একটি বর্ণনা তুলে ধরেন:
"আমার শিশুকাল থেকেই 'খেলাধূলা' ও 'নিদ্রা' কী জিনিস তা জানতাম না। আমি জানতাম না 'বন্ধুত্ব' ও 'বিশ্রাম' কী ছিলো। কোত্থেকে 'আরাম' আসে এবং 'ভ্রমণ' কাকে বলে আমি জানতাম না।

রাত্রে নিদ্রামগ্ন হওয়া বিশ্রাম নেওয়ার অর্থ কী? প্রেমিকদের জন্য নিদ্রা তো নিষিদ্ধ জিনিস। শুনো! জ্ঞান আহরণের প্রচণ্ড আগ্রহ ও কাজের প্রতি বিরাট উদ্দীপনা হেতু আমি কখনও নির্দিষ্ট সময়ে আহার করি নি কিংবা ঘুমাই নি।

প্রচণ্ড শীতের সময় এবং ভীষণ গরমের মৌসুমেও আমি দিল্লিতে স্থাপিত আমার মাদরাসায় যেতে একটুও পিছপা হই নি। মাদরাসার দূরত্ব ছিলো বাড়ি থেকে দু মাইল। আমি বাড়ি থেকে পায়ে হেটে রওয়ানা হতাম বাদ-ফযর এবং মাদরাসায় যেয়ে উপস্থিত হতাম সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে। ওখানে পৌঁছুয়ে আমি একটি বাতি জ্বালিয়ে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে লেগে যেতাম। ফিরে আসতাম দুপুরের পূর্বে। দুমুটো আহার সেরে পুনরায় মাদরাসায় ফিরে যেতাম।"[১২৪]

ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা

"জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মগজ ও বুদ্ধিকে পবিত্রকরণ। ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে হৃদয়কে কুদৃষ্টি ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচানো।" -একজন সুফির উক্তি

উক্ত কথাটির ওপর শায়খ মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি শিশুকাল থেকেই নিজেকে জ্ঞানার্জন ও ইবাদতের মধ্যে নিমগ্ন রেখেছিলেন।

---

[১২৩] হায়াতে শায়খ।

[১২৪] 'আহলে দিল কি দিল আওয বাতেই' - শায়খ হাবিবুর রহমান আজমী রাহিমাহুল্লাহ।

পুরো জীবনব্যাপী তাঁর এক হস্ত দ্বারা শরীয়তের পানপাত্রকে ধরে রাখেন এবং অপর হাত দ্বারা আঁকড়ে ধরেন প্রভুপ্রেমের কর্ণাস্থিকে। প্রভুপ্রেম মূলত তাঁর পরিবারের একটি বিশেষ ঐতিহ্য ছিলো। স্বীয় পিতা শায়খ সাইফুদ্দিন বুখারী রাহিমাহুল্লাহ অল্প বয়সেই মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর অন্তরে উক্ত সত্য-প্রেমের ফুৎকার দ্বারা হৃদয় ও দিলকে জিন্দেগীর জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে দিয়েছিলেন।

মুর্শিদে কামিল পিতার নির্দেশে অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠতেন। নিমগ্ন হতেন নামায ও জিকির-আজকারে। তিনি নিজেই বলেন:
“ভীষণ কাজের চাপ ও জ্ঞানান্বেষার পেশায় জড়িত থাকাসত্বেও আমি সব সময় নফল নামায, জিকরুল্লাহ, তাহাজ্জুদের সময় জেগে ওঠে আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপ ইত্যাদি আমলের মধ্যে নিয়মিত লেগে থাকতাম। এ অভ্যেস শিশুকাল থেকেই আমার মধ্যে স্থায়ী হয়।”

তিনি আরো বলেন: “ছোটবেলায় তাহাজ্জুদগুজার হওয়ার ফলেই বৃদ্ধ বয়সে এসে আমার আমল-ঈমান আরো বেশি পাকাপুক্ত হয়েছে।”

অপর এক ব্যাপার হচ্ছে, অল্প বয়সেই হযরত মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ, উলামা এবং মাশাইখবৃন্দের কাছে বসতে, তাঁদের বাক্যালাপ শ্রবণ করতে ভালোবাসতেন। বুজুর্গানে দ্বীন তখনই তাঁর মধ্যে এরূপ আগ্রহ দেখে বুঝতে পারতেন, এ ছেলেটি সাধারণ নয়।

শায়খ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৯৮৯ হিজরি] সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার একজন বিখ্যাত সুফি-দরবেশ ছিলেন। তিনি মুলতান থেকে দিল্লিতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি খুব স্বল্পভাষী ব্যক্তি ছিলেন। একান্ত জরুরী না হলে, কারো সাথে কথাই বলতেন না। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ যখন তাঁর নিকট আসতেন তখন তিনি অনেক উপদেশ দিতেন। অর্থাৎ তাঁর সাথে বেশি বেশি কথা বলতেন।[১২৫]

---

১২৫ হায়াতে শায়খ।

হিজাযে ভ্রমণ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তবে একদা তাঁর অন্তরে ভীষণ স্পৃহা জাগ্রত হলো পবিত্র হাজ্জ পালনে যেতে। 'জাদুল মুত্তাক্বিন' নামক স্বরচিত একটি কিতাবে তিনি লিখেন: "হিজরি ৯৯৬ সনে একদিন হঠাৎ আমার অন্তর গয়েবি ইশারা হেতু হিজাযে ভ্রমণে যেতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। পবিত্র এ ভ্রমণে যাত্রা ছাড়া পাগলপ্রায় আমার অত্মরাত্মায় কোনো স্বস্থি মিলছিলো না।"

ভারবর্ষের সমকালীন দ্বীনি অবস্থা

হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ যখন হিজাযে অবস্থান করছিলেন তখন অনাকাঙ্ক্ষিত ভীষণ ক্ষতিকর এক ফিতনা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

দিল্লির সিংহাসনে তখন সম্রাট আকবর [১৫৪২-১৬০৫ ঈ. - শাসনকাল: ১৫৫৬-১৬০৫ ঈ.] অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিজরি ৯৮৩ [১৫৭৫ ঈ.] সনের বরিউস সানী মাসে একটি উপাসনালয় নির্মাণের জন্য সম্রাট নির্শেন প্রদান করেন। মিয়া আবদুল্লাহ নিয়াযী সিরহিন্দীর জায়গায় এটি নির্মিত হলো।

প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র মুসলমান আলিম-উলামাকে এখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। তাঁরা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়-আসয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। সম্রাট আকবরের উদ্দেশ্য ছিলো এসব আলোচনার মাধ্যমে ধর্মীয় ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো। তিনি তখনকার নেতৃস্থানীয় 'উলামা' সম্প্রদায়কে এখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। ধর্মীয় ব্যাপারে সঠিক তত্ত্ব-উপাত্ত বের করাই ছিলো সম্রাটের মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব দুনিয়াদার আলিম এ জায়গাটিকে একটি 'কুস্তি প্রতিযোগিতার' কেন্দ্রে পরিণত করেন।

এ অবস্থা দেখে সম্রাট আকবর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন। তিনি মনে করতের এসব আলিম ছিলেন যুগের ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী। কিন্তু তাঁদের কর্মকাণ্ডে তিনি মর্মাহত হন। ফলে স্বয়ং সম্রাটের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। সম্রাটের দরবারে ইমামদেরকে প্রকাশ্যে উপহাস করা শুরু হলো। ইসলামের মূল

ভিত্তি কুঠারাঘাতে উপড়ে পড়ার উপক্রম হয়ে ওঠলো। সম্রাট আকবর তখন নতুন এক ধর্মমতের উদ্ভব ঘটান। তিনি এর নামকরণ করলেন, 'দ্বীনে ইলাহী'।[১২৬]

হিজাযে অবস্থান

শায়খ আবদুল হক রাহিমাহুল্লাহ ৯৯৬ হিজরি সনে হিজাযে উপনীত হন। তিনি সেখানে দীর্ঘ তিন বছর অবস্থান করেন। সেখানকার প্রখ্যাত শায়খ আবদুল ওয়াহহাব মুত্তাকী রাহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে থেকেই অধিকাংশ সময় কাটান। তাঁর সুহবতে থাকা ছিলো তাঁর জন্য 'দ্বীনি শিক্ষার মুটুক পরার' মতো। হযরত মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে এ সুহবত থেকে আহরিত হয় ইসলামের আরো গভীর জ্ঞান ও ইলমে তাসাওউফের ভিত্তি।

হিজাযে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে হযরত মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ নিজেই লিখেছেন:
"হিজাযের উলামার নিকট আমি শরীয়তের সকল কিতাব ও অন্যান্য বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছি। বিশেষ করে জিকিরের ওপর উচ্চতর সবক নিয়ে উপকার লাভ করেছি যুগের শায়খ হযরত আবদুল ওয়াহহাব মুত্তাকী শাদ্বিলী রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে। তাঁর সুহবত দ্বারা আরো অনেক দিক থেকে সুফল পেয়েছি। বিভিন্ন বিষয় যেমন- দ্বীনের আলোকচ্ছটা বিতরণ প্রক্রিয়া, অনুগ্রহের মাক্বাম, স্তরে স্তরে উন্নীত হওয়া এবং ধর্মপ্রচারণায় অটল থাকা ইত্যাদি সম্পর্কে অমূল্য উপদেশ নিয়ে আমি আমার প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে আসি।"[১২৭]

হিজায থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শাদ্বিলী রাহিমাহুল্লাহর পরামর্শে দিল্লিতে ফিরে আসেন। তিনি প্রাথমিকভাবে

---

[১২৬] হায়াতে শায়খ। উল্লেখ্য যে, সম্রাট আকবরের মূল ধারার ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ঈমান-আখলাক্ব থেকে পথভ্রষ্টতা এবং দ্বীনে ইলাহী প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলো তখনকার কিছু 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' হিসেবে খ্যাত উলামায়ে কিরামের কার্যকলাপ। অতি-দুনিয়াদারিত্ব, বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে আকর্ষণ ও নিজেদের মধ্যে শরীয়ত ও ইসলাহী চেতনার কমতি হেতু সম্রাট আকবরের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম নেয়। আলহামদুলিল্লাহ! এ চরম ধর্মীয় দৈন্যতার যুগে হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি ও শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মতো যুগ সংস্কারক দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ভারববর্ষে তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে সংরক্ষণ ও হকের ওপর পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা এজন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আবারো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। -গ্রন্থকার।

[১২৭] হায়াতে শায়খ, পৃ. ১১০ - আক্বওয়ালে সালাফ (ইংরেজি), খ. ৫ থেকে বঙ্গানুবাদ করে উদ্ধৃত।

ভারবর্ষের দ্বিনী পরিবেশের ওপর এতোই হতাশ ছিলেন যে, ফিরে আসতে তাঁর মন চায় নি। এরপরও, ১০০০ হিজরি সনে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এসময় সম্রাট আকবরের ‘দ্বীনে ইলাহী’ ফিতনা গোড়াপত্তন করে নেয় দিল্লিতে। সমগ্র ভারতের দ্বীনি পরিবেশে নেমে আসে বিপর্যয়। ইসলাম ও ঈমান তখন ‘উলামায়ে সু’ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিগ্রস্থ ছিলো। শরীয়ত ও সুন্নাহর প্রতি অনীহা ছিলো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক বিষয় ছিলো ইসলাম ও এর মাহাত্ম্য নিয়ে স্বয়ং রাজপ্রাসাদে উপহাস ও হাসি-তামাশা করা হতো। নাউযুবিল্লাহ!

সম্রাটের এরূপ পথভ্রষ্টতা স্বভাবতই ভারতের সমগ্র মুসলিম সমাজে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি দ্বীনের সুরক্ষার ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মাদরাসা ও খানক্বাসমূহ এই মারাত্মক বিষতূল্য প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। কিছু দুনিয়াদার সুফি নামধারী ভণ্ডরা শরীয়তকে তরিকত থেকে আলাদা করে দেয়। তারা তাদের অনৈসলামিক আমলসমূহকে ইসলামের শিক্ষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। অন্যকথায় ইসলামের ক্বলব নামে খ্যাত তাসাউফ শাস্ত্রকেও কলুষিত করে তুলে। এসব অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে একদল পথভ্রষ্ট ‘আলিম’ নামধারী লোক বিভিন্ন বাতিল ফতোয়া প্রদান করে বিষয়টিকে আরো মারাত্মক ও ঘোলাটে করে তুলে।

হিজায থেকে ফিরে এসে শায়খ মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ দিল্লিতে পুনরায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এসময় তাঁর মাদরাসা ছিলো উত্তর-ভারতের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে সত্যিকার শরীয়ত ও সুন্নাতের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। হযরত রাহিমাহুল্লাহর দারসে বসে পাঠদান নিতেন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষার্থী।

এসময় শায়খ মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর ‘দিল্লির দারুল উলূম’ ছিলো শরীয়ত ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আমলের সর্বাপেক্ষা বড়ো কেন্দ্র। দ্বীনে ইলাহী দ্বারা প্রভাবান্বিত পথভ্রষ্টতার মেঘমালা এ হক্বানী মাদরাসার চতুর্দিকে ঘিরে ফেলে। ফলে প্রায়ই ঘটতো হক্ব ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ। কিন্তু আল্লাহর মর্জিতে ও হযরতের দৃঢ়তা হেতু দারুল উলূম সর্বদাই নিরাপদ থাকে। অনেক ইতিহাসবিদ কলেছেন, এ সময় তাঁর দৃঢ়তা ও হক্বের ওপর জীবনমরণ আঁকড়ে থাকার ফলেই চতুর্দিকের প্রচণ্ড চাপের মুখেও ‘দারুল উলূম দিল্লি’ তার সঠিক দ্বিনী শিক্ষাদান অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

হযরত রাহিমাহুল্লাহ মাদরাসায় একদল মর্দে-মুহাজিদ পরিশ্রমী শিক্ষক গড়ে তুলেন। এরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে খুব দৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন। হযরত রাহিমাহুল্লাহর একখানা পত্রে এর দিকনির্দেশা পাওয়া যায়। তিনি লিখেন:
"হে ভাইসকল! যারা নিজেদের দায়িত্বে দৃঢ় থাকবেন, শুধু তারাই এই মাদরাসায় কাজ করতে পারবেন। কাজ! কাজ! সকল বাজে কথা থেকে ফারিগ হও! এই রাস্তায় প্রয়োজন শুধু কাজ। এটাই তোমাদের দায়িত্ব।"

কবি বলেন:

দেহ হচ্ছে আল্লাহর কাজের যন্ত্র, একে অকেজো করে রেখো না।
হৃদয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আলয়, একে নিরালা করো না।

তরিকতের সিলসিলা

হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম স্বীয় পিতা শায়খ সাইফুদ্দিন তুর্ক বুখারী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হন। এরপর ৯৮৫ হিজরি সনে তিনি তখনকার ক্বাদিরীয়া তরিকার শায়খ সাইয়্যিদ মূসা জিলানী ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করে সুলুকের উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করেন। হযরত মুহাদ্দিস রাহিমুল্লাহ হযরত মূসা রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে ক্বাদিরীয়া সুফি তরিকায় খিলাফত লাভ করেন। এরপরই তিনি হিজাযে গমন করেছিলেন। সেখানে শায়খ আবদুল ওয়াহহাব মুত্তাক্বী শাদ্বিলী রাহিমাহুল্লাহর হাতেও বাইআত গ্রহণ করে উপকৃত হন। শায়খ মুত্তাক্বী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একই সময় চিশতী, ক্বাদিরী, শাদ্বিলী ও মাদানী সিলসিলার পীর সাহেব। তিনি হযরত আবদুল হক রাহিমাহুল্লাহকে এ চারটি তরিকার খিলাফত প্রদান করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে শায়খ মুত্তাক্বী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে ক্বাদিরীয়া তরিকতের প্রতিষ্ঠাতা গউসুল আজম শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর একটি পুরাতন জুব্বা প্রদান করেন। বিদায়কালে তিনি তাঁর এ বিশেষ খলিফাকে উপদেশ দেন: "কখনো অলস হবে না। ইনশাআল্লাহ! নূরের উজ্জ্বল দীপ্তি এখান [মক্কা মুকাররমা] থেকে তোমার ওপর অব্যাহতভাবে পতিত হতে থাকবে।" শায়খ তাঁকে একথাও বলেন, "আমার দেওয়া বিশেষ জিকির-মুরাক্বাবা নিয়মিত আদায় করবে। আর মনে রাখবে তরিকতের তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রসার ঘটানোও এ রাস্তার পথিকদের জন্য বিশেষ ফলদায়ক

আমল।” হযরত মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তীতে নিজেই একটি পত্রে লিখেন:
“যখন হযরত কুতবুল ওয়াক্বত শায়খ আবদুল ওয়াহহাব মুত্তাক্বী কুদ্দিসা সিররুহু মাশাইখে আজমের বিভিন্ন ধরনের জিকির ও নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি: “এসবের প্রচার-প্রসারও কী আল্লাহর নৈকট্যলাভের কারণ হতে পারে?” তিনি জবাবে বললেন, “কেনো হবে না?” এরপর তিনি আমাকে প্রচার-প্রসারের পদ্ধতি ও স্বরূপ বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, “মনে রেখো, মানুষ কর্তৃক নির্যাতন ও বিরোধিতাকে সহ্য করাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি।”

সমস্যা ও বিপর্যয়ের সময় মানুষের উচিৎ হলো সবর অবলম্বন করা। এছাড়া যখন পারিপার্শ্বিতা নিজের অবস্থার বিপরীতে থাকে তখন সাহস হারাতে নেই। সকল সমস্যার মুকাবিলা করতে হবে ধৈর্য ও সংযমের মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক নূরের প্রচার-প্রসার অব্যাহত রাখতে হবে। হযরত শায়খ মুত্তাক্বী কুদ্দিসা সিররুহ্ বলেন: ‘মানুষ কর্তৃক যখমের শিকার হলেও তোমাকে সবর করতে হবে। আমাদের স্বস্থান পরিত্যাগ করে হিজরত করতে আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। আমরা নিজেদের হৃদয়-মনকে শক্ত রাখতে হবে।’”[১২৮]

হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে

হযরত শায়খ আবদুল হক রাহিমাহুল্লাহ মূলত ক্বাদিরীয়া সিলসিলার শাখ ছিলেন। কিন্তু তিনি যুগের অন্যান্য মাশাইখে আজমের সুহবত লাভেও ধন্য হন। আমরা ইতোমধ্যে হিজাযে অবস্থানকালে শায়খ মুত্তাক্বী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থাকার ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছি।

সে যুগে নকশবন্দিয়া তরিকার একজন যুগশ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখ দিল্লিতে বাস করতেন। তিনি ছিলেন হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এ মহান বুজুর্গের সুহবতেও হযরত মুহাদ্দিস কিছুদিন কাটিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন:
“হিজায থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে আমি হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই। আমি কিছুদিনের জন্য তাঁর সুহবতে থেকে

[১২৮] ‘হায়াতে শায়খ’, হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, পৃ. ১৩৬। সূত্র: ‘আক্বওয়ালে সালাফ’, শায়খ কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী।

যাই। এসময় খাজা সাহেবের তরিকা মুতাবিক জিকির-আজকার ও ধ্যান-মুরাক্বাবা করি। এতে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হই।”[১২৯]

হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ ক্বাদিরীয়া, চিশতিয়া, শাদ্বিলিয়া, মাদানিয়া এবং নকশবন্দিয়া সিলসিলায় খিলাফত লাভ করলেও, তিনি স্বয়ং নিজেকে একজন ক্বাদিরীয়া তরিকার শায়খ হিসেবেই পছন্দ করতেন। নিজের পরিচয় দিতে যেয়ে তিনি বলেন:
নামে: আবদুল হক ইবনে সাইফুদ্দিন। বাসস্থানে: দেহলভী-বুখারী-তুর্কী। মাজহাবে: হানাফি। সুফি তরিকায়: ক্বাদিরী।[১৩০]

তাসাওউফ ও সুফি সম্প্রদায়

হযরত মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ নিজেই তাসাওউফের অনুসারী একজন বড়ো মাপের সুফি শায়খ ছিলেন। তবে তাঁর যুগ, এর পূর্বের যুগ এবং আজকের যুগেও ভণ্ড সুফিদের অভাব দেখা যায় না। এ কারণেই তাসাওউফ ও সুফি সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি একটি ভারসাম্য অবস্থান নেন। তিনি এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটি পত্রের মাধ্যমে:
“মূল কথা হলো, আসল তাসাওউফ হচ্ছে কুরআনের নির্দেশ পালন ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণের মধ্যে নিহীত। অন্য সবই পথভ্রষ্টতা। এটাই মাশাইখে আজমের তাসাওউফ। যারা কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক আমল করে না, তারা সুফি নয়। এদেরকে হাশবিয়াহ এবং বাতিনিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলতে হবে। সত্যিকার সুফিদের অবস্থা এদের থেকে ভিন্ন। তাঁদের মাক্বাম অতি মর্যাদাপূর্ণ ও উচ্চে।”[১৩১]

মূল্যবান বাণী

১. মোগল সালতানাতের অধীনস্থ প্রধান আলিম শায়খ ফরিদ বুখারীর কাছে উপদেশ হিসেবে তিনি লিখেছেন:

(ক) একটি হক্ব সন্ধানী হৃদয়ের অধিকারী হন।
(খ) নিজের আমল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকুন।

---

[১২৯] ‘ওসিয়্যাত’- হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
[১৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
[১৩১] ‘হায়াতে শায়খ’- হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ, পৃ. ২৩১। সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ।

(গ) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখুন।

২. হক্ব অনুসন্ধানের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “সালিক যখন কোনো কিছু পেতে তীব্র আকাঙ্ক্ষী হয়, তখন অন্য কেনো কিছুই তাকে সেটা লাভ করতে আটকে রাখতে পারে না। তার মনের স্পৃহা ও অস্থিরতা এতোই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, জগতের সবাইও যদি তাকে অবগত করে যে, এটা প্রাপ্তি অসম্ভব- তবুও সে থামবে না। সে কারো কথায় ভ্রুক্ষেপই করে না।”[১৩২]

৩. তিনি বলেন, “আমলের ক্ষেত্রে অলসতার কেনো সুযোগ নেই। যাকিছুই তুমি পারো নেক আমল করতে থাকো। কোনো নেক আমলকেই গুরুত্বহীন ভেবো না। আল্লাহ তা’আলা সকল নেক আমলের জন্য বিনিময় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেন:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

-“অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।”” [সূরা যিলযাল : ৭-৮]

সুফি মাশাইখে আজমের জীবনবৃত্তান্ত ও বাণীর প্রভাব

মুসলিহুল উম্মাত হযরত শাহ ওয়াসিউল্লাহ ইলাহাবাদী রাহিমাহুল্লাহ [১৩১২ হি. / ১৮৯৫ ঈ. - ১৩৮৭ হি. / ১৯৬৭ ঈ.] লিখেছেন: “উলামায়ে কিরাম বলেন, কেউ যদি কোনো অলিআল্লাহর সুহবত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার জন্য উচিত হলো ওলিদের বাণী ও জীবনকাহিনী পাঠ করা। এর কারণ হলো তাঁদের বাণী ও জীবনবৃত্তান্ত সুহবত লাভের মতোই বিশেষভাবে উপকারী।”[১৩৩]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: “কেউ যদি সুফি শায়খদের সুহবত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে তাদের সম্পর্কে কাহিনী শ্রবণ করা ও বাণী পাঠ করার মাধ্যমে তার মধ্যে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ ও সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণে আগ্রহ জন্মাবে। ঠিক যেভাবে ওলিদের সুহবতে থেকে অনুরূপ আকর্ষণ

---

[১৩২] এখানে অবশ্যই শায়খ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর মা’রিফাত লাভের আকাঙ্ক্ষার কথাই বর্ণনা করেছেন। -গ্রন্থকার।

[১৩৩] ‘ফাওয়াইদুস সুহবাত’ - হযরত মাওলানা শাহ ওয়াসিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ।

সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাস্তবে, এটাও [তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত শুনা ও পাঠ করা] এক ধরনের [আধ্যাত্মিক নিসবত] সুহবত।"[১৩৪]

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত গ্রন্থাদি

হযরত মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহ সুলেখক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ফার্সি ও আরবি ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ কটি কিতাবের নাম নিচে উল্লেখ করছি।

১. আশাআ'তুল লামাআ'ত - ফার্সি ভাষায় রচিত 'মিশকাতুল মাসাবিহ' -এর শরাহ।
২. মাদারিজুন নুবুওয়াহ।
৩. আদাবুস সালিহীন।
৪. আখবারুল আখইয়ার।
৫. জযবুল কুলূব ইলা দ্বিয়ারুল মাহবূব।
৬. লামাআ'ত আত-তানক্বিহ - আরবি ভাষায় রচিত 'মিশকাতুল মাসাবিহ' -এর শরাহ।
৭. আল-ইকমাল ফী আসমা' আর-রিজাল।
৮. মা তাবাতা বি আস-সুন্নাহ ফী আইয়্যামাস সুন্নাহ।
৯. তারিখে হাক্বী -ইতিহাসগ্রন্থ।
১০. তাকমীলুল ঈমান।
১১. আশুরা।
১২. তায়িদে হানাফি মাজহাব।
১৩. তুহফায়ে ইছনা আশারিয়্যাহ।
১৪. তা'আরুফ ফিকাহ ওয়া তাসাওউফ।
১৫. জুবদাতুল আসরার।
১৬. শহহে ফুতুহুল গায়িব।
১৭. মিলাদে রাসূলে আজম।
১৮. তরিখে মদীনা।
১৯. গউসুল আজম।
২০. আনওয়ারে সুফিয়্যা।

---

[১৩৪] 'আখবারুল আখইয়ার'।

ইন্তিকাল

জ্ঞানের সূর্য- যার নূরে ভারতের দিগন্ত দীর্ঘ ৯৫ বছরব্যাপী আলোকিত হয়েছিল, অবশেষে ২১ রবিউল আওয়াল ১০৫২ হিজরি সনে অস্তমিত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তো সবাই আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁরই নিকট নির্দিষ্ট ক্ষণে ফিরে যাবো। হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ সমাহিত আছেন দিল্লির কুতুব মিনারের নিকটস্থ হাউজ শামসিতে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের নূর দ্বারা আলোকিত করুন। আরো সমুন্নত করুন তাঁর মাক্বামাতকে।

হযরত মাওলানা মিয়া যামুজী মুহাদ্দিসে বুরহানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১০০৮ হিজরি, বুরহানপুর, ভারত।)

তাঁর নাম ছিলো জামাল মুহাম্মদ। তবে তিনি ছোট থেকে মিয়া যামুজী নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো মালিক চান্দ আহমদাবাদী। তিনি একজন পরহেজগার ওলিআল্লাহ ছিলেন। মক্কা মুকাররমায় হজ্জ পালনকালে ইন্তিকাল করেন। কথিত আছে, একই দিন আহমদাবাদে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। লোকটি ছিলো খুব দুষ্ট। এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখলেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে ক্ষমা পেলে? সে বললো, আমার মৃত্যুর দিন মক্কা শরীফে মালিক চান্দ রাহিমাহুল্লাহ মারা যান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াসিলায় আমাকেও ক্ষমা করেছেন। সুবহানাল্লাহ! স্বীয় বান্দাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও মুহাব্বতের সীমা নেই।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত মিয়া যামুজী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয় গুজরাটের আহমদাবাদে। লেখাপড়ার বয়সে পদার্পণ করে তিনি তখনকার গুজরাটের উলামায়ে কিরামের নিকট যেয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরিণত বয়সে তিনি দ্বীনি শিক্ষা লাভ করে একজন আলিম হন।

বাইআত ও খিলাফত

হযরতের পিতা হযরত মালিক চান্দ আহমদাবাদী ছিলেন ক্বাদিরীয়া তরিকার একজন শায়খ। সুতরাং বালিগ হওয়ার পর মিয়া যামুজী স্বীয় পিতার হাতে তরিকতের বাইআত গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন রিয়াজত-মুজাহাদা শেষে তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হন।

বুরহানপুরে অবস্থান

তিনি একদা আহমদাবাদ থেকে চলে যান বুরহানপুরে। বুরহানপুরের তখনকার গভর্ণর ছিলেন শাহ ফারুকী। তিনি হযরতকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সেখানকার মাদরাসায়ে দ্বীনিয়াতে তাঁকে উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেন। হযরত মিয়া যামুজী

রাহিমাহুল্লাহ এ সামরাসায় অত্যন্ত সফলতার সাথে হাদিস ও তাফসিরের পাঠদান করেন দীর্ঘদিন।

তাঁর অভ্যেস ছিলো হাদিস ও তাফসিরের দারসদান সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে শুরু করে ইশার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত রাখা। তিনি কখনও দারস কক্ষের দরোজা দুশমন ও দোস্ত উভয়ের জন্য বন্ধ করেন নি। না তিনি শিক্ষাদানকালে বন্ধুদেরকে দুশমনদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর এসব উদার আচরণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ দারসদানের সুনাম অচিরেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

পবিত্র হাজ্জ পালন

তিনি হিজরি ৯৯৭ সালে পবিত্র হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে বুরহানপুর থেকে যাত্রা করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন একদল খ্যাতিমান বুজুর্গ। এদের মধ্যে শায়খ মাহমুদ ইবনে আবদুল্লাহ গুজরাটী (মৃ. ১০০৪ হি.), শায়খ আবদুল ক্বাদির, মালিক পীর মুহাম্মদ হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মিয়া যামুজী প্রথমে মদীনা মুনুওয়ারায় যেয়ে রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে সালাম পেশ করেন। এরপর মক্কা মুকাররমায় এসে পবিত্র হাজ্জ আদায় করে কিছুদিন পবিত্র নগরীতে অবস্থান করেন। এসময় তিনি হিযাজের একাধিক আলিমের নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন। তাঁদের কাছ থেকে হাদিসের সনদ লাভ করার পর সাথীদের নিয়ে চলে যান বাগদাদে। সেখানে শাইখুত তরিকত গউসুল আজম আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধিতে যেয়ে ভক্তিভরে জিয়ারত করেন। সমাধির খাদিম তাঁকে গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহর একটি জুব্বা উপহার দেন। তিনি এ মুবারক জুব্বা পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। গুজরাটে পৌঁছার পর যুগের সুফি মাশাইখে আজম ছুটে আসেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে। গউসুল আজমের জুব্বাটি এক নজর দেখে সবার মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুভুত হয়। একই সময় সাধারণ মানুষও ছুটে আসে এই দীর্ঘকায় মুবারক জুব্বাটি একনজর দেখতে। এর ফলে হযরত মিয়া যামুজী রাহিমাহুল্লাহর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

হযরত মাসিহুল আউলিয়া রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন: "যখন হযরত শাহ তাহির ইউসুফ ও অন্যান্য সুফি মাশাইখ দীর্ঘ এ জুব্বার কথা জানলেন, তখন

তাঁরা ছুটে আসলেন হযরত মিয়া যামুজীর নিকট। জুব্বাটি দেখে সবাই ভক্তিভরে এতে চুমো খেলেন।”

হযরতের ইন্তিকল

হযরত মাওলানা মিয়া যামুজী মুহদ্দিসে বুরহানপুরী রাহিমাহুল্লাহ ১০০৮ হিজরি সনে বুরহানপুরে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বুরহানপুরের শহরতলীর আদিল পুরাহ নামক স্থানে সমাহিত আছেন।[১৩৫] একই স্থানে শায়িত আছেন তাঁর বিশেষ মুরিদ দরিয়া খান রাওয়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর কবরকে জান্নাতের সুশীতল বাগানে পরিণত করুন। দান করুন তাঁকে উচ্চ মাক্বামাত।

[১৩৫] তারিখে আউলিয়ায়ে বুরহানপুর, পৃ. ৩৩১। সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ।

হযরত শায়খ আলাউল হক ক্বাদিরী বিজয়পুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১০২১ হিজরি, সমাধি- বিজয়পুর, ভারত।)

তিনি ছিলেন হযরত গউসুল আজম সাইয়্যিদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর। সুতরাং তিনি ছিলেন সাইয়্যিদ বংশের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত শায়খ আলাউল হক ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর খুব বেশি জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের একজন ক্বাদিরী শায়খ ছিলেন। জীবনের বৃহত্তর অংশ তিনি ভ্রমণে কাটিয়েছেন। আরব-আজমের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। যুগের অধিকাংশ সুফি শায়খদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের সুহবতে থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হন। তিনি বাহ্যিক দুনিয়ার সবকিছু বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত ও সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমনকি বিবাহের সুন্নাতও আদায় করেন নি। জীবনের অধিকাংশ সময় খিলওয়াত অবলম্বন করে কাটিয়েছেন। ক্বাদিরীয়া তরিকার বিভিন্ন শায়খের নিকট থেকে তিনি তরিকতের দিকনির্দেশা লাভ করেন।

খিলাফত লাভ
হযরত শায়খ আলাউল হক রাহিমাহুল্লাহর পীর সাহেব ছিলেন হযরত শাহ সিবগাতুল্লাহ হুসাইনী মাদানী ভারুচী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি হযরতের কাছ থেকে ক্বাদিরীয়া সিলসিলায় খিলাফত লাভ করেন। একদা তিনি তাঁর এ মুরিদ সম্পর্কে বলেছিলেন, "মীর আলাউল হক একজন দরবেশ। তিনি ইশকে ইলাহীর সায়রে নিমজ্জিত হয়েছেন। কখনও বিয়ের ইচ্ছে পর্যন্ত করেন নি।"

হযরত সিবগাতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ একজন উচ্চ পর্যায়ের মুফাসসিরে কুরআন হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাফসিরের দারসদান করতেন। একদিন তাফসিরে বাইজাবী শরীফের দারসদানকালে তাঁর মুরিদ মীর আলাউল হক রাহিমাহুল্লাহ কক্ষে প্রবেশ করলেন। হযরত সিবগাতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তখন একটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করছিলেন। মীর আলাউল প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন। শাহ সাহেব বললেন, "উত্তরটি আরো স্পষ্ট হওয়া জরুরি।" মীর আলাউল সাহেব এবার পূর্ণাঙ্গ জবাব উপস্থাপন করলেন। সবাই এতে অবাক হলো। কেউ জানতো না হযরত

মীর আলাউল তাফসির বিষয়ে পারদর্শী। শায়খ সিবগাতুল্লাহ প্রশ্ন করলেন, "হে মীর আলাউল! তুমি কী তাফসির শাস্ত্রের ওপর লেখাপড়া করেছিলে?" তিনি জবাব দিলেন, "হাঁ, তবে কেউ জানে না!" উল্লেখ্য হযরত আলাউল নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। তার আসল পরিচয় অনেকেই জানতে পারে নি।

মালফুযাতের লেখক বলেন, শায়খ মীর আলাউল হক বিয়জপুরী রাহিমাহুল্লাহ হযরত সিবগাতুল্লাহ ভারুচী রাহিমাহুল্লাহর নিকট মুরিদ হওয়ার মাত্র ১ সপ্তাহ পরে খিলাফত লাভ করেন। শাহ সাহেবের সুনজর ও আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে শায়খ মীর আলাউল হক রাহিমাহুল্লাহ ইলমে লাদুনী প্রাপ্ত হয়ে বেলায়েতের উচ্চ মাক্বামে আরোহণ করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বীয় মা'রিফাত দান করেন।

ইন্তিকাল

মজযূব ইলাল্লাহ শায়খ মীর আলাউল হক ক্বাদিরী বিজয়পুরী রাহমাতুল্লাহি আলইহি ১০২১ হিজরি সনে এ মায়াবী পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাক্বামে। তিনি বিজয়পুরেই সমাহিত আছেন।[১৩৬]

[১৩৬] মাহবুবুত তাওয়ারিখ, খ. ৯, পৃ. ৪৯৭।

হযরত শায়খ নাসির খান গুজরাটী বুরহানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- হিজরি একাদশ শতকের শুরু, সমাধি- বুরহানপুর, ভারত।)

তাঁর নাম ছিলো শায়খ নাসির খান। পিতার নাম কুরাইশ খান গুজরাটী। তাঁর পূর্বপুরুষরা সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতেন। খান পরিবার গুজরাটের একটি স্থায়ী বংশ ছিলো।

জন্ম ও শিক্ষা

গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদে হযরত নাসির খান জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় আলিমদের নিকট তিনি দ্বীন ও দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর পরিবারের ঐতিহ্য মুতাবিক সেনাবাহিনীতের যোগ দেন।

বুরহানপুরে আগমন

মোগল সম্রাট আকবর ৯৮১ হিজরি / ১৫৭৩ সনে গুজরাট দখল করেন। এসময় হযরতের পরিবার আহমদাবাদ ছেড়ে বুরহানপুরে চলে আসেন। এখানেই তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

বাইআত গ্রহণ ও খিলাফত লাভ

বুরহানপুরে আগমনের পর হযরত শায়খ নাসির খান রাহিমাহুল্লাহ সেনাবাহিনীর চাকুরি ছেড়ে দেন। এসময় তাঁর মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয় এবং সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর মধ্যে এতোই পরিবর্তন সাধিত হলো যে, খিলওয়াত অবলম্বন ও আল্লাহর ধ্যানে তিনি সর্বদা সময় কাটাতেন, দুনিয়াবী কোনো কাজকর্ম পর্যন্ত করতেন না। একমাত্র আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে থাকেন।

এ অবস্থায় হযরত নাসির খান রাহিমাহুল্লাহর জীবনে অভাব অনটন ও দুঃখ দুর্দশা নেমে আসলো। কিন্তু তিনি এতেই যেনো আত্মিকভাবে বেশি সুখ-সাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন। আকাঙ্ক্ষা ও লোভ তাঁর মধ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়। একমাত্র প্রাণরক্ষার জন্য যেটুকু রিজিক প্রয়োজন তা-ই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। আর

আল্লাহ তা’আলা তো সবাইকেই রিজিক দান করেছেন- সে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেনো।

নিঃস্ব, ভোখা-নাঙ্গা, সংসারত্যাগী দরবেশ হিসেবে অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক অদৃশ্য ইশারায় হযরত নাসির খান রাহিমাহুল্লাহ একদা বুরহানপুরে বসবাসরত হযরত মিয়া যামুজী মুহাদ্দিসে বুরহানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হলেন। বললেন, “হযরত! এ অধমকে আপনার খাদিম হিসেবে গ্রহণ করে ধন্য করুন।” প্রথম দেখাতেই মিয়া যামুজী রাহিমাহুল্লাহ হযরত নাসির খানের প্রতি মুহাব্বাতের আকর্ষণ অনুভব করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “মুরিদ হতে চাও?”। খান সাহেব জবাব দিলেন, “আপনার অনুমতি থাকলে এটাই আমার ইচ্ছে।” এরপর হযরত যামুজী তাঁকে মুরিদ করে ক্বাদীরিয়া তরিকার নিয়মতান্ত্রিক জিকির-তাসবিহাতের সবক দিলেন। হযরত নাসির খান দীর্ঘদিন প্রিয় মুর্শিদের সুহবতে থেকে নির্দেশ মুতাবিক জিকির-মুরাক্বাবা-মুজাহাদা করে সুলুকের রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে একদিন হযরত মিয়া যামুজী মুহাদ্দিসে বুরহানপুরী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ প্রিয় মুরিদ হযরত নাসির খান রাহিমাহুল্লাহকে খিলাফত দান করলেন।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ

শায়খ মিয়া যামুজী রাহিমাহুল্লাহ হযরত নাসির খান রাহিমাহুল্লাহকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর গুণাগুণ ও চরিত্র-মাধুর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। একদিন বললেন, “বাবা নাসির! তোমার সঙ্গে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক আরো পাকাপুক্ত করতে চাই। আমি তোমার হাতে আমার মেয়েকে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে তুলে দিতে চাই। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী বলো?” স্বীয় শায়খের আকাঙ্ক্ষা মূলত মুরিদের নিকট নির্দেশমূলক ধরে নিতে হয়। তিনি তাই কিছু না বলে চুপ থাকলেন। আর চুপ থাকা মানেই সম্মতি। সুতরাং বিয়ের পর হযরত নাসির খান রাহিমাহুল্লাহ হযরতের বাড়িতেই বসবাস করতে থাকেন।

অভ্যেস ও চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত নাসির খান গুজরাটী রাহিমাহুল্লাহ সর্বদাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে জীবন কাটিয়েছেন। তবে তাঁর অভ্যেস ছিলো গ্রন্থপাঠের। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অধিকাংশ কিতাব তিনি পাঠ করেছিলেন। বিশেষকরে ‘ইহইয়া

উলূমুদ্দিন" কিতাবখানা তাঁর নিকট প্রিয় ছিলো। তিনি নিজের অভ্যন্তরীণ চিন্তা-চেতনা আমল-আখলাকের সাথে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়াদির সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে দেখতেন। মিল না থাকলে, চেষ্টা করতেন মিল করার। দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ কিংবা লোভ তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারে নি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জিকির-ইবাদত ছিলো তাঁর বেঁচে থাকার খোরাক।

ইন্তিকাল

হিজরি একাদশ শতকের শুরুতে হযরত নাসির খান গুজরাটী বুরহানপুরী রাহিমাহুল্লাহ বুরহানপুরেই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে তাঁর চিরকাঙ্ক্ষিত মাওলার দরবারে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বুরহানপুরে সমাহিত আছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি হযরত নাসির খান রাহিমাহুল্লাহর মর্যাদা আরো বুলন্দ করুন।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে শাহ ওয়াজিউদ্দিন গুজরাটী রাহিমাহুল্লাহর ভাই শায়খ মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন মন্তব্য করেন:
"আজ শায়খ 'আলী মুত্তাকী' এ বসুন্দরার কোল থেকে বিদায় হয়েছেন। চলে গেছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ধর্মানুরাগের মাটির গৃহ কবরে।"

উক্ত বক্তব্য থেকেই বুঝা যায় হযরত শায়খ নাসির খান গুজরাটী রাহিমাহুল্লাহর ইলম, আমল, তাওয়াক্কুল ও তাকওয়া কোন্ পর্যায়ের ছিলো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দান করুণ আমাদের পূর্ববর্তী আপনার সুফি-দরবেশ ও প্রিয়জনদের পুণ্য আমল-আখলাক্ব অনুসরণ করার সৌভাগ্য। সব ক্ষমতা ও উত্তম আমলের অনুপ্রেরণার উসৎ একমাত্র মহাপ্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা।

হযরত সাইয়্যিদ শাহ মাহমুদ ক্বাদিরী বালাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১১০৫ হিজরি, সমাধি- বালাপুর, মহারাষ্ট্র, ভারত।)

তাঁর নাম ছিলো সাইয়্যিদ মাহমুদ ক্বাদিরী। পিতার নাম সাইয়্যিদ হালিম ক্বাদিরী। তাঁদের মূল বাসস্থান ছিলো ইরাকের বাগদাদে।

আদি বাসস্থান থেকে হিজরত

হযরত শাহ মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর পিতা ও পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিলো বাগদাদে। পিতা সাইয়্যিদ হালিম শাহ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ খিলাফতপ্রাপ্ত ক্বাদিরীয়া সুফি দরবেশ ছিলেন। দ্বীনের দাওয়াত ও তাসাওউফের প্রসার-প্রচারে তিনি স্বীয় বাসস্থান বাগদাদ থেকে ভারতের গুজরাটে স্বপরিবারে হিজরত করেন। এরপর ভারুচ জিলাধীন আংক্লেশওয়ার নামক স্থানে চলে আসেন। এ শহরকেই স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিজের শহর হিসেবে বেছে নেন। হযরত ঠিক কখন বাগদাদ থেকে এসেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হয়, একাদশ হিজরি শতকের শুরুর দিকে তিনি এসেছিলেন। বাকী জীবন এ শহরে কাটিয়ে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর এই আংক্লেশওয়ারেই অবস্থিত।

বালাপুরে গমন

সাইয়্যিদ মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন স্বীয় পিতার সুযোগ্য খলিফা। একদিন তাঁর পিতা তাঁকে নির্দেশ দিলেন: “বাবা মাহমুদ! আংক্লেশওয়ার তোমার স্থায়ী কর্মস্থল নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে যেতে হবে মহারাষ্ট্রের বালাপুরে। সেখানে যেয়ে ইলমে শরীয়ত ও তাসাওউফের প্রচার-প্রসার ঘটানো তোমার মূল মিশন। সেখানে স্থাপন করবে আমাদের সিলসিলার একটি খানক্বাহ। এ খানক্বায় মানুষ দলে দলে এসে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করবে। উপকৃত হবে দুনিয়া-আখিরাতে।”

পিতা ও মুর্শিদ হযরত হালিম শাহ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশে হযরত মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ চলে আসেন বালাপুরে। তিনি এ শহরকেই নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। পিতার নির্দেশ মুতাবিক শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ভেন্স নদীর তীরে খানক্বায়ে ক্বাদিরীয়ার গোড়াপত্তন করেন। এ খানক্বাহ থেকেই

দীর্ঘদিন যাবৎ আধ্যাত্মিক নূরের ঔজ্জ্বল্য ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তম গুণাবলী

হযরত সাইয়্যিদ শাহ মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম গুণাবলীর অধিকারী করেছিলেন। তিনি একদিকে উচ্চ পর্যায়ের তরিকতের শায়খ ছিলেন। অপরদিকে শরীয়তের একজন ফকীহ হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিলো। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ- এ উভয় ধরনের ইলম থাকায় অসংখ্য মানুষ তার সুহবত থেকে উপকৃত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় অচিরেই বালাপুরের খানক্বায়ে ক্বাদিরীয়ার সুনাম সমগ্র ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। হযরতের মাধ্যমে অসংখ্য কারামত প্রকাশ হয়েছিলো বলে আজো জনশ্রুতি বিদ্যমান। তাঁর ফিরাসাত ও বুদ্ধিমত্তা দেখে যুগের অনেক বড়ো বড়ো শায়খও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের[১৩৭] খানক্বায় আগমন

হযরতের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের মুগল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সম্রাট আওরঙ্গজেব রাহিমাহুল্লাহ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোনো এক সময় সম্রাট বালাপুরের ভেন্স নদীর তীরে অবস্থিত নবাব ইসমাঈল খান কেল্লায় আগমন করেন। ফলে সে অঞ্চলটির নামকরণ সম্রাটের সম্মানে 'আওরঙ্গপুর' করা হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন জানতে পারলেন যে, বালাপুরে একজন সুফি-দরবেশ বসবাস করছেন, যাঁর সুখ্যাতি সমগ্র ভারবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের। এ মর্মে তিনি হযরত সায়্যিদ শাহ মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ বরাবরে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। তিনি এতে লিখেন:
"হযরত! আমি আপনার দরবারে এসে পদযুগলে চুমো খেতে অনুমতি কামনা করছি।"

[১৩৭] সম্রাট শাহজাহানের [১৫৯২-১৬৬৬ ঈ. - রাজত্বকাল: ১৬২৮-১৬৫৮ ঈ.] পুত্র আওরঙ্গজেব আলমগীর রাহিমাহুল্লাহ [১৬১৮-১৭০৭ ঈ.] একজন ওলিআল্লাহ মুগল সম্রাট ছিলেন। দীর্ঘ ৪৯ বছর [১৬৫৮-১৭০৭ ঈ.] তিনি সমগ্র ভারবতবর্ষ শাসন করেন। তাঁরই নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিখ্যাত 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরী' কিবাতখানা প্রণীত হয়েছিল। আরবি ভাষার এ কিতাবটি সংকলন করেন ৫০০ জন উচ্চ পর্যায়ের আলিম। -গ্রন্থকার

'পদযুগলে চুমো খাওয়া'- এ কথাটি হযরত ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর পছন্দ হলো না। তিনি উত্তরে লিখলেন: "হে মহামতি সম্রাট! খানক্বায় এসে আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে আমি অপারগ। তবে আপনি চাইলে আসতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সম্মুখে হাজির হতে পারবো না! বরং একটি পর্দার আড়ালে থেকে আমার পা দুটো বাইরে রাখবো!"

হযরত ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর এ কথাটি পাঠ করে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারো আরো বেশি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। কাল-বিলম্ব না করে তিনি চলে আসলেন বালাপুরের খানক্বায়ে ক্বাদিরীয়ায়। সাক্ষাতের সময় দেখা গেলো সত্যিই হযরত সায়্যিদ শাহ মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ একটি দীর্ঘ পর্দার আড়ালে থেকে শুধুমাত্র নিজের পাযুগল উম্মুক্ত রেখেছেন!

অবশ্য এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। হযরত শায়খ হাসিমুখে সম্রাটকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এ সাক্ষাতে সম্রাট আওরঙ্গজেব এমন বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, বিদায়ের পূর্বে তিনি শায়খকে একখানা সীলযুক্ত দলিল প্রদান করলেন। এতে ৯টি গ্রামসহ বিরাট এক ভূখণ্ড হযরতের নামে লাখেরাজ হিসেবে দান করা হয়েছিল। হযরত মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ কিন্তু এ সম্পত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। সম্রাট বার বার অনুরোধ করে হযরতকে রাজী করতে পারলেন না। অবশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেব এ দলিলখানা স্থানীয় একটি মসজিদে রেখে যান।

জানা যায়, যতোদিন হযরত মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ জীবিত ছিলেন, ততোদিন তিনি এ দলিলটি স্পর্শই করেন নি। পরবর্তীতে হযরতের নামে দানকৃত এ ভূমিকে ভূমিদস্যুরা ছিনিয়ে নিতে মরিয়াহয়ে ওঠে। ভূমির ওপর হযরত মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর অনাগ্রহতাই ছিলো এর কারণ। হযরতের এক অধঃস্তন বংশধর শায়খ সাইয়্যিদ সাইফুল্লাহ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ অবশেষে যাকিছু ভূমি অবশিষ্ট ছিলো তা দখল করেন। এতে তিনটি গ্রামসহ মোট ৪,০০০ একর জমি অবশিষ্ট ছিলো।

পবিত্র কুরআনের একটি দুষ্প্রাপ্য অনুলিপি

হযরত মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহ যখন পিতার নির্দেশে আংক্লেশওয়ার ছেড়ে বালাপুরের উদ্দেশ্যে গমন করেন, তখন তিনি সাথে নিয়ে আসেন কুরআন শরীফের একটি দুষ্প্রাপ্য হাতের লিখা পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি। এ জিলদ্ কুরআন শরীফের বৈশিষ্ট্য

ছিলো এই যে, প্রত্যেক পারা একটিমাত্র পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং পুরো কুরআন শরীফ লিখিত হয় মাত্র ৩০টি পৃষ্ঠার মধ্যে। ইতোমধ্যে বা পরবর্তীতে পবিত্র কালামুল্লাহর ত্রিশ পারা ত্রিশ পৃষ্ঠায় কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন বলে জানা নেই। আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার হলো এ জিলদ্ কুরআন শরীফ শত শত বছর পূর্বে লিখিত হলেও, আজো এর প্রতিটি পত্রের অনুলিপি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দেখায়। মনে হয় যেনো, কেউ এটি এইমাত্র লিখেছেন। সুবহানাল্লাহ! এছাড়া এর প্রতিটি লাইন শুরু হয়েছে 'আলিফ' অক্ষর দ্বারা। আরোও বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম লাইন ও প্রত্যেক সূরার প্রথম লাইন লিখিত হয়েছে লাল কালি দ্বারা। অনুরূপ 'الله' শব্দ ও আয়াত সংখ্যা লাল কালি দ্বারা লেখা হয়েছে।

হযরতের প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ থেকে দ্বীনের খিদমাত

হযরত মাহমুদ ক্বাদিরী রাহিমাহুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত বালাপুরের খানক্বাহ শরীফে দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম তাঁর ইন্তিকালের পরও দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে হযরতের ১৩তম অধঃস্তন পুরুষ খান বাহাদুর সাহেবের তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় খানক্বাহ শরীফে দ্বীনি কার্যকলাপ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এসময় অসংখ্য অমুসলিম খানক্বায় এসে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

জানা যায়, ঈসায়ী ১৯২০ সালে করিম বকশ নামক একজন মজযূব ওলিআল্লাহ বালাপুরের খানক্বায় এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খানক্বায় অবস্থান করে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ঈসায়ী ১৯৫৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেউই জানতো না এ মজযূব অলিআল্লাহ কোত্থেকে এসেছিলেন। তাঁর এক মুরিদ ও খাদিম বলেন, মৃত্যুর পূর্বে শায়খ করিম বকশ রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেছেন, তাঁর জন্মস্থান ছিলো জাযিরাতুল আরবের ইয়ামনে।

খানক্বাহ শরীফে জনগণের জন্য উন্মুক্ত একটি সরাইখানা [রান্নাঘর] ১৯৬৪ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত বহাল ছিলো। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।

হযরতের ইন্তিকাল

হযরত সাইয়্যিদ মাহমুদ ক্বাদিরী বালাপুরী রাহিমাহুল্লাহর সঠিক জন্মতারিখ জানা যায় নি। তবে তিনি যে, হিজরি একাদশ শতকের কোনো এক বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এছাড়া তিনি যে ১১০৫ সালে জীবিত

ছিলেন এবং ঐ বছরই কেনো এক মাসে ইন্তিকাল করেন এ ব্যাপারে বালাপুরের মানুষের মধ্যে ঐক্যমত পাওয়া যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বালাপুরের খানক্বাহ শরীফের পাশেই সমাহিত আছেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর সমাধিস্থলে এসে জিয়ারত করে থাকেন। রূহানী ফায়েজ দ্বারা উপকৃত হন। হে আল্লাহ! আপনার এ উচ্চ পর্যায়ের সুফি ওলিকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর এটুকু আলোচনা পাঠ দ্বারা, আমাদেরকে তাঁর নেক আমলের যেটুকু সম্ভব অনুসরণ করার তাওফিক দিন। কবুল করুন আমাদের সকল উত্তম প্রচেষ্টাকে।

হযরত আবদুল ক্বাদির সানী হায়দরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১১৫৯ হিজরি, সমাধি- হায়দরাবাদ, ভারত।)

তাঁর নাম ছিলো আবদুল ক্বাদির। উপাধি ছিলো শাহ সাহেব। হযরতের পিতার নাম ছিলো শায়খ সাইয়্যিদ সা'দউদ্দিন।

চারিচিত্র বৈশিষ্ট্য

হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির সানী ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাশীল ক্বাদিরী শায়খ। তাঁর সম্পর্কে 'আনওয়ারুল আখইয়ার' কিতাবের লেখক উল্লেখ করেন, তিনি ছিলেন তখনকার হায়দরাবাদের উচ্চ পর্যায়ের কজন মাশাইখে আজমের মধ্যে একজন। হযরতের পবিত্রতা অবলম্বন ও পরহেজগারী সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিলেন।

লোকমুখে শুনা যায়, হযরত আবদুল ক্বাদির সানী রাহিমাহুল্লাহ বাদ-ইশা থেকে ফযরের ওয়াক্ত পর্যন্ত জিকির-আজকার ও অন্যান্য নফল ইবাদতের মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন। এছাড়া তাঁর জিহ্বা সব সময় দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত থাকতো। হায়দরাবাদের অসংখ্য গরীব এবং অনেক ধনী লোকও তাঁর মুরিদ ছিলেন। যখনই নবাব আসিফ জাহান মাহরুম হায়দরাবাদে আসতেন, হযরত আবদুল ক্বাদির রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে অন্তত একবার সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর নিকট দুআ চাইতেন। 'লাতাইফে ক্বাদিরীয়া' গ্রন্থের লেখক লিখেন, শাহ সাহেব যখন ৬০ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর পিতা সিইয়্যিদ সা'দউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর পিতার মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্থলাভিষিক্ত হন।

হযরত খিজির আলইহিসসালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ

হযরত শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমার বয়স যখন মাত্র ৮ বছর তখন হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি আমাকে কালো চিনি দিয়ে সম্মুখ থেকে গায়েব হয়ে যান। আমি তাঁকে দেখে ভীষণভাবে ভয় পাই। আমার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর আসে। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।" হযরতের মাতা ব্যাপারটি হযরত মুহিউদ্দীন সানী রাহিমাহুল্লাহকে অবগত করেন। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা করো না। তোমার সন্তান একদিন কুতুবের মর্যাদায় ভূষিত হবেন। কালো চিনি

হচ্ছে এর নিদর্শন। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন খিজির আলাইহিসসালাম।”

হযরত মুহিউদ্দীন সানী রাহিমাহুল্ললাহ আরো বললেন, “এই কালো চিনি ছেলেকে খাওয়াবে।” এরপর তিনি ছেলের প্রতি নজর দিলেন। দুআ করলেন। কিছুদিন পরই বালক আবদুল ক্বাদির সুস্থ হয়ে উঠলেন। পরে বেশ কিছুদিন তিনি হযরত মুহিউদ্দীন সানী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থাকলেন। এসময় শরীয়ত ও তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন।

হযরতের মাধ্যমে অনেক কারামতের ঘটনা ঘটেছে। তিনি ছিলেন অনেক বড়ো একজন ওলিআল্লাহ। মীর মুহাম্মদ ফাযিল তাঁর ‘পাঞ্জেগঞ্জ’ নামক কিতাবে উল্লেখ করেন, হায়দরাবাদের হযরত মুফতি কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহ লোকদেরকে বলতেন: “তোমরা যদি মাহবুবে সুবাহানীকে [গউসুল আজম আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ] দেখতে ইচ্ছুক হও, তাহলে তাঁকে [শাহ সাহেব] দেখে নাও।” এ মন্তব্য প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তাঁকে ‘আবদুল ক্বাদির সানী’ [দ্বিতীয় আবদুল ক্বাদির] হিসেবে লোকজন সম্বোধন করতে থাকে।

হযরত শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহর সমকালীন আরেক ওলির নাম ছিলো শাহ দরবেশ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ। বাস্তবে তিনি ছিলেন শাহ শাহেবের আপন চাচাতো ভাই। তাঁদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। একে অন্যকে খুব বেশি মুহাব্বত করতেন।

খুলাফাবৃন্দ ও সন্তানাদি

হযরত আবদুল ক্বাদির সানী হায়দরাবাদী রাহিমাহুল্লাহর খুলাফাবৃন্দের সংখ্যা ছিলো অনেক। কেনো কোনো মতে তাঁদের সংখ্যা ছিলো ৫০ জন। হযরতের ৪ জন পুত্রসন্তানও ছিলেন। এরা হলেন:

১. সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আহমদ রাহিমাহুল্লাহ।

২. সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ রাহিমাহুল্লাহ।

৩. সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলী রাহিমাহুল্লাহ।

৪. সাইয়্যিদ সা’দউদ্দিন মুহাম্মদ সানী রাহিমাহুল্লাহ। আল্লাহ তা’আলা সবাইকে জান্নাতবাসী করুন।

হযরত শাহ সাহেবের ইন্তিকাল

সবাই একদিন যেতে হবে মাটির ঘরে। ইহলোকে আগমন করলে পুনরায় পরলোকে যেতেই হবে- এটাই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার বিধান। প্রশ্ন শুধু এটা- যেভাবে পবিত্র-নিষ্পাপ অবস্থায় এসেছি, সেভাবে পুনরায় ফিরে যেতে পারবো কী না? হায়! কী জানি কোন্ অবস্থায় কতো গুনাহর বোঝা কাঁধে নিয়ে মা'বুদের সম্মুখে ফিরে যাবো! হে আল্লাহ! একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আপনারই প্রিয় ওলিদের জীবনীগ্রন্থাদি লেখার ওয়াসিলায় এ অধম গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিন। দয়া করে ক্ষমা করুন। গুনাহ-খাতা নিয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে যে ভীষণ ভয় পাচ্ছি গো, প্রভু!

হযরত শাহ কুতুব সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মা'বুদের দরবারে ২৭ জিলহাজ্জ ১১৫৯ হিজরি সনে প্রত্যাবর্তন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরতকে হায়দরাবাদে তাঁর পূর্বপুরুষদের কবরস্থানেই সমাহিত করা হয়েছে। হে আল্লাহ! কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী তাঁর বিশ্রামাগার কবরকে নূরান্বিত করে রাখুন।

হযরত শায়খ সাইয়্যিদ কুতবে আলম ইবনে সাঈদ মিরান বুখারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু- ১১৬৩ হিজরি, সামধি- হায়দরাবাদ, ভারত।)

তাঁর বাসস্থান ছিলো হায়দরাবাদের ইউসুফ চৌক মহল্লায়। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন আলিম। বক্তা হিসেবেও তাঁর দক্ষতা ছিলো অতুলনীয়। হায়দরাবাদের তখনকার নবাব নিযামুল মুলক আসিফ জাহান বাহাদুর হযরত সাইয়্যিদ কুতবে আলম ইবনে সাঈদ মিরান বুখারি রাহিমাহুল্লাহকে খুব সম্মান করতেন। তিনি হযরতকে শহরের প্রধান মুফতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন। হানাফি মাজহাব মুতাবিক যে কেনো শরয়ী ফাতওয়া দানে তিনি ছিলেন সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য আলিম। সমকালীন উলামায়ে কিরাম তাঁকে শরয়ী ব্যাপারে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তাসাওউফ শাস্ত্রেও যুগের শায়খ ছিলেন তিনি। ‘ওয়াহদাতুল উজূদ’ তত্ত্বে তাঁর মতো জ্ঞানবান ব্যক্তি তখন খুব কমই ছিলেন। তিনি গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত ক্বাদিরীয়া সিলসিলার শায়খ ছিলেন।

খিলাফত লাভ

হযরত কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পিতা হযরত সাইয়্যিদ মিরান বুখারি রাহিমাহুল্লাহর সুযোগ্য তরিকতের খলিফা ছিলেন। সাইয়্যিদ মিরান বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হায়দরাবাদের একজন স্বনামধন্য সুফি-দরবেশ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কুতবে আলম রাহিমাহুল্লাহ স্থলাভিষিক্ত হন।

কুতবে আলম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর মাতা ছিলেন যুগের একজন প্রসিদ্ধ ওলি শায়খ বাহাউদ্দিন বাযান বুরহানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কন্যাসন্তান।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত কুতবে আলম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ সব সময় দারসদানে ব্যস্ত থাকতেন। এছাড়া তাঁর মুরিদানকে সর্বদা নিক-নির্দেশা দান করতেন। তাঁর কণ্ঠের আওয়াজ ছিলো উঁচু এবং বাগ্মীতায় তাঁর মতো সুবক্তা তখন খুব অল্পজনই ছিলেন।

হযরতের পরহেজগারী, তপশ্চর্যা, সংযম ও মিতাচার ছিলো অতুলনীয়। তিনি ছিলেন সুফিতত্ত্বে পারদর্শী। তাসাওউফ ও পীর-মুরিদী যে মূলত শরীয়তের অভ্যন্তরস্থ ব্যাপার তা তিনি খুব সূচারুরূপে সবাইকে বুঝাতে অত্যন্ত দক্ষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া স্বীয় তরিকাভুক্ত অতীতের ক্বাদিরীয়া সুফি-দরবেশদের জীবনালোচনা

করতেন খুব সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায়। হায়দরাবাদে তাঁর ছাত্রসংখ্যা তিন শতাধিক ছিলেন।

হযরত বুখারি রাহিমাহুল্লাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো অনন্যসাধারণ। শিষ্টতা, বিনয় ও সৎসাহসে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শহরের প্রায় সকল ওলিআল্লাহদের সন্তানাদি তাঁর সুহবতে থেকে উপকৃত হতেন।

'পাঞ্জগঞ্জ' কিতাবের লেখক কাজি মুহাম্মদ ফাযিল রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "শায়খ বুখারি রাহিমাহুল্লাহর ছাত্রদেরকে দারসদান করতেন ফযরের নামাজের পর থেকে দুপুর পর্যন্ত। এসময় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা ছিলো নিষিদ্ধ। শহরের ওলিআল্লাহ ও পরহেজগার আলিম-উলামা এবং মুসলমানদের ছেলেসন্তানরা তাঁর দারসে যোগ দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সনদ লাভ করতো। যেসব কিতাব অধ্যয়ন করা হতো তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কটি হলো: লাওয়া'ই, লামা'আত, ফুসূস ইত্যাদি।

হযরতের ইন্তিকাল

সবাইকে জন্ম নেওয়ার পরই প্রতিটি ক্ষণ একটি অদৃশ্য ভ্রমণের মধ্যে কাটাতে হয়। এ ভ্রমণের গন্তব্যস্থল হচ্ছে কবর। এ ভ্রমণের ব্যাপারে কিন্তু আমাদের অনেকেই সম্পূর্ণ গাফিল! বাস্তবে আলমে বরযখের ঐ কবরটিতে ঠিক কোন সময় যে পৌঁছুতে হবে তা-ও আমরা জানি না। তবে একদিন যে সেদিকে পাড়ি জমাতে হবে তা নিশ্চিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ওলিদের মতো পাকসাফ করে গুনাখাতা থেকে ফানাহ দান করে এই চিরসত্য ভ্রমণের গন্তব্যে নিয়ে পৌঁছুয়ে দিন- এই আবদার তাঁর পবিত্র দরবারে।

আমাদের আলোচিত মহাত্মন ওলিআল্লাহ শায়খ সাইয়্যিদ কুতবে আলম ইবনে সাইয়্যিদ মিরান বুখারি রাহিমাহুল্লাহ আলমে বরযখের দিকে পাড়ি জমান ৪ শাওয়াল ১১৬৩ হিজরি সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দীর্ঘ হায়াতে তায়্যিবাহ লাভ করেন। এক হিসেব মতে তিনি ১৫০ বছর এ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন।[১৩৮] তাঁর আলমে বরযখের বিশ্রামস্থল হায়দরাবাদের চৌক মসজিদের পাশেই অবস্থিত। হে আল্লাহ! আপনার এই বিশিষ্ট ওলির সমাধিকে নূরান্বিত করুন। আরো বুলন্দ করুন তাঁর মাক্বামাতকে।

---

[১৩৮] 'মাহবুবুত তাওয়ারিখ', খ, ২, পৃ. ৭০৭। সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ- শায়খ কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী।

হযরত পীর মুহাম্মদ শাহ আহমদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১১৬৩ হিজরি, সমাধি- আহমদাবাদ, গুজরাট, ভারত।)

তিনি ছিলেন গউসুল আজম শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষগণ বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। অনেক আগে তাঁদের কেউ একজন স্বপরিবারে বাগদাদ থেকে চলে আসেন ভারতের বিজয়পুরে। এখানেই তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ মুবারক বংশেই ১১০০ হিজরি সনে হযরত পীর মুহাম্মদ শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয়।

ইয়াতিম বেশে

হযরতের পিতার নাম ছিলো, আমিনুদ্দীন। তিনি পীর মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর জন্মের কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকাল করেন। সুতরাং পীর সাহেব ইয়াতিম হয়ে এ ধরার কোলো আগমন করেন। শুধু তাই নয় অল্প বয়েসে তিনি তাঁর মাতাকেও হারান। পিতা-মাতা হারা মুহাম্মদ শাহ সাহেবের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন তাঁর এক ফুফু।

শিক্ষা

সাইয়্যিদ আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তাঁর আপন চাচা। তিনিই নিজের এ অসহায় ভাতিজার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেন। প্রথমত তাঁকে হিফজুল কুরআন শিক্ষাদান করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি কুরআনে হাফিজ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এরপর পরিণত বয়সের সময় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য হযরত আবদুর রহমান তাঁকে হারামাইন শরীফাইনে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছুয়ে মুহাম্মদ শাহ রাহিমাহুল্লাহকে দ্বীনি উচ্চতর লেখাপড়ার জন্য সোপর্দ করেন সেখানকার বিখ্যাত উস্তাদদের নিকট।

সুলুকের রাস্তায়

হারামাইন শরীফাইনে ভ্রমণের পূর্বেই মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় সুফি চাচা সাইয়্যিদ আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লার হাতে ক্বাদিরীয়া তরিকায় বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর সুলুকের রাস্তায় বেশ কয়েক বছরের সাধনার পর খিলাফত লাভ করেন। হারামাইন শরীফাইন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি অনুমতি পান ক্বাদিরীয়া তরিকায় মুরিদ করার।

মক্কা মুকাররায় অবস্থানের দিনগুলো

আগেই বলেছি, তিনি হারামাইন শরীফাইনে যেয়ে উচ্চতর ইলম অর্জন করেন। এবার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম শহরের দিকে পাড়ি জমানোর বর্ণনা তুলে ধরছি।

বিজয়পুর থেকে সুরাত হয়ে মক্কা শরীফের দিকে যাত্রা করেন হযরত পীর মুহাম্মদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ। এসময় পবিত্র নগরীতে বসবাস করতেন বেশ কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের আলিম ও মাশাইখে আজম। তাঁদের সুহবতে থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অনেক সত্যান্বেষী মানুষ উপকৃত হচ্ছিলেন। হযরত পীর সাহেব রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ ৬ বছর মক্কা শরীফে থেকে আলিম-উলামা ও মাশাইখে আজমের সুহবত লাভ করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে বিশিষ্ট কজনের নাম হলো: শায়খ আবদুর রহমান, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে উসমান, শায়খ মুস্তফা ইবনে ফাতুল্লাহ ও অন্যান্য বুজুর্গ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

মদীনা মুনুওয়ারায় অবস্থানের দিনগুলো

দীর্ঘ ৬ বছর মক্কা মুকারমায় অবস্থান করে সেখানকার মাশাইখে আজমের সুহবত লাভ করার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, নূরের শহর মদীনা মুনুওয়ারায় যাবেন ও হুজুরে পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম জানাবেন।

মদীনা শরীফ পৌঁছুয়ে সেখানকার শান্ত ও মুবারক পরিবেশে থেকে তিনি এতোই মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করলেন যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও যেতে তাঁর মন চাচ্ছিলো না। সুতরাং এখানেও তিনি দীর্ঘ ৬ থেকে ৭ বছর কাটালেন। মসজিদে নববীর পবিত্র পরিবেশে বেশ কয়েকজন উস্তাদের নিকট তিনি হাদিস শরীফ অধ্যয়নের সুযোগ নিলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

মন চাচ্ছিলো না মদীনা মুনুওয়ারাকে ফেলে কোথাও যেতে। এরপরও স্বীয় মাতৃভূমিতে ফিরে শরীয়ত ও তাসাওউফের খিদমাতের মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠিকে হিদায়াত দানে নিয়োজিত হওয়া ছিলো তাঁর জন্য একান্ত জরুরি। তাই

হযরত পীর সাহেব রাহিমাহুল্লাহ রওজায়ে আতহারে যেয়ে অশ্রুভরা চোখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায়ী সালাম জানালেন।

এক যুগেরও অধিক সময় হারামাইন শরীফাইনে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সুপেয় সুধা পান করে দেশে ফেরার পর তিনি গুজরাটের আহমদাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

কবরচিল্লা পালন

কেনো বিশিষ্ট ওলির সমাধি পাশে নির্দিষ্ট কিছুদিন (সাধারণত ৪০ দিন) একাকী জিকির-মুরাক্বাবা ও ইবাদত বন্দেগী করাকে কবরচিল্লা বলে। সকল তরিকার মাশাইখে আজম এটি বৈধ বলেছেন। তবে শর্ত হলো পাশেই কোনো মসজিদ থাকা চাই- যাতে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায়ে সমস্যা না হয়।

হযরত পীর সাহেব রাহিমাহুল্লাহ ১১২৩ হিজরি সনের শেষের দিকে আল্লামা ওয়াজিউদ্দীন আলাওয়ী আহমদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরপাশে যেয়ে খিলওয়াত বা একাকী থেকে চিল্লা পালন করেন। তিনি জনবিচ্ছিন্ন ও দুনিয়াবী সবকিছু থেকে ফাগিল হয়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন। এতে শায়খ আলাওয়ী আহমদাবাদীর রূহানী ফায়েজ ও বরকত দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে বিশেষ উপকার লাভ করেন।

কবিতা রচনা

হযরত পীর মুহাম্মদ আহমদাবাদী একজন কবি ছিলেন। তিনি উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কলম-নাম ছিলো 'শাহীদ'। ফার্সি ভাষায়ও তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। সেসব কবিতায় কলম-নাম 'আক্বদাস' ব্যবহার করতেন। তিনি আধ্যাত্মিক উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করেছেন। নিচে উভয় ভাষায় রচিত তাঁর দুটি কবিতার উদাহরণ [অনূদিত করে] তুলে ধরছি।

ফার্সি কবিতা:

আমার অস্তিত্ব হচ্ছে নিশ্চিহ্ন,
আমি নিজের মধ্যে কয়েদি,
আমি সর্বত্র বাসস্থানহারা।

ভীষণ রোগাক্রান্ত নিজের মাঝে,
আমি আজো ভীষণ পীড়াগ্রস্থ-
কারণ আমি নিজের গভীরতা সম্পর্কে অজ্ঞ।
আমি প্রেমে পড়েছি নিজ সত্তার-
গুপ্তধনের ব্যাখ্যার মাঝে!

উর্দু কবিতা:

এ পৃথিবীর বুকে নেই কোনো আরাম-আয়েশ,
এখনই সময় এ ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণের।
মৃত্যু হচ্ছে বেঁচে থাকার চেয়ে শ্রেয়,
দুদিনের এ দুনিয়ার জিন্দেগীতে।

ইন্তিকাল

হযরত পীর মুহাম্মদ শাহ আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহ দুদিনের এ মায়াবী ধরার কোল থেকে চিরদিবায় গ্রহণ করেন ২৬শে জমাদিউল উলা ১১৬৩ হিজরি সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত শায়িত আছেন গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মায়ার বান্দার কবরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তম বাগানে পরিণত করুন। বুলন্দ করুন তাঁর মাক্বামাতকে।

হযরত শায়খ গোলাম ইয়াহইয়া বিহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১১৮০ হিজরি, সমাধি- মাকবারায়ে বাহরে যাকখার, লৌখনো,, ভাতর।)

তাঁর পূর্ণ নাম আল্লামা গোলাম ইয়াহইয়া ইবনে নাযমুদ্দিন বারোহবী বিহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন শরীয়ত, মানতিক ও দর্শনের একজন যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস।

জন্ম

হযরত ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ বিহারের বারোহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখানে তাঁর বাল্যকাল কাটান।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

জ্ঞানার্জনের স্পৃহায় তিনি পরিণত বয়সে সান্দিলায়[১৩৯] যান। সেখানকার মাদরাসায়ে মনসুরিয়্যায় ভর্তি হন। ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন উস্তাদ মাওলানা বাবুল্লাহ জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট। একইসময় তিনি ক্বাদিরী সুফি তরিকার শায়খ হযরত বদরে আলম শাদাম্বী রাহিমাহুল্লাহর নিকট বাইআত গ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি লৌখনো শহরে এসে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ইতোমধ্যে হযরত জৌনপুরী বাবুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে খিলাফত প্রদানে ভূষিত করেন।

‘মির জাহিদ’ নামক একটি কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখে তিনে উলামায়ে কিরামের নজর কাড়েন। তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের শিরোনাম ছিলো, ‘লিওয়াল হুদা ফিল-লাইল ওয়াদ-দুযা’। গ্রন্থটি এতোই উন্নতমানের ছিলো যে, উলামায়ে কিরাম এটিকে পাঠ্যবই হিসেবে নিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করেন।

তিনি বেশ কিছুদিন লৌখনোতে থেকে শিক্ষকতা করেন। এরপর দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানকার চিশতি শায়খ হযরত ঝানঝানা আলাওয়ী দেহলবী

---

[১৩৯] ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লৌখনো থেকে ৫০ মাইল দূরে হারদই জিলায় সান্দিলা শহরটি অবস্থিত। -গ্রন্থকার।

রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে চিশতিয়া তরীকার জিকির-মুরাক্বাবা ও সুলুকের পদ্ধতির ওপর আমল করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, চিশতিয়া ও ক্বাদিরীয়া তরিকার জিকির-মুরাক্বাবা পদ্ধতি প্রায় একই ধরনের। হযরত গোলাম ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ হযরত ঝানঝানা রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে দীর্ঘ ৫ বছর থাকেন। তিনি হযরতের নিকট থেকেও খিলাফত লাভ করেন। এরপর লৌখনোতে ফিরে এসে হযরত পীর মুহাম্মদ লৌখনোবী রাহিমাহুল্লাহর বাসস্থানের নিকটস্থ একটি জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জায়গাটি ছিলো শায়খ মুহাম্মদ কলন্দর মসজিদের নিকটে।[১৪০]

চারিত্রিক গুণাবলী

হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ হযরত বিহারী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন:

> আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তিনি একজন জ্ঞানবান আলিমে পরিণত হন। তাঁর বাগ্মীতা ছিলো সর্বজনবিদিত। তিনি ছিলেন উন্নত গুণাবলীর অধিকারী। কুরআন শরীফের একজন হাফিজ হযরত বিহারী রাহিমাহুল্লাহ শরীয়তের বাহ্যিক বিষয়ের উপর শিক্ষাদান করেছেন। এছাড়া মানতিক বিষয়ে রচিত বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের কিতাবের শরাহ লিখে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন খুব উন্নত স্বভাবের অধিকারী। তাঁর মন-মানসিকতা ছিলো খুবই প্রখর। তিনি একজন ওলির সুহবতে থেকে ক্বাদিরীয়া সুফি রাস্তায় সুলুকের উচ্চস্তর পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন। তিনি খফি জিকির-মুরাকবার মধ্যে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনায়। ফলে তাঁর মাক্বামাত ও মর্যাদা উচ্চ পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছুয়।

মির্জা ঝানঝানা রাহিমাহুল্লাহর খিদমতে

হযরত গোলাম ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ যখন মির্জা সাহেব রাহিমাহুল্লাহর উচ্চ মর্যাদা ও স্তর সম্পর্কে অবগত হন, তখন তাঁর হৃদয় বিহার ছেড়ে হযরতের দরবারে যেতে আকুল হয়ে ওঠে। তিনি হযরত মির্জা রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় উপস্থিত হয়ে খাদিম হিসেবে নিজেকে পেশ করেন। দীর্ঘদিন তাঁর সুহবতে থেকে নকশবন্দিয়া সুফি

---

[১৪০] নুযহাতুল খাওয়াতির, খ, ৬, পৃ. ২৭৬। সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ।

তরিকায় দীক্ষা নেন। এ মহান তরিকার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

দীর্ঘ ৬ মাস অতিক্রম হলো। ইয়াহইয়া রাহিমাতুল্লাহর মধ্যে কেনো ধরনের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হলো না। তবে তিনি তো ইতোমধ্যে তাসাওউফের উচ্চ স্তরে আরোহণ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং জিকির-মুরাক্বাবা কখনো বিফলে যাবার নয়। আগের যুগের একজন সুফি বলেছেন:

التاذذ بالبكاء ثمن البكاء

-ক্রন্দন থেকে আনন্দবোধ হচ্ছে ক্রন্দনের উপহার।

মূল্যবান বাণী

১. তিনি বলেন, "আল্লাহর ইচ্ছা হেতু কিছু লোক জিকিরের মধ্যে পরমানন্দ অনুভব করেন। অপরদের মাঝে এ জিকির উন্মোচন করে ইলমের রহস্যকে। আরেকদলকে দান করা হয়েছে জিকিরে ডুবে থাকার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাহাত্ম্য। আল্লাহর দরবারে তিন দলই গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই মা'রিফাতের অমূল্য সম্পদ লাভের অধিকারী সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন:

مِنَّا مَنْ عَلِمَ وَمِنَّ مَنْ جَهِلَ

-আমাদের মধ্যে একদল আছেন যারা জানেন এবং আরেকদল আছেন যারা জানেন না।"

২. তিনি আরো বলেন: "রহস্য জগতের জ্ঞান ও বাস্তবতা এবং হাক্বিকাতের দর্শনের মাধ্যমে স্পষ্টতা লাভ করা একটি বিরল ব্যাপার। একইভাবে অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাও খুব বিরল ব্যাপার। মূল কথা হলো, প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মূখ্য।

اَللّٰهُمَّ وفِّقْنا لِمَا تُحِبُّ وَتَرضَى

-হে আল্লাহ! আপনি যাকিছু ভালোবাসেন ও যার দ্বারা সন্তুষ্ট হন, তা-ই করতে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিন।"

মির্জা মাজহার ঝানঝানা রাহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিতে হযরত বিহারী রাহিমাহুল্লাহর স্তর

হযরত গোলাম ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহর ক্বাদিরীয়া তরিকার শায়খ হযরত বাবুল্লাহ জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ সংবাদ শুনে গোলাম ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ দিল্লি থেকে ছুটে গেলেন জৌনপুরে। উদ্দেশ্য ছিলো শায়খের খিদমতে

থাকা। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছে কেউ বুঝতে পারে না। তিনি নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এদিকে হযরত মাজহার ঝানঝানা রাহিমাহুল্লাহর অন্তরে প্রিয় এ মুরিদের অনুপস্থিতি হেতু বিরহ-যন্ত্রণা দেখা দিলো। তিনি লিখেছেন:

"আমি যে ক্ষত দ্বারা আহত হয়েছি তাতে কেনো পট্টি নেই। এ ক্ষতের কারণ হচ্ছে আমার কাছ থেকে মৌলভী গোলাম ইয়াহইয়ার প্রস্থান। তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত করুণ মৃত্যুতে আমার বুকে আগুন জ্বলে ওঠেছে। পাত্রটি পানিতে পরিণত হয়েছে। আমরা তো আল্লাহরই এবং তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। আমি এখন কী কবরো শুধুমাত্র সবর ছাড়া।"

মাওলানা গোলাম ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ 'ওয়াহদাতুশ শুহূদ'[১৪১] বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। হযরত মির্জা ঝানঝানা রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহাল ও আসহাবে কিরামের প্রতি। জ্ঞানবান উলামায়ে কিরামের সর্দার এবং মানতিক ও শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনকারী সাইয়্যিদ গোলাম ইয়াহইয়া বিহারী রাহিমাহুল্লাহ ঝানঝানার সুফি ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে গেছেন। আমার দিক-নির্দেশায় তিনি একটি মূল্যবান কিতাব রচনা করে গেছেন। প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি। মূল কথা হলো স্বল্প কলেবরে হলেও তিনি যে বিষয়ের উপর রচনা করেছেন তা পুরোটাই বর্ণিত হয়েছে কিতাবটিতে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করুন উত্তম বিনিময়। তিনি এতে দুটি বড়ো দলের মধ্যে

---

[১৪১] আরবি শব্দদ্বয় وحدت الشهود- এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, 'এককের এককত্ব' বা 'স্বাক্ষ্যের এককত্ব'। এটি একটি সুফি অধিবিধ্যার তত্ত্ব। ইমামে রব্বানী আহমদ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ এ তত্ত্বের প্রবর্তক ছিলেন। তাঁর অনেক আগে শায়খুল আকবর হযরত ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ 'ওয়াহদুতুল উজূদ' [وحدت الوجود] সুফিতত্ত্বের জন্ম দেন। তাওহিদ বিষয়ে উচ্চতর তাত্ত্বিক আলোচনা যেহেতু সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়- তাই এ উভয় তত্ত্বই অনেকের মধ্যে আল্লাহর এককত্ব সম্পর্কে কিছুটা ভুলবুঝাবুঝির জন্ম দেয়। বাস্তবে ইবনুল আরাবির 'ফুতুহাতিল মাক্কিয়্যাহ' গ্রন্থে উচ্চতর কাব্যিক ব্যাখ্যা অনেক সুফি-দরবেশদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করেছে। সুফি-দরবেশগণ তাসাওউফ তথা সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণ করে 'ফানা ফিল্লাহ'র স্তরে উপনীত হলে সমগ্র অস্তিত্বশীল জগৎ- এমনকি নিজেকে পর্যন্ত বিলুপ্ত অনুভব করেন। এ সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। এ স্তরে উপনীত হলেই 'ওয়াদাতুল উজূদের' সঠিক হাক্বিকাত সাধকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। অপরদিকে এ স্তর থেকে পুনরায় বাক্বা বা স্থিতির অবস্থায় ফিরে আসলে 'ওয়াহদাতুশ শুহূদ' [وحدت الشهود] তথা তাওহিদের স্বাক্ষ্যদান এর হাক্বিক্বাত উন্মোচ হয়। সুতরাং উভয় তত্ত্বের মূল হচ্ছে সাধকের আধ্যাত্মিক স্তরনির্ভরশীল। একটাকে বাতিল বলে অপরটিকে হক্ব বলার সুযোগ নেই। উভয়টিই সুলুকের রাস্তার উচ্চতর মাক্বাম। -গ্রন্থকার।

[ওয়াহদুতল উজূদ ও ওয়াহদাতুশ শুহূদ সম্পর্কে) সামঞ্জস্যসাধন করার চেষ্টা করেছেন। বাস্তবে উভয়টিই মূলত একই তত্ত্বের দুটি শাখা মাত্র। যাক, এরপরও তাঁর ভালো নিয়ত এতে সম্পৃক্ত আছে। আর দুটি বড়ো দলের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয় কর্ম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর বর্ষণ করুন স্বীয় করুণা ও দয়ার বারি। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর। যে ব্যক্তি সঠিক দিকনির্দেশনার অনুসারী তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

লেখক শায়খ গোলাম ইয়াহইয়া বিহারী রাহিমাহুল্লাহ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন: "বাস্তবে উভয় (ওয়াহদাতুল উজূদ ও ওয়াহদাতুল শুহূদ) বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন একটি সুকঠিন কাজ- প্রায় অসম্ভব। কারণ সুলুকের রাস্তায় আরোহণকালে উভয়টির প্রয়োজন দাঁড়ায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। উভয় দলের মধ্যে যে এ ব্যাপারে কেনো বিবাদ নেই সেটাই হচ্ছে আসল কথা। যদি কেউ মুজাদ্দিদিয়াহ তরিকায় ভ্রমণ করেন উভয় বিষয়ের ওপর পূর্ণ জ্ঞান রেখে, তাহলে ব্যাপারটি তাঁর নিটক স্পষ্ট হয়ে ওঠবে বলে আমি মনে করি।"[১৪২]

হযরত বিহারী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

এক সফল উন্নত জীবনশেষে আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা ও বন্ধু হযরত শায়খ গোলাম ইয়াহইয়া বিহারী রাহিমাহুল্লাহ এ ক্ষণস্থায়ী ইহলোক থেকে চিরন্তন পরলোকের দিকে পাড়ি জমান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা ইতোমধ্যে তাঁর মৃত্যুকালীন ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেছি। স্বীয় ক্বাদিরীয়া তরিকার পীর সাহেবের সেবা-শুশ্রূষার নিয়তে জৌনপুরে ছুটে এসে তিনি নিজেই চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তিনি সমাহিত আছেন লৌখনোর মাকবারায়ে বাহার যাকখার নামক কবরস্থানে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মহান সাধকের কবরকে নূরোজ্জ্বল করুন। বুলন্দ করুন তাঁর মাক্বামাতকে।

والحمد لله وصلى الله على النبي الكريم

সমাপ্ত

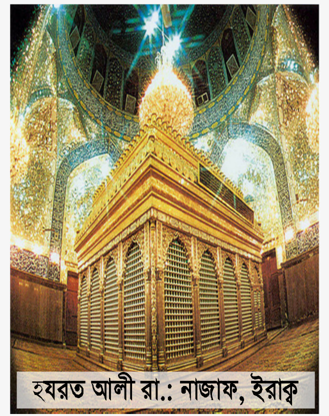
---

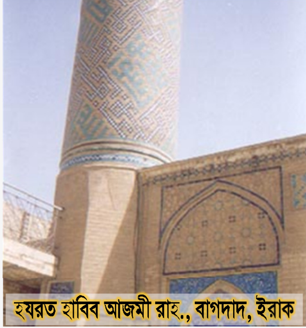
[১৪২] মাক্বামাতে মাজহারী - পৃ. ৩৮৪।


সবুজ গম্বুজ: মদীনা মুনুওয়ারাহ

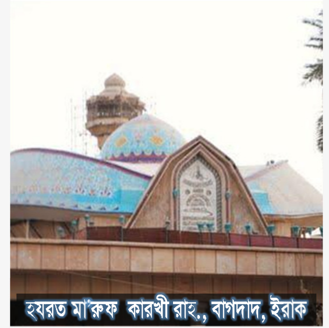
পরিশিষ্ট
কে কোথায় সমাহিত আছেন


হযরত হাসান বসরী রাহ.: বসরা, ইরাক্ব


হযরত আলী রা.: নাজাফ, ইরাক্ব


হযরত হাবিব আজমী রাহ., বাগদাদ, ইরাক


হযরত দাউদ তায়ী রাহ., কুফা, ইরাক


হযরত মা'রুফ কারখী রাহ., বাগদাদ, ইরাক


হযরত সিররি সাক্বাতী রাহ., বাগদাদ, ইরাক

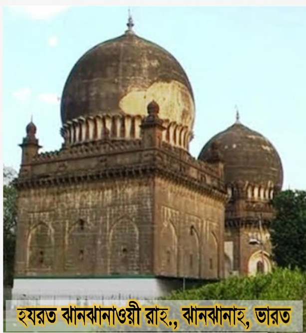

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহ., বাগদাদ, ইরাক


হযরত শিবলী রাহ., বাগদাদ, ইরাক


হযরত তারতুসী রাহ., বাগদাদ, ইরাক


হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহ., বাগদাদ, ইরাক

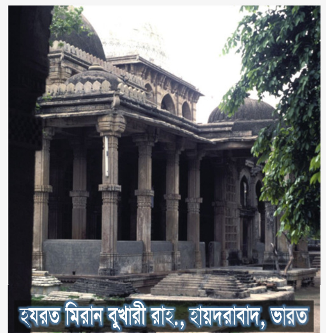

হযরত আ. রাজ্জাক জিলানী রাহ.., বাগদাদ, ইরাক



হযরত ঝানঝানাওয়ী রাহ., ঝানঝানাহ, ভারত



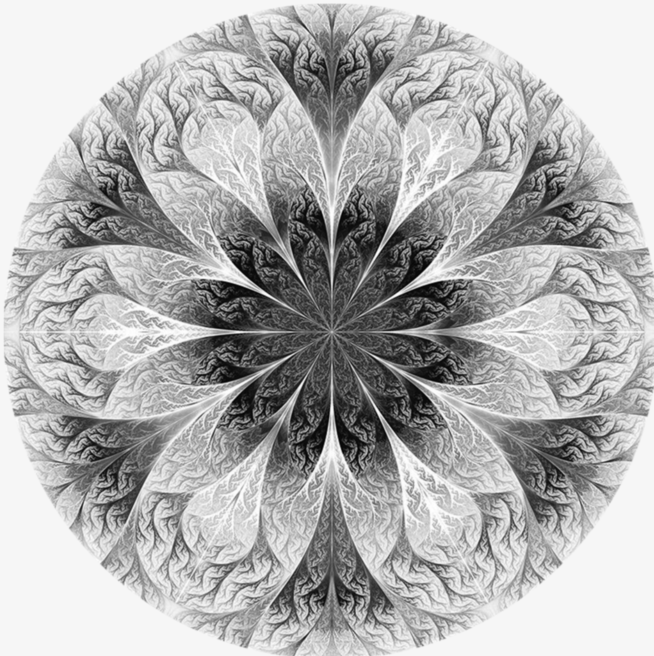
হযরত আ. হ. মুহাদ্দিসে দেহ. রাহ., দিল্লি, ভারত



হযরত মিরান বুখারী রাহ., হায়দরাবাদ, ভারত



হযরত শাহ আহমদাবাদী রাহ., হায়দরাবাদ, ভারত



গ্রন্থপঞ্জী

১. সীরাত বিশ্বকোষ- ইফাবা।
২. জিয়াউল কুলূব- হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ - অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, শান্তিধারা প্রকাশনী।
৩. নবীয়ে রহমত [বঙ্গানুবাদ] - সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ, অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ইফাবা।
৪. সীরাতে মুস্তফা - ইদ্রিস কান্ধলবী রাহিমাহুল্লাহ - ইফাবা।
৫. সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - শিবলী নুমানী রাহিমাহুল্লাহ, অনুবাদ: মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহ।
৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ইবনে কাছির রাহিমাহুল্লাহ - ইফাবা।
৭. সীরাতে ইবনে হিশাম [বঙ্গানুবাদ]।
৮. তারিখে তাবারী [ইংরেজী অনুবাদ] - ইবনে জরির তাবারী রাহিমাহুল্লাহ।
৯. মো’জেযায়ে রাসূলে আকরাম- আহমদ সাঈদ দেহলবী, অনুবাদ: মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া পুস্তকালয়।
১০. তাযকিরাতুল আউলিয়া - ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ [ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ]।
১১. কাশফুল মাহজুব - আলী হাজভেরী দাতা গঞ্জেবখশ রাহিমাহুল্লাহ।
১২. মাসালিক আস-সালিকীন।
১৩. The Life, Personality and Writings of Al-Junayd by Ali Hassan Abdul Kadir, Islamic Book Trust.
১৪. Ansari, Muhammad Abdul Haq. "The Doctrine of One Actor: Junaid's View of Tawhid." The Muslim World 1(1983): 33–56. Electronic. Source: en.wikipedia.org/
১৫. Sells, Michael A.. Early Islamic Mysticism: Sufi, Koran, Mi'raj, Poetic and Theological Writings. Mahwah, New Jersey: Paulist Press, 1996.
১৬. তাজাল্লিয়াতে জযব - হাকিম মুহাম্মদ আখতার রাহিমাহুল্লাহ।
১৭. হিলায়াতুল আউলিয়া - আবু নুয়াইম ইসফাহানী রাহিমাহুল্লাহ।
১৮. মাদারিজুস সালিকীন - ইবনে কাইউম যাওজী রাহিমাহুল্লাহ।
১৯. আক্বওয়ালে সালাফ [ইংরেজি অনুবাদ, ৬ খণ্ড] - কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী।

২০. নাফাহাতুল উন্স - মাওলানা আবদুর রহমান জামী রাহিমাহুল্লাহ।
২১. তারতিবুল মাদারিক - কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ - ইংরেজি অনুবাদ: আয়শা বিউলি।
২২. তাবাক্বাত - ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ।
২৩. আল-মাকতাবাতুশ শামিলা [ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি]।
২৪. খাজিনাতুল আসফিয়াহ - মুফতি গোলাম সারওয়ার ক্বাদিরী।
২৫. তাজকিরাহ হামিদীয়া - মুহাম্মদ হামিদ আনসারী।
২৬. তাজকিরাহ কুতবিয়া - আবুল হাসান হানকারী রাহিমাহুল্লাহ।
২৭. আজকারে কলন্দরিয়া।
২৮. জিকরে হাসান -আল্লামা গোলাম দস্তগীর।
২৯. আদ-দারুল মুনযিম - রাজা রশীদ মাহমুদ।
৩০. মাশাইখে ক্বাদিরীয়া [ইংরেজি অনুবাদ]
৩১. আনওয়ারে সুফিয়্যাহ - আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ শা'রানী রাহিমাহুল্লাহ।
৩২. নাজমুয জাহিরা - ইবনে তুযজি হারভি (রাহ.)
৩৩. মুনতাজাম - ইবনে জাওযী (রাহ.)
৩৪. তারিখে কাবির - হাফিজ জাহাবী (রাহ.)
৩৫. তারিখে বাগদাদ - ইবনে নাজ্জার (রাহ.)
৩৬. তাবাক্বাতুল কুবরা - আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহ.)
৩৭. ক্বাওয়াইদুল জাওয়াহির - মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া তাদিফী
৩৮. বাহজাতুল আসরার - আবুল হাসান আলী শাতুনুফী (রাহ.)
৩৯. গাউছুল আযম - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)
৪০. নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী মানাক্বিবে শায়খ আবদিল ক্বাদির - মুল্লা আলী ক্বারী (রাহ.)
৪১. তাফরীহুল খাতির ফী মানাক্বিবে শাইখ সৈয়্যদুনা আবদুল ক্বাদির - সৈয়দ আবদুল ক্বাদির আরবেলী (রাহ.)
৪২. মাখযানুল ক্বাদিরীয়া।
৪৩. আজকারুল আবরার - শায়খ বাহাউদ্দিন, শাহ বদরুদ্দিন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, লাহোর, ১৯৯৫।
৪৪. কিতাবুল মাজালিস - তাওহিদ ও ত্রিত্ববাদের ওপর ইলইয়াস ও আবুল হুসাইন মাগরিবী মধ্যকার খ্রিস্ট-মুসলিম বাহাস [১০২৭ ঈ.]।

৪৫. তুহফাতুল ক্বাদিরীয়া।
৪৬. সাহায়িফে মা'রিফাত।
৪৭. বাহরুল আসরার - মাহমুদ ইবনে আমির।
৪৮. মাশাইখে আহমদাবাদ - মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে সুলাইমান মাতালা।
৪৯ আখবারুল আখইয়ার - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
৫০. হায়াতে শায়খ - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
৫১. 'আহলে দিল কি দিল আওয বাতেই' - শায়খ হাবিবুর রহমান আজমী রাহিমাহুল্লাহ।
৫২. ওসিয়্যাত - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
৫৩. ফাওয়াইদুস সুহবাত - মাওলানা শাহ ওয়াসিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ।
৫৪. তারিখে আউলিয়ায়ে বুরহানপুর -
৫৫. মাহবুবুত তাওয়ারিখ।
৫৬. নুযহাতুল খাওয়াতির।
৫৭. মাক্বামাতে মাজহারী।
৫৮. en.wikipedia.org
৫৯. revolvy.com
৬০. sunnah.org
৬১. sufiwiki.com